সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা ইসলামী দৃষ্টিকোণ

(প্রবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনায়

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

সৌজন্যে

সঊদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি বাংলাদেশ

গবেষণা ও প্রকাশনায়

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা
ইসলামী দৃষ্টিকোণ

(প্রবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনায়

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

সৌজন্যে

رابطة خريجي الجامعات السعودية في بنغلاديش

সউদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি, বাংলাদেশ

গবেষণা ও প্রকাশনায়

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ

সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও উগ্রপন্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ (প্রবন্ধ সংকলন)

সম্পাদনায়: ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

ISBN : 978-984-34-1468-7

আই আই আই ই আর বুক সিরিজ-০২

প্রকাশকাল: সফর ১৪৩৮ হিজরী/ নভেম্বর ২০১৬ ঈসায়ী

প্রকাশক

গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ

বাড়ি # ০৯, রোড # ১৫, সেক্টর # ১৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

মোবাইল: ০১৬৭১-৯৭১৪৫৭, ই-মেইল: iiierbd@gmail.com

কম্পোজ: আই আই আই ই আর কম্পিউটার্স

প্রচ্ছদ: আই আই আই ই আর প্রকাশনা বিভাগ

মূল্য : ২০০/- (দুইশত টাকা মাত্র)

Shantrash, Jangibad O Ugropantha: Islami drishtikon (Terrorism, Militancy and Extrimism: Islamic Perspective) written by a Group of Scholars, Edited by Dr. Muhammad Saifullah and Published by International Islamic Institute for Education and Research, House # 09, Road # 15, Sector # 14, Uttara, Dhaka-1230, Mobile : 01671-971457, E-mail: iiierbd@gmail.com, Price: TK. 200

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রকাশকের কথা-كلمة الناشر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সন্ত্রাস আজ এক বহুল আলোচিত ও চর্চিত বিষয়। সন্ত্রাস একটি প্রাচীন সমস্যা হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এই যুগে সেটি নতুনভাবে আবির্ভূত হয়েছে। বিগত কয়েক দশক যাবৎ বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণের ফলে মুসলিম-অমুসলিম উভয়ের দৃষ্টি এখন ইসলামের দিকে। তাই একদিকে যেমন ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে অনেকে সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ছে অপরদিকে অনেকে সন্ত্রাস দমনের নামে আরো বড় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। এমনই এক প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থার নবউত্থান ও প্রসার ইসলামী দাওয়াত ও মুসলিমদের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে কঠিন করে দিয়েছে।

সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন মহল থেকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সেসব উদ্যোগের পাশাপাশি "সাউদি ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বাংলাদেশ"-এর সৌজন্যে "ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ" দেশের খ্যাতিমান আলিম, দাঈ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষকদের লেখার সমন্বয়ে "সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে এ সংকলনটি আলোর মুখ দেখছে। লেখকগণ কুরআন, হাদীস, সালফে-সালেহীন-এর মানহাজ মোতাবেক সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এই গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে "সাউদি ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বাংলাদেশ" সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে উম্মাহ ও দেশের কল্যাণে অবদান রেখেছে। তাদের এই সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাছাড়া সংকলনটি প্রকাশের সাথে শুরু থেকে সংশ্লিষ্ট হয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে ইনস্টিটিউটের গবেষক শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল, গবেষণা সহকারী শাইখ মুহাম্মাদ জহিরুল ইসলাম, মশিউর রহমান ও কম্পিউটার কম্পোজার শরীফুল ইসলাম-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকের কথা- كلمة التحرير

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وبعد

বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে সন্ত্রাস আজ এক মহামারি হিসাবে দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে আইএস-এর উত্থান ও তাদের আদর্শকে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টার মাধ্যমে ধর্মের নামে বিশেষ করে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ব্যপকতা ও আন্তর্জাতিকতা লাভ করেছে। তাই সন্ত্রাস আজ আর কোন জাতীয়, আঞ্চলিক বা নির্দিষ্ট ভৌগলিক সমস্যা নয়, এটি এখন একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ও আন্তর্জাতিকভাবে বহু প্রচেষ্টা পরিচালনা করা হলেও কোন ভাবেই কেন সন্ত্রাসকে দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না, তা বিশ্লেষক ও গবেষকদের কাছে বড় জটিল প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে সন্ত্রাসের কারণ ও তা প্রতিকার বা প্রতিরোধের উপায় অনুসন্ধান করছেন। কিন্তু অধিকাংশ লেখক-গবেষকই মূল কারণগুলোকে পাশ কাটিয়ে এই ভয়াবহ ব্যাধিটির চিকিৎসা করতে চাচ্ছেন। তাই সন্ত্রাস ক্রমেই বাড়ছে।

আমরা সকলেই জানি, ইসলাম শান্তিপ্রিয় ধর্ম। ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। ইসলাম ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার সন্ত্রাস ও বিপর্যয় সৃষ্টিকে নিষিদ্ধ করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম মানবসমাজে ন্যায়নীতি, আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ওপর অত্যাধিক মাত্রায় জোর দিয়েছে। তবুও ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থান নতুন বিষয় নয়। যারা এসব কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হচ্ছে তারা কোন ভাবেই ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা বিচ্ছিন্ন ও ইসলামী চিন্তাচেতনা থেকে বিচ্যুত ও বিপথগামী।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম। তাদের প্রায় সকলেই কম-বেশি ইসলাম জানার ও মানার চেষ্টা করেন। তাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ রয়েছে কিন্তু ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই। তাই তাদের কেউ কেউ কখনো কখনো শিরক, বিদ'আত, কুসংস্কার, অন্যায়, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মত আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ছাত্র-তরুণ-যুবক শ্রেণী ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তাদের মগজ ধোলাই করে একটি গ্রুপ তাদের

মাথায় ইসলাম বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে, অন্য একটি গ্রুপ আবার ইসলামের মৌলিক ইবাদাত জিহাদকে অপব্যাখ্যা করে তাদেরকে জঙ্গিবাদের দিকে টেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলিমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রেক্ষাপটে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কেউ কেউ চলমান জঙ্গিবাদকে সেসব ষড়যন্ত্রের ফল বলেও মনে করছে। কিন্তু কেউই এর যথার্থ কারণ ও তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না।

সম্প্রতি বাংলাদেশে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ব্যাপকহারে বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার, আলিম-উলামা, সাধারণ জনগণসহ সকলেই সকল ধরণের সন্ত্রাস, তা ধর্মের নামে হোক বা অন্য কোন ব্যানারে হোক, এর বিরোধিতা করে আসছে এবং প্রত্যেকের সাধ্য অনুযায়ী তা প্রতিরোধ করে আসছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত করার দায়িত্ব শুধু সরকার বা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নয়, আমাদেরও। সেই দায়িত্বানুভূতি থেকে "সাউদি ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বাংলাদেশ"-এর সৌজন্যে "ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ" কর্তৃক "সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হলো। আলহামদুলিল্লাহ।

এই সংকলনে দেশের বিশিষ্ট আলিম, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, গবেষকগণ কুরআন, হাদীস ও ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা অবলম্বনের কারণ ও তা প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এছাড়াও তাদের লেখায় সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় উঠে এসেছে যা সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, পলিসি মেকার, শিক্ষক, গবেষকসহ সর্বসাধারণের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে এবং সন্ত্রাস দমনে কর্মসূচি নির্ধারণে সহায়তা করবে। সাথে সাথে সন্ত্রাসের সাথে যে ইসলামের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই- সে কথা আবারও প্রমাণিত হবে।

আমাদের জানা মতে, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বাংলাভাষায় এটিই সর্ববৃহৎ প্রবন্ধ সংকলন। এই সংকলনটি একদিকে যেমন সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে ইসলাম ও মুসলিমদের সম্পর্কহীনতা প্রমাণ করবে, অপরদিকে তেমন যারা সন্ত্রাস ও জিহাদকে গুলিয়ে ফেলে ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম প্রমাণ করার চেষ্টায় অহর্নিশ অতিবাহিত করছেন তাদের দিবানিদ্রা ভাঙাবে এবং যারা জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝুঁকিতে আছেন তাদেরকে ফেরাতে সাহায্য করবে।

খুব অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এই সংকলনটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়ায় উল্লেখযোগ্য অনেক ব্যক্তিদের লেখা আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। তাছাড়া গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেকের লেখা সম্পাদনা করে সংক্ষিপ্ত করে দিতে হয়েছে। কয়েকটি লেখা ইন্টারনেট ও বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সেসকল লেখক ও প্রকাশকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি বলে অনুমতি নেয়া সম্ভব হয়নি। তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই সংকলনটির লেখক, সম্পাদক, প্রুফ রিডার, কম্পোজারসহ সংশ্লিষ্ট যারা মেধা, সময়, শ্রম ও অর্থ দিয়ে প্রকাশনাটিকে আলোর মুখ দেখতে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। জাযাহুমুল্লাহু খাইরা। বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করার জন্য "সাউদি ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বাংলাদেশ"-এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সময় স্বল্পতা হেতু গ্রন্থটিতে তথ্যগত ও বানানগত ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যে কোন ভুল আমাদেরকে অবগত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিব, ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের গ্রাস থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

- ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

সূচিপত্র

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে করণীয়

واجبنا تجاه مكافحة الإرهاب

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

সাবেক প্রফেসর, আল-হাদীস বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সকল ধর্ম ও আদর্শের অনুসারীরাই বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদে লিপ্ত হয়েছে ও হচ্ছে। সন্ত্রাস অর্থই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে অস্ত্রধারণ ও শক্তি প্রয়োগ এবং বিশেষত অযোদ্ধা ব্যক্তি বা বস্তুকে আঘাত করা বা হত্যা করা। ইসলামে সন্ত্রাসের পথ সামগ্রিকভাবে রুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে মানবজীবনকে সর্বোচ্চ সম্মানিত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং একমাত্র বিচার ও যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনোভাবে কোনো মানুষকে হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিচার ও যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এভাবে ইসলামে সন্ত্রাসের পথ পরিপূর্ণভাবে রুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা সন্ত্রাসের ঘটনা দেখতে পাই না বললেই চলে।

কিন্তু সমকালীন বিশ্বে উপনিবেশোত্তর বিভিন্ন মুসলিম দেশের দমন-পীড়ন নীতি, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও অন্যান্য স্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য বিশ্বশক্তির সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী নীতি, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম নিধন ও মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, আবার প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মুসলিমদের ধর্মীয় আবেগ অপব্যবহার করে "মুজাহিদ" তৈরির উদ্দেশ্যে বিশেষ "মাদ্‌রাসা" তৈরি করে তাদেরকে জঙ্গিতে রূপান্তরিত করা ইত্যাদি বিষয় বিভিন্নভাবে উগ্রতা, জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসের জন্ম দিয়েছে। এক্ষেত্রে উগ্রতা, সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষাকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। এদেশে কখনো ধর্মীয় সংঘাত ও রক্তারক্তি দেখা দেয় নি। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা অন্যত্র যেমন বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এবং একই ধর্মের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ ও দলের মধ্যে হানাহানি ও রক্তারক্তির ঘটনা ঘটে থাকে বাংলাদেশে তা কখনোই ঘটে না। কিন্তু ইদানিং আমরা আমাদের দেশেও ধর্মীয় উগ্রতার উন্মেষ লক্ষ্য করছি। এ প্রবণতা রোধে আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন

যতদিন এরূপ আগ্রাসন, নিপীড়ন ও ষড়যন্ত্র থাকবে ততদিন যে কোনো দেশে কিছু মানুষ অজ্ঞতা ও আবেগের প্রেষণে উগ্রতায় লিপ্ত হয়ে যেতে পারেন। এরূপ সম্ভাবনা একেবারে রহিত করা যায় না। অনুরূপভাবে যে মুসলিম দেশের ভৌগলিক বা অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে সে দেশে আধিপত্য বিস্তার করতে বা সে দেশের সরকারকে ছাড় দিতে বাধ্য করতে কিছু "জঙ্গি" তৈরি করা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির জন্য অত্যন্ত সহজ ও কার্যকরী পন্থা। তবে আমরা বাকি তিনটি কারণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং এতে প্রথম কারণটিও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে।

২. বেকারত্ব, হতাশা ও অজ্ঞতা

বেকারত্ব, বঞ্চনা ও হতাশার পাশাপাশি জ্ঞানহীন আবেগ চরমপন্থা ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডের জন্ম দেয়। আমাদের সমাজে যারা সর্বহারার রাজত্বের জন্য বা ইসলামী রাজত্বের জন্য সহিংসতায় লিপ্ত তাদের প্রায় সকলের জীবনেই আপনি এ বিষয়টি দেখতে পাবেন। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত বেকার যুবককে কেউ বুঝিয়েছে, এরূপ সহিংসতার মাধ্যমে অতি তাড়াতাড়িই তোমার ও অন্যদের কষ্ট ও বঞ্চনার সমাপ্তি ঘটবে এবং সর্বহারার রাজত্ব বা ইসলামী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তুমি ক্ষমতা ও কর্ম অথবা জান্নাত লাভ করবে। বঞ্চিত, বেকার ও হতাশ এ যুবক সহজেই এ কথা বিশ্বাস করে এ সকল কর্মে লিপ্ত হয়। কারণ তার অন্য কোনো কর্ম নেই এবং তার পাওয়ার আশায় বিপরীতে হারানোর তেমন কিছুই নেই।

৩. জঙ্গী নির্মূল বনাম জঙ্গিবাদ নির্মূল

বেকারত্ব, সামাজিক অবহেলা, ন্যায় বিচারের দুর্লভতা, বঞ্চনা ও অজ্ঞতা দূর না করে শক্তি বা আইন দিয়ে কঠোর হস্তে "জঙ্গি" নির্মূলের চেষ্টা করলে জাতির ক্ষতি হবে। এতে এদেশের অনেক সন্তান "নির্মূল" হলেও "জঙ্গিবাদ" নির্মূল হবে না । যারা চরমপন্থা বা জঙ্গি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত তারা আমাদের সামাজিক বঞ্চনা ও অবিচারের শিকার। তাদেরকে শত্রু বিবেচনা করে নির্মূল করার চেয়ে নাগরিক ও দেশের সন্তান বিবেচনা করে যথাসম্ভব সংশোধন করে সমাজের মূলধারায় সংযুক্ত করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিশেষত যারা হত্যা অনুরূপ অপরাধে জড়িত হয়নি এরূপ যুবকদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব পিতৃত্বের বা অভিভাবকদের দরদ নিয়ে সকল নাগরিকের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া। প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি প্রদান এবং নিরপরাধকে শাস্তি থেকে রক্ষার পাশাপাশি কম অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া তাদের কর্তব্য। বিভিন্ন হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, ইনসাফ, বৈষম্যহীন ন্যায়বিচার ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট শাসক ও প্রশাসকগণ আল্লাহর সর্বোচ্চ দয়া ও পুরস্কার লাভ করবেন।

৪. অপরাধ নিয়ন্ত্রণ বনাম নিরপরাধের শাস্তি

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর দিক হলো নিরপরাধের শাস্তি। জঙ্গিবাদ দমনের নামে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে নিরপরাধ মাদ্রাসার ছাত্র বা ধার্মিক মানুষদেরকে আটক, জিজ্ঞাসাবাদ, কারাগারে অন্তরীণ রাখা, রিমান্ডে নেওয়া ইত্যাদি কর্ম একদিকে মানবাধিকার ভূলণ্ঠিত করবে, এ সকল নিরপরাধ মানুষ ও তাদের আপনজনদেরকে

জঙ্গিবাদের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং সর্বোপরি আমাদেরকে আল্লাহর গযব ও শাস্তির মধ্যে নিপতিত করবে। কারণ নিরপরাধের শাস্তি ও বিচারবহির্ভূত হত্যা, শাস্তি ও কষ্টদান যখন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক রূপ পরিগ্রহণ করে তখন আল্লাহর গযব ও জাগতিক শাস্তি সে দেশের ভাল ও মন্দ সকল মানুষকে গ্রাস করে।

৫. জঙ্গিবাদ বনাম ইসলামী দাওয়াত

আরো বেশি ভয়ঙ্কর বিষয় জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণের নামে ইসলামী দাওয়াতের কণ্ঠরুদ্ধ করা। মাওবাদী সন্ত্রাসীরা বা আমাদের দেশের চরমপন্থী বলে কথিত "বামপন্থী জঙ্গিরা" যে মতাদর্শ বা দাবিদাওয়া প্রচার করেন মূলধারার মার্কসবাদী, সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী বা বামপন্থীগণও একই মতাদর্শ ও দাবি-দাওয়া প্রচার করেন। অনুরূপভাবে ইসলামের নামে উগ্রতায় লিপ্ত বা জঙ্গিবাদীরা যে সকল মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া পেশ করেন প্রায় একই মতাদর্শ ও দাবি দাওয়া প্রচার করেন মূলধারার ইসলামী রাজনীতিবিদ, আলিম, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও পীর-মাশাইখগণ। পার্থক্য হলো কর্মপদ্ধতিতে। চরমপন্থী ও জঙ্গিরা বলপ্রয়োগ, আইন অমান্য ও খুনখারাপির মাধ্যমে তাদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে চান। পক্ষান্তরে মূলধারার মানুষেরা দেশের আইনের আওতায় গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করেন। গ্রহণ করা বা না করা জনগণের ইচ্ছাধীন।

সাম্যবাদী জঙ্গি বা সমাজতন্ত্রী সন্ত্রাসীদের কারণে কেউ মূলধারার সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রীদেরকে দায়ী করেন না বা "চরমপন্থা" দমনের নামে বামপন্থী রাজনীতি ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার দাবি তোলেন না। কেউ বলেন না যে, সাম্যবাদী রাজনীতির কারণেই চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী জন্ম নিচ্ছে; কাজেই সাম্যবাদী রাজনীতি বন্ধ করা হোক। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। জঙ্গিবাদ দমনের অযুহাতে অনেক সময় ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আইন ও বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি বা ইসলামী মূল্যবোধ বিকাশের দাবি বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়।

বস্তুত, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এক দল আরেক দলের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারেন। যারা ইসলামী মূল্যবোধ, আখলাক-আচরণ শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছুকেই "আফিম", "প্রতিক্রিয়াশীলতা" বা উন্নয়নের প্রতিবন্ধক বলে বিশ্বাস করেন, অথবা তাদের বাণিজ্যিক, সাম্রাজ্যবাদী বা অনুরূপ স্বার্থের প্রতিবন্ধক বলে মনে করেন তারা জঙ্গিবাদের অযুহাতে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধ বিস্তারের বা ইসলামী আদর্শ বিস্তারের সকল কর্ম নিষিদ্ধ করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে। অনুরূপভাবে "ইসলামপন্থীরা" চরমপন্থা নির্মূল বা অনুরূপ কোনো অযুহাতে সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রী আদর্শ প্রচার নিষিদ্ধ করার দাবি করতে পারেন। মত প্রকাশের অধিকার তাদের আছে।

তবে সরকার ও প্রশাসনকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। তাদের নিজস্ব কোনো মত বা পক্ষ থাকলেও সরকারের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাদের দায়িত্ব হয় সকলের অধিকার রক্ষা করা এবং দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখা। আমাদের বুঝতে হবে যে, ভাল বা মন্দ কোনো কাজেরই "কণ্ঠরুদ্ধ" করার প্রবণতা কখনই ভাল ফল দেয় না। বিশেষত জঙ্গিবাদের নামে ইসলামী রাজনীতি, ইসলামী আদর্শ প্রচার, শিক্ষা বিস্তার ও ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার আইনসম্মত দাওয়াতকে নিষিদ্ধ বা বাধাগ্রস্ত করলে তা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হরণের অপরাধ ছাড়াও দেশ ও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর বিপদ ডেকে আনবে। এ জাতীয় যে কোনো কর্ম জঙ্গীদেরকে সাহায্য করবে, তাদের প্রচার জোরদার করবে, তাদের নতুন রিক্রুটমেন্ট দ্রুত বাড়বে এবং দেশ ও জাতিকে এক ভয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী অশান্তির মধ্যে ফেলে দিবে।

৬. ধর্ম-মুক্ত শিক্ষা বনাম ধর্ম-যুক্ত শিক্ষা

আমরা দেখেছি যে, ধর্মীয় আবেগের সাথে সঠিক ধর্মীয় জ্ঞানের অনুপস্থিতিই জঙ্গিবাদের মূল কারণ। এজন্য সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় অধিকতর ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষার সংযোজন অতীব প্রয়োজনীয়। জঙ্গিবাদের অযুহাতে মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংকোচন এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে "ধর্মনিরপেক্ষ" বা "অসাম্প্রদায়িক" করার নামে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিমুক্ত করা আন্তর্জাতিক বেনিয়াচক্র ও সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনলেও জাতির জন্য ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করবে।

"মাদ্‌রাসা-শিক্ষিত" ও ধার্মিক মানুষেরা জঙ্গি না হলেও তারা সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী এবং অশ্লীলতা, মাদকতা ও অনাচার বিরোধী। জঙ্গিবাদের অযুহাতে এদেশের মানুষের মধ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী মানসিকতা অথবা অশ্লীলতা, মাদকতা ও অনাচার বিরোধী মানসিকতা নির্মূল করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি আমরা জাতির কল্যাণে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে।

আমরা দেখেছি যে, আমাদের দেশে ও বিশ্বের সকল দেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে জড়িতদের অধিকাংশই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। জঙ্গি বলে কথিত ও প্রচারিত দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও তাত্ত্বিক গুরুগণও আধুনিক শিক্ষিত। কিভাবে এদের দলে নতুন অন্তর্ভুক্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন?

আমরা কি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষা দিব যে, ধর্ম ভাল নয়, ধর্ম আফিম, ধর্ম পালন করো না, পরকাল বিশ্বাস করো না, ধার্মিকদের কাছে যেও না? এরূপ শিক্ষাতো কোনো ভাবেই দিতে পারব না। আর দিলেও তাতে কোন লাভ হবে না। জঙ্গিবাদ কমবে না,

বরং জঙ্গীদের প্রচারণার সুযোগ অনেক বাড়বে, ধর্ম বিপন্ন বলে তারা আরো অনেক মানুষকে দলে ভেড়াবে। উপরন্তু এরূপ শিক্ষা দুর্নীতি, সন্ত্রাস, এইডস, এসিড, যৌন হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা ও নৈতিক অবক্ষয়ের মহাদ্বার উন্মোচন করবে।

তাহলে কী আমরা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই শিক্ষা দিব না? ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার নামে কি আমরা "ধর্ম-মুক্ত" শিক্ষা দান করব? এতে তো আমাদের সমস্যা বাড়বে। কারণ এরূপ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় অনুভূতি নষ্ট করতে পারবে না, কিন্তু ধর্মীয় অবজ্ঞা তাদের ধর্মীয় অনুভূতির অপব্যবহারের সুযোগ বাড়িয়ে দেবে।

বস্তুত ধর্মীয় অনুভূতি নির্মূল করা যায় না। সঠিক জ্ঞানের অভাবে তা বিপদগামী হয়। কখনো কুসংস্কার ও অনাচার এবং কখনো উগ্রতার পথ ধরে। কেউ "পাগল বাবা"-র দরবারে ধর্ণা দিয়ে, মাজারে-দরগায় পাগল বা মস্তানের পিছনে ছুটে, গাঁজা খেয়ে, জিনের বাদশা বা অনুরূপ প্রতারক-পুরোহিতের কাছে যেয়ে মূল্যবান কর্মঘণ্টা ও সম্পদ নষ্ট করে। আর কেউ উগ্রতা ও সহিংসতার পিছে ছুটে নিজের ও অন্যের মহামূল্যবান জীবন ও সম্পদ নষ্ট করে।

৭. জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্তি

যেহেতু এ বিষয়টির সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত সেহেতু এর প্রতিরোধ, প্রতিকার ও নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বা আলিমদের সম্পৃক্ত করা অতীব জরুরী। উগ্রতার প্রসারে ইসলামী শিক্ষার যে বিষয়গুলিকে বিকৃত করা হয় সেগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য সমাজের প্রাজ্ঞ আলিমগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গণমাধ্যমে সুযোগ দেওয়া অতীব জরুরী।

একজন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতা যদি বলেন "ইসলাম শান্তির ধর্ম.... ইত্যাদি" তাতে সন্ত্রাসে লিপ্ত যুবক পরিতৃপ্ত বা 'কনভিন্সড' হবে না; তবে যদি একজন প্রাজ্ঞ নেককার আলিম এ বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন তাহলে তা হয়ত তাকে পরিতৃপ্ত বা 'কনভিন্সড' করতে পারে। এতে যেমন সংশ্লিষ্ট অনেকে সংশোধিত হবে তেমনি নতুন অন্তর্ভূক্তি কমে যাবে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে আলিম ও 'দায়ী'গণের করণীয়

জঙ্গিবাদে যেহেতু ইসলামের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে সেহেতু এর নিয়ন্ত্রণে আলিম, ইমাম, আল্লাহর পথে দাওয়াতে লিপ্ত ব্যক্তি বা "দায়ী ইলাল্লাহ" এবং ধার্মিক মুসলিমদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। একথা সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসন বিরোধী স্বাধিকার আন্দোলনকে জঙ্গিবাদ নাম দেওয়া হচ্ছে এবং জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে সারা বিশ্বে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে নিন্দিত করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী

শক্তিগুলো নিজেদের প্রয়োজনে 'জঙ্গি' তৈরি করেছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে দায়ী করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি একথাও সত্য যে আমাদের দেশে ও বিভিন্ন দেশে কিছু মানুষ ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলামী রাষ্ট্র বা বিচার প্রতিষ্ঠা অন্যায় প্রতিরোধ, অন্যায়কারীর শাস্তি ইত্যাদি ইসলাম-নির্দেশিত কর্মের নামে ইসলাম নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত হচ্ছেন। এদের বিভ্রান্তি দূর করার মূল দায়িত্ব আলিম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের।

জঙ্গিবাদের জন্য পাশ্চাত্যকে, সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণাকে বা ইসলামের শত্রুদেরকে দায়ী করে বক্তব্য দিলেই সব দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। পাশাপাশি বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। ইসলামের নামে উগ্রতা বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সকলেই অমুসলিমদের এজেন্ট বা ক্রীড়নক বলে মনে করার কারণ নেই। এদের মধ্যে কেউ এমন থাকলেও অন্য অনেক মানুষ রয়েছেন যারা দীনি আবেগ নিয়ে সওয়াবের ও নাজাতের উদ্দেশ্যে উগ্রতা, সহিংসতা ও খুনখারাপিতে লিপ্ত হচ্ছেন। এদের সঠিক জ্ঞান প্রদান ও বিভ্রান্তি অপনোদনের দায়িত্ব আলিম সমাজের। ইসলামী শিক্ষার বিকৃতি রোধ করার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের সুন্নাত অনুসারে ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ও দীনি দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা দেওয়া আলিমগণের দায়িত্ব।

১. সঠিক দাওয়াত ও বিকৃতি রোধ

আমাদের দায়িত্ব, সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দীনী দাওয়াতকে অব্যাহত রাখা এবং পাশাপাশি যে সকল শিক্ষা বিকৃত করে একজন মুমিনকে উগ্রতায় লিপ্ত করা সম্ভব সেগুলির সঠিক চিত্র মুসলিম উম্মাহর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করা।

২. তাক্‌ফীর, ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা বর্জন

সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও সুন্নাতে নববী ও সুন্নাতে সাহাবার আলোকে আল্লাহর পথে দাওয়াতের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। দাওয়াতের ক্ষেত্রে যে সকল সাধারণ ভুলত্রুটি উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতা ছড়াতে পারে তা সচেতনতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এগুলির অন্যতম হলো দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার কারণে বিরোধীদেরকে কাফির, ইসলামের শত্রু বা অনুরূপ বিশেষণে আখ্যায়িত করার প্রবণতা।

বস্তুত সমাজকে, সমাজের নেতৃবৃন্দকে বা আলিমগণকে ঘৃণা না করে কেউ সন্ত্রাসী, চরমপন্থী বা জঙ্গি কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। আর আলিম-উলামা, পীর-মাশাইখ ও দীনের দাওয়াতে কর্মরত অনেকেই জেনে অথবা না জেনে এরূপ ঘৃণা ছড়াচ্ছেন। "তাকফীর" বা কাফির কথন আমাদের সমাজে বিভিন্নভাবে বিদ্যমান। আমাদের

অনেকে খারিজী, মুতাযিলী ও অন্যান্য বিভ্রান্ত ফিরকার ন্যায় দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য, মতামত, মতভেদীয় বিষয় বা মুসতাহাব-মাকরূহ বিষয়াদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ব্যাখ্যা দিয়ে কুফরী বলে প্রমাণের চেষ্টা করছেন। দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত মতভেদে বা কর্মপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে একে অপরকে "ইসলামের শত্রু", "শত্রুদের দালাল", "ইহূদী-খৃষ্টানদের এজেন্ট", "নবী-ওলীগণের দুশমন", ইত্যাদি বলে পারস্পরিক ঘৃণা উস্কে দিচ্ছেন। এ সবই "তাকফীর" বা কাফির কথনের বিভিন্ন রূপ। এসবই ধর্মীয় উগ্রতা উস্কে দিচ্ছে।

দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত মতভেদের কারণে "ইসলামের শত্রু", "শত্রুদের দালাল" বা অনুরূপ কোনো বিশেষণে আখ্যায়িত করা বর্জন করতে হবে। কোনো আলিম বা ইসলামী ব্যক্তিত্ব আপনার মতের বিরোধিতা করলে, আপনার সাথে শত্রুতা করলে বা আপনার বিরুদ্ধে ফাতওয়া দিলে আপনি তাকে ইসলামের শত্রু বলে গণ্য করবেন না। বরং বিষয়টিকে তার ইজতিহাদ ও ভুল বলে গণ্য করে হৃদয়ে তার ভালোবাসা, কর্মে তার সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ও তার জন্য দুআ অব্যাহত রাখুন।

আল্লাহ বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"হে মুমিনগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস-বিদ্রুপ না করে; হতে পারে তারা বিদ্রুপকারীদের চেয়ে উত্তম। কোনো নারী যেন অন্যনারীকে বিদ্রুপ-উপহাস না করে; হতে পারে সে বিদ্রুপকারিনী অপেক্ষা উত্তম। আর তোমরা একে অপরকে নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপাধি দিয়ে ডেকো না। ঈমানের পর পাপী নাম পাওয়া খুবই খারাপ বিষয়। আর যারা তাওবা করে না তারাই যালিম"।[১]

এ নির্দেশনা কার জন্য? আল্লাহর এ নির্দেশ কি পারস্পরিক (reciprocal) ? অর্থাৎ যে আমাকে ভাল বলবে আমি তাকে ভাল বলব? নাকি এ নির্দেশ পালন আমার-আপনার সার্বক্ষণিক দায়িত্ব? অন্যরা আপনাকে উপহাস-বিদ্রুপ করে, নিন্দা করে বা মন্দ উপাধি দেয় বলে আপনিও তাদেরকে অনুরূপ করবেন? এরূপ কোনো অনুমতি কি আল্লাহ দিয়েছেন? কেউ পালন করুক আর না করুক, আমি সর্বাবস্থায় আল্লাহর এ সকল নির্দেশ পালন করব-এরূপ সিদ্ধান্ত কি আমরা নিতে পারি না?

---

১. সূরা আল-হুজুরাত: ১১

দীন প্রতিষ্ঠার কর্মে নিয়োজিত সকলকেই বুঝতে হবে যে, আমরা "আল্লাহর পথে দাওয়াত" নামক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পালন করছি। এ ইবাদত যদি কুরআন-সুন্নাহর শেখানো পদ্ধতিতে সুন্নাহ-সম্মত পন্থায় পালন করতে পারি, তবে আমরা অভাবনীয় সাওয়াব অর্জন করতে পারব। বিশেষত কুফর, ইলহাদ, ব্যক্তিমতপূজা, স্বার্থপরতা ও অবক্ষয়ের যুগে দাওয়াত ও আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব পালন খুবই বড় কাজ। এ পরিস্থিতিতে সুন্নাত পদ্ধতিতে দাওয়াতের দায়িত্ব পালনকারী একজন মুমিন ৫০ জন সাহাবী বা সিদ্দীকের সাওয়াব লাভ করবেন বলে সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এ ইবাদত কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পদ্ধতির ব্যতিক্রমভাবে পালন করি বা আমাদের প্রবৃত্তি ও প্রতিশোধস্পৃহার তাড়নায় উগ্রতায় লিপ্ত হই তাহলে আমরা কঠিন পাপে নিপতিত হওয়ার পাশাপাশি ইসলাম ও দীনী দাওয়াতকে কলঙ্কিত করব এবং প্রকৃত অর্থে আমরাই আল্লাহর কাছে "ইসলামের শত্রু" বলে গণ্য হব। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক!

মুমিনের আচরণ ও প্রকৃতি বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ

"মুমিন ঐ ব্যক্তি যে নিজে অন্যদের ভালোবাসে এবং অন্যেরাও তাকে ভালোবাসে। যে ব্যক্তি নিজে অন্যদের ভালোবাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালোবাসে না তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই"।[১]

মুমিনের এ প্রকৃতি কাদের জন্য? যারা তার দলের, মতের বা তাকে ভক্তি করে তাদের জন্য? না জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য?

দেশের প্রায় ৯০% মুসলিম দীন সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা রাখেন না। তারা ইসলাম বলতে যা বুঝেন তা তারা পালন ও প্রতিষ্ঠা করেন। তাদেরকে ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করা আলিম ও দায়ীগণের দায়িত্ব। কষ্ট করে দীনের দাওয়াত না দিয়ে আপনি রাতারাতি ইসলাম কায়েম করতে চান? পাপের কারণে আপনি পাপীদেরকে মেরে কমিয়ে ফেলতে চান? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদেকে বাঁচাতে উদগ্রীব ছিলেন, হয়ত তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্য থেকে কেউ মুসলিম হবে। মক্কাবাসীদের অত্যাচারে জর্জরিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে যেয়ে পেলেন নির্মমতম অত্যাচার। সে সময়ে জিবরাইল আলাইহিস সালাম পাহাড়ের ফিরিশতাকে নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করে

১. আলবানী, সহীহুল জামি, ২/১১৩০-১১৩১। হাদীসটি হাসান।

বলেন, আপনার অনুমতি হলে পাহাড় উঠিয়ে এ সকল জনপদ ধ্বংস করে দেয়া হবে। কঠিনতম কষ্টের সে মুহূর্তেও তিনি বরেন,

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

"না। বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ হয়ত এদের ঔরস থেকে এমন মানুষের জন্ম দেবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কিছু শরীক করবে না"।[১]

যে কাফিররা তাঁর দেহকে রক্তরঞ্জিত করছে তাদেরই জন্য তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, যেন তাঁকে আঘাতের কারণে আল্লাহ তাদের ধ্বংস না করেন। তিনি তাঁর কপালের রক্ত মুছছেন এবং বলছেন,

رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"হে আমার প্রতিপালক, আমার জাতিকে আপনি ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না"।[২]

ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা দেখি যে, সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অন্যায় পরিবর্তনের আবেগ, দ্রুত ফল লাভের উদ্দীপনা বা অন্যায়ের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা ইত্যাদির কারণে আবেগী হয়ে যারা সন্ত্রাস, সহিংসতা বা যুদ্ধের পথ বেছে নিয়েছেন তারা ইসলামের কোনো কল্যাণ করতে পারেন নি। খারিজীগণ, বাতিনীগণ ও অন্যান্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তাদের অনুসারীদের অনেক গরম ও আবেগী কথা বলেছেন এবং অনেক 'পরিবর্তনের' স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তারা স্বল্প সময়ের কিছু ফিতনা ছাড়া কিছুই করতে পারেন নি। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থা কিছু আলিমগণ বিদ্রোহ, উগ্রতা, শক্তিপ্রয়োগ, জোরপূর্বক সরকার পরিবর্তন ইত্যাদি পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণ ও সরকারকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের মাধ্যমে যুগে যুগে মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করেছেন।

(এই লেখাটি আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত সম্মানিত লেখকের "ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ" শীর্ষক গ্রন্থের ২৪৭-২৬৭ পৃ. থেকে নেয়া হয়েছে। লেখাটি কিছুটা সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত। আল্লাহ তা'আলা লেখককে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।)

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৩/১১৮০; সহীহ মুসলিম: ৩/১৪২০
২. সহীহ আল-বুখারী: ৩/১২৮২; সহীহ মুসলিম: ৩/১৪১৭

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ সংস্থাসমূহের ঘোষণা ও প্রস্তাবনা : একটি পর্যালোচনা

قرارات المجامع الفقهية العالمية ضد الإرهاب والترويع : دراسة تأصيلية

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থা বর্তমান সময়ে বিশ্বের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ও সমস্যা। কিছুসংখ্যক বিপথগামী ও বিভ্রান্ত মুসলিম তরুণদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও মনোভাবের কারণে অনেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কালিমা লেপন করতে দ্বিধা করছেন না। অথচ ইসলাম কখনোই সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থাকে সমর্থন তো করেইনি, বরং এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছে। আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহয় এর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ একাডেমি ও কাউন্সিলসহ বিশ্বের প্রথিতযশা মুসলিম স্কলারগণ সকল প্রকার সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা দিয়েছেন এবং সিদ্ধান্তাবলী প্রণয়ন করেছেন। এ প্রবন্ধে সে সব ঘোষণা ও সিদ্ধান্তাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হবে।

প্রথমত : ওআইসির আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমির সিদ্ধান্তাবলী :

আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি হচ্ছে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-এর ফিক্‌হ বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের বড় বড় ফকীহ ও স্কলারদের সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি গঠিত ও পরিচালিত। সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থা বিষয়ে এর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অধিবেশনে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে স্বল্প পরিসরে তার কিয়দংশ তুলে ধরা হচ্ছে।

(ক) মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক সহিংসতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ একাডেমির ১২৮ (২/১৪) নং সিদ্ধান্তের ভাষ্য হলো:

কাতারের দোহা নগরীতে ১৪২৩ হি: সালের ৮-১৬ জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত ওআইসি আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্‌হ একাডেমি চতুর্দশ অধিবেশনে মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক সহিংসতার বিষয়ে উপস্থাপিত গবেষণা কর্মসমূহ সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হয়ে ও সেগুলোর পর্যালোচনা শ্রবণ করে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করে :

১. ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মানিত করেছে এবং মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা ও তার সম্মান বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। ইসলামী ফিক্‌হই হলো বিশ্বের প্রথম আইনী বিধান যা শান্তি ও যুদ্ধ উভয় অবস্থায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করছে।

২. সন্ত্রাস হচ্ছে রাষ্ট্র কিংবা গোষ্ঠি অথবা ব্যক্তি কর্তৃক কোনো মানুষের ধর্ম, প্রাণ, মর্যাদা, বুদ্ধি-বিবেক কিংবা সম্পদের ওপর অন্যায়ভাবে নিবর্তন ও পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির নানা মাধ্যমে শারীরিক কিংবা পরোক্ষভাবে চড়াও হওয়া।

বাড়াবাড়ি, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা সম্পর্কে ২০০৬ সালের ২৪-২৮ জুন তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ একাডেমির সপ্তদশ অধিবেশনে ১৫৪ (৩/১৭) নং সিদ্ধান্তের ১ হতে ৩ নং উপধারায় বলা হয়েছে:

১. সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও এর চর্চা করা হারাম। এগুলো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচিত যা ডাকাতি ও রাহাজানিজনিত অপরাধের আওতায় পড়ে, যেখানেই তা ঘটুক আর যারাই তা ঘটাক। আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে কিংবা এর উপকরণ যোগান দেয় অথবা অর্থায়ন বা সহযোগিতা করে, তারাই সন্ত্রাসী বলে পরিগণিত হবে, চাই তা একক ব্যক্তিই করুক কিংবা গোষ্ঠি অথবা রাষ্ট্র। সন্ত্রাস কখনো আবার এক বা বহু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অন্য রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতে পারে।

২. সন্ত্রাসজনিত অপরাধ ও আইনীভাবে গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আইনসম্মত প্রতিরোধের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে; কেননা যুলুম দূর করা ও হারানো অধিকার পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আগ্রাসনের প্রতিরোধ করা হয়ে থাকে। আর তা আইনসম্মত ও বিবেকসম্মত একটি অধিকার এবং আন্তর্জাতিক দলীল-প্রমাণ দ্বারাও স্বীকৃত।

৩. যে সব কারণ সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেয় তা প্রতিহত করা ওয়াজিব। এসব কারণের পুরোভাগে রয়েছে বাড়াবাড়ি, চরমপন্থা ও গোঁড়ামী, ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানুষের রাজনৈতিক ও চিন্তার স্বাধীনতা হরণ, বঞ্চনা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়...”।

২০০৩ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত ফিক্‌হ একাডেমির চতুর্দশ অধিবেশনে সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু প্রস্তাব পেশ করে। সেগুলোর মধ্যে ১-৬ নং ধারা খুবই প্রণিধানযোগ্য :

১. সন্ত্রাস মোকাবেলা ও এর কারণগুলো প্রতিকারের উদ্দেশ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য উলামা, ফুকাহা, ধর্ম প্রচারক এবং পাবলিক ও প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুসংহত করা।

২. সুচারুভাবে সংবাদের রিপোর্ট তৈরী করে তা প্রচারের জন্য প্রচারমাধ্যমসমূহের প্রতি আহ্বান রাখা, বিশেষ করে এটি বেশী প্রয়োজন সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে। আর ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সংযোগ স্থাপন পরিহার করা; কেননা অন্য সব ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারীদের পক্ষ থেকেও সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে।

৩. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ইসলামের সে উজ্জ্বল চিত্রটি তুলে ধরার প্রতি আহ্বান জানানো যা সম্প্রীতি, ভালোবাসা, অন্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও কল্যাণের কাজে সহযোগিতা করার মত মূল্যবোধের দিকে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে।

৪. অত্র বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি বিষয়ের উপর বিশেষ সেমিনার, প্রচুর লেকচার ও বিস্তারিত একাডেমিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করার প্রতি ফিক্হ একাডেমির প্রতি আহ্বান জানানো যাতে সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা এবং তা মূলোৎপাটনের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান বর্ণনা করা যায়। আর এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দিককে অন্তর্ভূক্ত করে দ্রুত একটি ব্যাপক শরয়ী সমাধান তৈরী করা যায়।

৫. সন্ত্রাস প্রতিরোধের প্রচেষ্টা বৃদ্ধি এবং সন্ত্রাসের মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো সহ একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করার জন্য জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান করা, যাতে একই নীতি ও স্ট্যান্ডার্ড অবলম্বন করে সকল প্রকার সন্ত্রাসকে প্রতিহত করা যায়।

৬. পৃথিবীর সকল দেশ ও সরকারের প্রতি এ আহ্বান রাখা যে, তারা যেন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেয় এবং রাষ্ট্র দখল ও বিভিন্ন জাতির অধিকার হরণ থেকে বিরত হয়। আর সাম্য, শান্তি ও ন্যায়ের ভিত্তিতে নিজেদের পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলে।

দ্বিতীয়ত: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের অধীনস্ত ইসলামী ফিক্হ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তসমূহ:

মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইসলামী ফিক্হ কাউন্সিল। ইসলামের নানা বিষয়ে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বের খ্যাতনামা স্কলারদের সমন্বয়ে গঠিত ফোরামের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। এর সদর দফতর হলো মক্কা মুকাররমায়। সউদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতি এর অধিকাংশ সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করেছেন এবং এখনো করছেন। ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসের ৫-১০ তারিখে এ সংস্থার ষষ্ঠদশ অধিবেশনে ফিক্হ কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত মক্কা ঘোষণায় সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হয়। এ ঘোষণায় ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে বলা হয় :

"ইসলামী ফিক্হ কাউন্সিল নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, চরমপন্থা, সহিংসতা ও সন্ত্রাস কোনভাবেই ইসলামের অর্ন্তভুক্ত নয়। বরং এগুলো অত্যন্ত বিপদজনক ও ভয়ংকর কাজ। এ সবের মধ্যে রয়েছে মানুষের প্রতি নির্যাতন ও যুলুম এর বিস্তার। ইসলামী শরীয়তের দুই উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে যিনি গবেষণা করবেন, তিনি এ দুটোর মধ্যে এমন কোন চরমপন্থা, সহিংসতা ও সন্ত্রাসের কিছুই খুঁজে পাবেন না, যার মানে হল অন্যায়ভাবে অন্যদের উপর আক্রমণ করা।

কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ সন্ত্রাসবাদের এমন একটি সংজ্ঞা প্রণয়ন করতে আগ্রহী, যে সংজ্ঞার ব্যাপারে মুসলিমরা একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে এবং একমত হবে। এ

মৌলিক সংজ্ঞা তুলে ধরার জন্য এবং ইসলাম, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের বিপদটি স্পষ্ট করার জন্য ফিক্‌হ কাউন্সিল সবার সামনে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা ও এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান তুলে ধরছে"।

ঘোষণায় সন্ত্রাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

"সন্ত্রাস হল অন্যায়ভাবে ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের ধর্ম, প্রাণ, বিবেক-বুদ্ধি, সম্পদ ও মর্যাদা ইত্যাদির উপর আক্রমণ করা। ভীতি প্রদর্শন, কষ্ট দেয়া, ডাকাতি, রাস্তা-ঘাটে ভয় দেখানো, অকারণ হয়রানি, রাহাজানি, সহিংসতা ও হুমকি দেওয়া ইত্যাদি প্রতিটি কাজই এ সন্ত্রাসের মধ্যে শামিল; হোক তা ব্যক্তিগত অথবা সামষ্টিক কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সংঘটিত। এর লক্ষ্য হল, মানুষের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করা, ভীতসন্ত্রস্ত করা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা বা সার্বিক অবস্থাকে বিপদের মুখে ফেলে দেয়া। সন্ত্রাসের নানা রকমের মধ্যে আরো রয়েছে পরিবেশ, অথবা জাতীয় কিংবা ব্যক্তিগত কোন স্থাপনার ক্ষতি সাধন করা, অথবা জাতীয় কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের কোন উৎসকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া। এসব কিছুই পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিরই অন্তর্গত, যা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদেরকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

"আর যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না"।[১]

আল্লাহ তা'আলা সন্ত্রাস, সীমালঙ্ঘন ও ফাসাদকে প্রতিহতকারী শাস্তির বর্ণনা শুরু করে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ হিসেবে একে গণ্য করেছেন। আল কুরআনের মহান বাণীতে এসেছে :

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমিনে ফাসাদ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে

---

১. সূরা আল-কাসাস: ৭৭

কিংবা বিপরীত থেকে তাদের হাত বা পা কেটে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা আযাব"।[১]

মানুষের তৈরী আইনের কোথাও এমন কঠিন শাস্তি পাওয়া যায় না। ইসলামী শরীয়ায় একে আল্লাহর সীমারেখা ও তার সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; বিধায় এ সীমালঙ্ঘনের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে"।

ফিক্‌হ কাউন্সিল চরমপন্থা, সহিংসতা ও সন্ত্রাস দমনে ইসলামী পদ্ধতি নিয়েও বেশকিছু প্রস্তাবনা এ ঘোষণা পেশ করে। নিচে সেটি তুলে ধরা হল :

"যাবতীয় অকল্যাণ থেকে সমাজ গুলোকে হেফাযতের ক্ষেত্রে সকল নিয়ম কানুনের চেয়ে ইসলামই এগিয়ে আছে। এর পুরোভাগে রয়েছে মানুষের হেফাযত, তার জীবন, সম্মান, সম্পদ, ধর্ম ও বিবেক-বুদ্ধির হেফাযত। সুস্পষ্ট সীমারেখা ও বিধিবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে এগুলোর হেফাযত নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সব সীমারেখা লঙ্ঘন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যারা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করে তারাই যালিম"।[২]

সকল মানুষের প্রতি এ হল একটি সাধারণ নির্দেশনা।

এ সম্মান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলাম মানুষকে নিষেধ করেছে তার ভাই অন্য মানুষের উপর জুলুম করতে এবং সে সব কর্মকাণ্ড হারাম করে দিয়েছে যা মানুষের প্রতি যুলুম ও নির্যাতন আরোপ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

"বল আমার রবতো হারাম করে দিয়েছেন প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা, পাপ এবং অন্যায় ভাবে সীমালঙ্ঘন"।[৩]

আর ইসলাম সেই সব লোকদের নিন্দা করেছে যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানুষকে কষ্ট দেয়। এটাকে ইসলাম মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩৩
২. সূরা আল-বাকারাহ্: ২২৯
৩. সূরা আল-'আরাফ: ৩৩

﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

"আর যখন সে ফিরে যায়, তখন যমিনে ফাসাদ করাতে এবং শস্য ও প্রাণী ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়। আর আল্লাহ ফাসাদকে পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর তখন আত্মগৌরব তাকে পাপ করতে উৎসাহ যোগায়। সুতরাং জাহান্নাম তার জন্য যথেষ্ট এবং তা কতই না মন্দ ঠিকানা"।[১]

যা কিছু মানুষের মধ্যে ফেতনার সৃষ্টি করে তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে এবং তার সকল বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"আর তোমরা ভয় কর ফেতনাকে যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষ ভাবে শুধু যালেমদের উপরেই আপতিত হবেনা। আর জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর"।[২]

ইসলাম সব সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের নির্দেশ দেয়। গোঁড়ামী ও চরমপন্থার মূলোৎপাটনের জন্য ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে; কেননা চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ির মধ্যে নিশ্চিত ধ্বংস নিহিত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ

"তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাক, কেননা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে ধ্বংস করেছে"।[৩]

যে খারাপ প্রবণতাগুলো ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস, আতঙ্ক সৃষ্টি ও অন্যায় ভাবে হত্যা করার দিকে ঠেলে দেয় ইসলাম তার সমাধান দিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্: ২০৫-২০৬
২. সূরা আল-আনফাল: ২৫
৩. সুনান আন-নাসাঈ: ৩০৫৭

"কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয় অন্য কোন মুসলিমকে আতঙ্কিত করা"।[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন :

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি লোহা দিয়ে (আঘাত করার) ইশারা করে, সে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ লানত করতে থাকে, যদিও ঐ ব্যাক্তি তার সহদোর হয়ে থাকে"।[২]

আল্লাহ আহলুয যিম্মাহ (তথা মুসলিম দেশে বসবারত অমুসলিমদের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফের সাথে) মু'আমালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদুপরি তাদের জন্য অধিকার নির্ধারণ করেছেন, তাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, মুসলিম দেশসমূহে তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং তাদের কাউকে ভুলক্রমে হত্যা করলে দিয়াত ও কাফফারা ওয়াজিব করেছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾

"আর সে (নিহত ব্যক্তি) যদি হয় এমন সম্প্রদায় এর লোক, তোমাদের ও যে সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে চুক্তি, তাহলে তার পরিবারের কাছে দিয়াত হস্তান্তর করতে হবে এবং একজন মুমিন দাস আযাদ করতে হবে"।[৩]

ইসলাম মুসলিম দেশসমূহে বসবাসরত যিম্মি ব্যক্তির হত্যাকে হারাম ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবেনা"।[৪]

আল্লাহ অমুসলিমদের প্রতি ইহসান ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা থেকে মসুলিমদেরকে নিষেধ করেনি, যদি অমুসলিমরা তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হয় এবং তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি হতে বহিস্কৃত না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

---

১. সুনান আবু দাউদ: ৫০০৬
২. সহীহ মুসলিম: ৬৮৩২
৩. সুরা আন-নিসা: ৯২
৪. সহীহ আল-বুখারী: ৩১৬৬

"যারা তোমাদের সাথে দ্বীন-ধর্ম নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিস্কৃত করেনি, সেসব লোকদের সাথে ভাল আচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন"।[১]

আহলুয যিম্মাহ, অমুসলিম শরণার্থী ও অন্যান্যদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা ন্যায় নীতি রক্ষা করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"কোন সম্প্রদায়ের সাথে শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায়পন্থা অবলম্বন না করতে উস্কে না দেয়, তোমরা ন্যায়পরায়ণ হও। এটাই তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা সম্পর্কে অবহিত"।[২]

এ জন্য বিশ্বের সামনে ফিক্‌হ কাউন্সিল ঘোষণা করছে, অন্যায়ভাবে একটি মাত্র প্রাণ সংহার করা ইসলামে নির্মমতার দিক দিয়ে সকল মানুষকে হত্যার সমান, চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী থেকে এটাই স্পষ্ট।

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"ঐ কারণে আমি বনী ঈসরাইলের উপর ফরয করে দিলাম যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া এমনিতেই কাউকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করলো, আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণকে বাঁচাল, তা হলে যেন সে সকল মানুষকেই বাঁচাল"।[৩]

আর ফৌজদারী শাস্তি ও কিসাস বাস্তবায়ন করা শাসকদের কর্তব্য। এটা ব্যক্তি কিংবা কোন দলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

২০০৩ সালের ১৩-১৭ ডিসেম্বর ফিক্‌হ কাউন্সিলের সপ্তদশ অধিবেশনে সন্ত্রাসবাদের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যে বলা হয়েছে :

---

১. সুরা আল-মুমতাহিনা : ৮
২. সুরা আল মায়িদা: ৮
৩. সূরা আল-মায়িদা: ৩২

"কোন কোন মুসলিম সমাজে বাড়াবাড়ি ও সন্ত্রাস থাকার অনেক কারণ আছে। কোন সুনির্দিষ্ট পরিবেশ কিংবা সময়ে এ সকল কারণই একসাথে পাওয়া যেতে পারে। আর এ কারণগুলো পরিবেশ ও সময়ের পরিবর্তন ভেদে বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কিছু আছে এমন কারণ যা শিক্ষানীতি (Academic Methodology)-এর সাথে সম্পৃক্ত, যেমন তা'বীল বা ভুল ব্যাখ্যা এবং 'মুতাশাবিহ' বা অবোধগম্য শব্দের অনুসরণ। অথবা ব্যবহারিক নীতিমালা (Practical Methodology)-এর সাথে সম্পৃক্ত। যেমন-গোঁড়ামী ও এ ধরনের কোন আচরণ।

এসব কারণ চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার এমনই একটি একাডেমিক কাজ, যাতে বিশেষজ্ঞগণের সম্পৃক্ততা জরুরী, তারা জ্ঞানের আলোকে বাস্তবতাকে অধ্যয়ন করবেন। ফলে কোন বক্তব্যই চিন্তাভাবনা ছাড়া দেওয়া হবে না। কাউন্সিল লক্ষ্য করেছে যে, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদের কারণ সম্পর্কে লেখনীগুলোর মধ্যে বহুবিধ বিভ্রান্তি রয়েছে। সুতরাং জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেকের আলোকে সেগুলোর পুনঃনিরীক্ষণ ও প্রতিকারের পন্থাসমূহ প্রণয়ন প্রয়োজন। কাউন্সিল মনে করে যে, এ কারণগুলোর পুরোভাগে রয়েছে :

১) অত্যন্ত দুর্লভ ফাতওয়া এবং দুর্বল ও কাল্পনিক বক্তব্যের অনুসরণ করা। আর এমন ব্যক্তি থেকে ফাতওয়া ও দিকনির্দেশনা নেওয়া, যার জ্ঞান ও দ্বীনদারীর প্রতি আস্থা রাখা যায় না। আর পাশাপাশি এসব ফাতওয়া ও বক্তব্যের প্রতি গোঁড়ামী প্রদর্শন। এটা সমাজে বিশৃঙ্খলার প্রসার ঘটিয়েছে, প্রশাসনিক নির্দেশকে দুর্বল করে দিয়েছে, যার উপর ভিত্তি হল মানুষের দৃঢ় অবস্থান, জীবন-ধারণের সার্বিক কল্যাণ ও তাদের দ্বীনের হেফাযত।

২) দ্বীনের বিরোধিতায় চরমপন্থা অবলম্বন, দ্বীনের প্রতি অপবাদ আরোপ, উপহাস ও হাসি-ঠাট্টা করা, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে দ্বীনকে দূরে রাখার স্পষ্ট ঘোষণা, নাস্তিক ও বিচ্যুত লোকেরা দ্বীনের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ করছে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়া, দ্বীনের স্কলার ও আলেমগণ কিংবা তাদের লিখিত গ্রন্থের দোষত্রুটি ধরা, দীন শেখা ও শেখানো থেকে মানুষকে অনুৎসাহিত করা।

৩) কোন কোন মুসলিম সমাজে বিশুদ্ধ, সহীহ দ্বীনের দিকে আহ্বানের পথে অনেক অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে। অথচ দ্বীনের মূল সনদই হল আল-কুরআন, আস-সুন্নাহ ও এ উম্মাহর সালাফে সালেহীন তথা সাহাবা, তাবেঈন ও গ্রহণযোগ্য ইমামগণের বুঝের আলোকে বিবেচিত শরীয়তের মূলনীতি।

কেননা দীনদারী হল এমনই এক স্বভাব যার উপর আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন সুযোগ তাদের নেই। অতএব যখনই তারা

সহীহ দীনের জ্ঞান ও আমল থেকে বঞ্চিত হবে, তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে, কুসংস্কার এবং প্রবৃত্তির লালসার পেছনে পড়বে।

৪) কোন কোন সমাজে চলমান যুলম-নির্যাতন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও চাকুরীর মত মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করার সুযোগ না থাকা, বেকারত্বের প্রসার ও কর্ম পরিধির সংকীর্ণতা, কিংবা অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও মানুষের ইনকাম কমে যাওয়া। এসব কিছুই হল ক্রোধ, প্রতিবাদ ও কষ্ট ভোগের কারণ যা এমন সব অপরাধমূলক কাজের দিকে ঠেলে দেয় যার পরিণাম ভালো নয়।

৫) মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী শরীয়ার বিধান বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন-কানুন দিয়ে পরিচালনা করা; অথচ ইসলামী শরীয়াই মানুষের কল্যাণকে নিশ্চিত করে এবং মুসলিম ও তাদের দেশে বসবাসকারী অমুসলিমদের জন্য ন্যায়বিচার পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে। কেনই বা করবে না? কারণ এটা তো হলো সেই শরীয়াহ যার সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

“বাতিল এর সামনে থেকেও আসে না এবং পিছন থেকেও নয়। এটা মহাপ্রাজ্ঞ প্রশংসিতের পক্ষ থেকে অবতারিত”।[১]

৬) আগ্রাসনের প্রবণতা ও নেতৃত্বের লোভ যা কিছু সংখ্যক বেপরোয়া লোককে এ ধরণের কাজ করার দিকে ঠেলে দেয়, যাতে শরীয়ত ও কোন প্রকার আইন, শৃঙ্খলা ও বাইয়াত ছাড়াই তাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়।

ফিক্‌হ কাউন্সিলের উক্ত ঘোষণায় সন্ত্রাসবাদের পরিণাম ও ফলাফল তুলে ধরে বলা হয়েছে :

“সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হল ব্যক্তি ও সম্পদের উপর একটা আগ্রাসন, পথে-ঘাটে সংঘটিত ডাকাতি, নিরাপদ লোকদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার। বরং এটা দ্বীনের বিরুদ্ধেও একটা আগ্রাসন; কেননা এতে দ্বীনকে এভাবে চিত্রিত করা হয় যে, মানুষের পবিত্র জান ও মালকে সংহার করা দ্বীনের একটা জায়েয কাজ, দ্বীন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধীদের সাথে সমস্যা ও মতবিরোধের সমাধান চায় না। অনুরূপভাবে মুসলিমদেরকে এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, তারা অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিতকারী জাতি, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, শান্তি, সভ্যতার মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের জন্য এরা বিপদ তৈরী করে। এটা সেসব ক্ষতি ও বিপর্যয়ের দিকে

---

১. সূরা ফুস্‌সিলাত: ৪২

ঠেলে দেয় যা মুসলিম উম্মাহর শান্তি, নিরাপত্তা, ইসলামের বাণী প্রচারে ও মানবাধিকার রক্ষায় উম্মাহর অগ্রসর ভূমিকা পালনে বাধা সৃষ্টি করে। একই সাথে অন্যান্য জাতির সাথে মুসলিমদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষতিসাধন করে এবং অমুসলিম দেশসমূহে বসবাসরত মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে এক ঘরে করে দেয়, অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, চাই এসব মুসলিম ঐসব দেশের নাগরিক হোক কিংবা পড়াশুনা, ব্যবসা, ভ্রমণ, দূতাবাসের চাকরী করা অথবা আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করুক।"

ফিক্হ কাউন্সিলের উক্ত ঘোষণায় ধ্বংস করা, হুমকী দেয়া ও বোমা বিস্ফোরণের ন্যায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শরয়ী বিধানও বর্ণনা করা হয়েছে :

"যে সব আবাস গৃহে নিরপরাধ ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত জনসাধারণ বসবাস করছে, চাই তারা মুসলিম হোক কিংবা আন্তর্জাতিক চুক্তি ও প্রতিশ্রুতির আলোকে প্রশাসন কর্তৃক নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত অমুসলিমই হোক, সেগুলোসহ অন্যান্য স্থাপনা ও সেতুতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরিচালিত ধ্বংসাত্মক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, বিমান ও রেলগাড়ীসহ যাবতীয় বাহন ছিনতাই, এগুলো ব্যবহারকারীদের জীবনকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়া অনেকগুলো হারাম অপরাধের অন্তর্গত যা ইসলামী শরীয়ায় কবীরা গুনাহ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড হিসাবে পরিগণিত। এসব কাজে যারা সরাসরি লিপ্ত হয়; যারা পরিকল্পনা করে, অর্থ দেয়, অস্ত্র দেয়, এদের পক্ষে প্রচারণা চালায়, মহান শরীয়ত প্রণেতা তাদের বিরুদ্ধে বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং এগুলোর উপর ভয়াবহ শাস্তি ধার্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহা আযাব"।[১]

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩৩

সব শেষে উক্ত ঘোষণায় চরমপন্থা ও এ থেকে উদ্ভূত সন্ত্রাসী ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের উপায় ও পন্থা নিম্নোক্তরূপে তুলে ধরা হয় :

(১) যে কারণগুলো অপরাধ করার দিকে ঠেলে দেয় সেগুলো দ্রুত অপসারণের ব্যবস্থা করা এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য কাজ করে যাওয়া। আর আল্লাহ তা'আলার শরীয়ত অনুযায়ী বিচার করা ও যমীনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা বাস্তবায়ন করা। কেননা বান্দাদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ও তাদের বিপর্যয় রোধ করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ ও সার্বিক আইনী ব্যবস্থা আর নেই। এছাড়াও এর চেয়ে অধিক দয়াশীল, ন্যায়ানুগ আর কোন আইনব্যবস্থা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

"আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রণয়নে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম"?[১]

(২) সহিংসতা, ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ফলে রাষ্ট্র, জাতি, সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা।

(৩) জ্ঞানী, গুণীজন, শুদ্ধাচারী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে সুপরিকল্পিত লক্ষ্যে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য একটি সহজ স্পষ্ট ব্যবহারিক ম্যানুয়াল তৈরি করা।

(৪) শরয়ী পরিভাষাসমূহ লিপিবদ্ধ করা ও স্পষ্ট নীতিমালা দ্বারা এগুলোকে সুসংহত করা। যেমন- জিহাদ, দারুল হারব, উলুল আমর (তথা মুসলিম প্রশাসক), আর যে অধিকার উলুল আমরের জন্য সাব্যস্ত হয় এবং যে দায়িত্ব তার উপর বর্তায়, 'উহূদ বা প্রতিশ্রুতি : চুক্তি করা ও তা ভঙ্গ করা প্রভৃতি"।

আন্তর্জাতিক ফিক্‌হ একাডেমি ও মক্কাস্থ ইসলামী ফিক্‌হ কাউন্সিলের উপরিউক্ত আলোচনায় সন্ত্রাস, সহিংসতা, বাড়াবাড়ি, নাশকতা, জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থার ব্যাপারে বিশ্ব মুসলিম স্কলারদের মনোভাব, মতামত ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অতএব ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠিকে এসবের তকমা লাগিয়ে দেয়া বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণদের কাজ নয়, বরং এমনটি করা রীতিমত অন্যায়ও বটে।

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৫০

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এবং খারিজী চিন্তাধারা : একটি পর্যালোচনা

الترويع والإرهاب وأفكار الخوارج : دراسة تأصيلية

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও

চেয়ারম্যান

সাউদী ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বাংলাদেশ

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ শব্দ দুটি ইদানিং আমাদের কাছে অতি পরিচিত অতি ব্যবহৃত। বর্তমান বিশ্বে এই শব্দ দুটি বড় ধরনের আতঙ্ক। এই আলোচনায় আমরা শব্দ দুটির শাব্দিক বিশ্লেষণ করার খুব বেশী প্রয়োজন মনে করিনা। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বলতে সাধারণত বুঝায় বেআইনি সহিংসতা ও খুন-খারাবি। কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য উগ্রতা ও চরমপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা। সন্ত্রাস থেকে জঙ্গীবাদ শব্দটি অর্থগত দিক দিয়ে ভয়াবহ। জং শব্দ থেকে জঙ্গীবাদের ব্যবহার। জং শব্দের অর্থ যুদ্ধ বা লড়াই। জঙ্গী অর্থ যোদ্বা বা লড়াকু। জঙ্গীবাদী বলতে যারা কোন উদ্দেশ্যে সহিংস লড়াই বা আক্রমণে লিপ্ত হয় তাদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে। প্রচলিত পরিভাষায় যারা ইসলামের নামে বা ইসলামী রাষ্ট্রের নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুন-খারাবিতে লিপ্ত তাদেরকে জঙ্গী বলে। আর যারা প্রচলিত সাধারণ রাজনৈতিক দলের নামে বা কোন দল, মতবাদ বা আদর্শের নাম না নিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুন-খারাবিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে।[১]

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকরণ

সন্ত্রাস শব্দটি ত্রাস থেকে উদ্ভুত হওয়ার কারণে সন্ত্রাস বলতে আতঙ্কগ্রস্ত করা, ত্রাস সৃষ্টি করা ও ভীতিকর পরিবেশ তৈরী করাকে বুঝায়। মূলত শাব্দিকভাবে শব্দ দুটির যেই অর্থই হোক না কেন উদ্দেশ্যেগতভাবে শব্দ দুটি প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আরবীতে সন্ত্রাসবাদ বুঝানোর জন্য إرهاب শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। إرهابي বলতে সন্ত্রাসীকে বুঝানো হয়ে থাকে। ইংরেজিতে এর প্রসিদ্ধ পরিভাষা হচ্ছে টেরোরিজম। সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদ যে শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন এর মধ্যে সহিংসতা খুন-খারাবি ও বেআইনি হত্যাযজ্ঞ রয়েছে। এর সংজ্ঞায় বা পরিচয়ে মতবিরোধ থাকলেও মূল কর্মকাণ্ডে সহিংসতা, হত্যাযজ্ঞ ও ত্রাস সৃষ্টি করা এগুলো রয়েছে। তবে এসব কর্মকাণ্ড ও সহিংসতার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন নাও হতে পারে। কেননা এসব কর্মকাণ্ড ধর্মীয় কারণেও হতে পারে অথবা রাজনৈতিক অথবা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে হতে পারে। তাই জঙ্গীবাদকে শুধুমাত্র ধর্মীয় উগ্রতা অথবা বিশেষভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা ও সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত করা বাস্তবতার পরিপন্থী ও বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা-চেতনা। উদ্দেশ্যমূলকভাবে অথবা সুনির্দিষ্টভাবে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠিকে জঙ্গীবাদী অথবা জঙ্গী অথবা সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করাও চরমপন্থার অনুসরণ। তাই জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস শব্দ

১. দেখুন, ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

দুটির প্রয়োগ ঢালাওভাবে না করে যারা এসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্যই ব্যবহার করা ঈমান ও ইনসাফের দাবী। বর্তমানে প্রিন্টিং মিডিয়াসহ বিভিন্ন মিডিয়ায় শব্দ দুটির অপপ্রয়োগ ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। তাই এসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞজনদের সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করা যেতে পারে।

ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের উত্থান

ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র মনোনীত দ্বীন । আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হল ইসলাম" ।[১]

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য একটি বড় নি'আমত, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমতকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে" ।[২]

ইসলাম শব্দটি السلام ও السلم থেকে উৎকলিত হয়েছে। এতে শান্তি, নিরাপত্তা, আপোষকামিতা ও সন্ধির অর্থ রয়েছে। ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে, অশান্তি ও আশঙ্কা নেই। সহিষ্ণুতা রয়েছে সহিংসতা নেই। সন্ধি ও আপোষকামিতা রয়েছে, বিরোধ ও বিবাদ নেই। ফলে ইসলাম মুসলিমদেরকে শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়। উগ্রতা ও উশৃঙ্খলতা শিক্ষা দেয়না। ইসলামের উজ্জ্বল ইতিহাসের দিকে তাকালে শান্তির বার্তা ও তার বাস্তবায়ন অক্ষরে অক্ষরে আমরা দেখতে পাই। ইসলাম কখনো মুসলিমকে উগ্র ও সন্ত্রাসী হতে উদ্বুদ্ধ করেনি। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে যারা রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতার আশ্রয় নিবে তাদেরকে মুসলিম সমাজ থেকে খারিজী নামে আখ্যায়িত করে থাকে। খারিজীরাই মূলত সর্বপ্রথম সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করেছিল। তারা তাদের বিভ্রান্ত চিন্তাধারার উপর ইসলামের নামে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনাকে অপব্যাখ্যা করে

---

১. সূরা আলে ইমরান: ১৯

২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৩

সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতার সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে ইসলামী সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় খারিজীদের ব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছেন। খারিজীদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও উগ্রতা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী বরং তারা মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিপদগামী। এই বিষয়ে স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে বলে গিয়েছেন।

আমরা খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম উগ্রতা ও সন্ত্রাসের ঘটনা দেখতে পাই। ৩৫ হিজরী সালে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান খলীফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। তার শাহাদাতের পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আনুগত্য শিকার করেন। শুধুমাত্র সিরিয়ায় নিযুক্ত গভর্নর মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আনুগত্যের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করেন। তিনি দাবী করেন আগে খলীফা ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যার বিচার হতে হবে। তারপর আমি বাইয়াত বা আনুগত্যের স্বীকৃতি দিব। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের ঐক্য ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার খাতিরে হত্যাকারীদের বিচার বিলম্বিত করেন। ফলে দুটি চিন্তাধারা তৈরী হয়। একদল খলীফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সমর্থন করেন। অপর পক্ষে সিরিয়ার অধিবাসীগণ মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু পক্ষে অবস্থান নেন। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। সিফ্‌ফিন প্রান্তরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। হতাহত হয় অসংখ্য মুসলিম। এক পর্যায়ে বিচক্ষণ খলীফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের অনর্থক রক্ত প্রবাহ হতে বাঁচার জন্য সমঝতার মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উভয় পক্ষ থেকে সালিসি মজলিস গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি শুরাহা করার জন্য এবং এর উপর ভিত্তি করে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হয়। কিন্তু অতি উৎসাহী একদল লোক আবেগপ্রবণ হয়ে এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে খলীফার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। তারা দাবি করে যুদ্ধ চলতে থাকবে, যেহেতু আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

“আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি

আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন”।[১]

এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তারা দাবি করে, আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে। যেহেতু মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দল সীমালঙ্ঘনকারী। তাই তাদের সাথে আপোস করা আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন,

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

“হুকুম শুধু আল্লাহর”।[২]

কাজেই মানুষের বিধান মেনে নেয়া কুরআনের বিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

“আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফির”।[৩]

এই আয়াতগুলোর অপব্যাখ্যা করে তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার অনুসারীদের কাফির মনে করেন এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর দল থেকে বেরিয়ে যায়। এখান থেকে খারিজীদের আবির্ভাব হয়। ইসলামী নির্দেশনার অপব্যাখ্যা দিয়ে এই গোষ্ঠী নিজেদেরকে বিভিন্ন অপতৎপরতা ও জঙ্গী তৎপরতার সাথে সম্পৃক্ত করে। এখান থেকে শুরু হয় ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও জঙ্গী তৎপরতা। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেন। ফলে নাহরাওয়ান নামক স্থানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপনিত হন এবং এ যুদ্ধে এদের সবাইকে হত্যা করেন। খারিজীদের জঙ্গী তৎপরতার বিরুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থান তাদের বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর অবস্থানকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত করে। অবশ্য আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে হত্যার আগে এই পথ থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানান এবং তাদের নিকট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ করে তাদের বিভ্রান্তিগুলো অপনোদনের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিকৃত চিন্তার

---

১. সূরা আল-হুজুরাত: ৯

২. সূরা আল-আন'আম: ৫৭

৩. সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪

কারণে তারা বিচ্যুত পথ থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হয় নি। বরং তাদের একজন নেতা ৪০ হিজরীর রমাযান মাসের ১৮ তারিখ ফজরের সালাতের পূর্বে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিষাক্ত তরবারীর মাধ্যমে আঘাত করে। ফলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করেন। তার এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বিপদগামী খারিজী সম্প্রদায় নিজেদেরকে সার্থক মনে করে এবং সাধারণ যুবসমাজকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে তাদের ধারাবাহিকতায় খারিজীরা ইসলামের নামে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তাদেও অবস্থানকে নিজেদের প্রবৃত্তের আনুকূল্যে বৈধ করে নেয়। তাদের এই কর্মকাণ্ড ও এইসব ব্যাখ্যার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক ছিল না। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে খারিজীরা ইসলামের সঠিক চিন্তাধারা থেকে বিপদগামী ও পথভ্রষ্ট ছিল।

১। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে হত্যা করেন। এটি প্রমাণ করে তাদের এসব জঙ্গী তৎপরতার ইসলামে সামান্যতম স্থান ছিল না।

২। তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের মধ্য হতে কেউ ছিলেন না। বরং তারা ইসলামের তৃতীয় প্রজন্মের আবেগপ্রবণ কিছু যুবককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এদের অধিকাংশই যুবক ও ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিল। এদের সাথে ইসলামের প্রকৃত কোন আলেম অংশগ্রহণ করেননি।

৩। তাদের গৃহীত কর্মপদ্ধতি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত কর্মপদ্ধতি থেকে ভিন্ন ও আলাদা ছিল। তারা কুরআন ও হাদীস থেকে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুকূলে কিছু বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত কর্মপদ্ধতি নিজেদের জন্য গ্রহণ করে যা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে আঙ্গুল দিয়ে ধরিয়ে দেন। ফলে ঐসব যুবকদের মধ্য থেকে ২০০০ যুবক সাথে সাথে সহীহ মানহায বা কর্মপদ্ধতিতে ফিরে আসে।

৪। তারা ইসলামের দাওয়াত ও ইবাদতের বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র সন্ত্রাসী ও জঙ্গী তৎপরতার সাথে নিজেদেরকে জড়িয়ে নেয়। ফলে তারা গুপ্তহত্যা বা আত্মঘাতী পথটিকে নিজেদের জন্য বেছে নেয় ও পরবর্তীদের জন্য চালু করে। যা ইসলামের ইতিহাসে তাদের পূর্বে কখনও সংঘটিত হয়নি। খারিজীদের এই বিকৃত কর্মপদ্বতির সাথে ইসলামী চিন্তাধারার সাথে সামান্যতম কোন মিল ছিল না। তারা নিজেদের জন্য নিম্নোক্ত কর্মনীতির অনুসরণ করে যা নিম্নে তুলে ধরা হল।

প্রথমত : তাকফীরী মানহাজঃ অর্থাৎ লোকদেরকে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে কাফির বানানো বা আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা করা। কেউ ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বাভাবিকভাবে তাকে মুসলিমই মনে করা হয়ে থাকে। তাকে কোন ভাবে কাফির বানানোর অপচেষ্টা ইসলামী চিন্তাধারায় নেই। সর্বপ্রথম খারিজী সম্প্রদায় মুসলিমদেরকে কাফির বানানো বা আখ্যায়িত করার চিন্তাধারা প্রবর্তন করে। তাদের এই মানহাজ বা কর্মপদ্বতি ইসলামী সহীহ ধারা থেকে অনুসৃত নয়। তাদের সবচেয়ে সাফল্যের জায়গা হলো অন্য কোন লোককে কাফির আখ্যায়িত করা। কারণ এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে প্রথমেই বিভক্তি তৈরী করা সম্ভব হয়।

প্রকৃত মুসলিম চাইবে অন্য কোন ব্যক্তিকে মুসলিম বানানোর জন্য, কিন্তু তারা যাকে তাকে কারণে অকারণে কাফির বানানোর অপপ্রয়াস চালিয়ে থাকে। এই কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে তাদের সর্বোচ্চ টার্গেট হচ্ছে মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার প্রধান অথবা সরকারকে কাফির ফতোয়া দেয়া। কারণ সরকারকে কাফির বানাতে পারলেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের জন্য সকল প্রকার হত্যাযজ্ঞ ও সন্ত্রাসী তৎপরতার বৈধতার সুযোগ আছে বলে মনে করে। তারা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সরকারকে তাকফীর (কাফির প্রতিপন্ন) করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। মূলত সহীহ ইসলামী চিন্তাধারায় এই ধরনের তৎপরতার কোন স্থান নেই।

ইসলাম মানুষকে আহ্বান জানায় ইসলামের দিকে আসার জন্য, কাফির বানানোর জন্য ইসলাম কোন ধরনের প্রচেষ্টা চালায় না। অথচ খারিজী ও বিদ'আতী চিন্তাধারায় কাফির বানানোর অপচেষ্টাই মূখ্য কর্মনীতি। ফলে আমরা আমাদের সমাজের বিদ'আতীদের লক্ষ্য করেছি তারা কথায় কথায় কাফির ফতোয়া দিচ্ছে। অথচ তারা কাফিরদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বানের চেষ্টা চালায় না। ইসলামের সংস্কার কর্মনীতির সাথে এই কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয়ত : কিতালি মানহাজঃ অর্থাৎ যুদ্ধ ও লড়াই করার মূলনীতি। খারিজীদের এ পথেই মূলত বর্তমান জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী চিন্তাধারার অবলম্বন। তারা মনে করে থাকে কারো বিরুদ্ধে কিতাল করে মারা গেলেই তিনি শহীদ। আর যদি কোন ভাবে রক্ষা পেয়ে যায় সে গাজী। তারা এখানে ইসলামের মূলনীতি জিহাদের বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে থাকে। তাদের আবিষ্কৃত জঙ্গী বা কিতালী মূলনীতিকে ইসলামের জিহাদের অপব্যাখ্যা দিয়ে একই সূত্রে গাথার চেষ্টা করে। অবশ্য এক্ষেত্রে ইসলামের দুশমনদের অবদানও কম নয়। তারা ইসলামী জিহাদের প্রকৃত ধরন ও শর্তসমূহ ও মূলনীতি সম্পর্কে ধারণা না রেখে জঙ্গী তৎপরতাকে একই চশমায় দেখার চেষ্টা করে। ফলে তাদের অনেকেই জঙ্গী তৎপরতার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে জিহাদের

বিরুদ্ধে জিগির তোলা শুরু করে। মূলত জিহাদ ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদাত ও বিধান। এর সাথে জঙ্গী তৎপরতা ও গুপ্তহত্যার এবং সন্ত্রাসী কর্মের বিশাল ফারাক রয়েছে। এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। এই আলোচনায় এই বিষয়টি তুলে ধরার অবকাশ নেই বলে আমরা এখানে শেষ করলাম। উল্লেখ্য যে, জঙ্গীদের কিতালী কর্মনীতিতে ইসলামী দাওয়াতের কোন অবস্থান লক্ষ্য করা যায় না এবং তারা জিহাদের ব্যাপাওে তাদের প্রবৃত্তি তাড়িত ব্যাখ্যা ছাড়া ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে রাজি না। এ ক্ষেত্রে তাদের অধিকাংশই আবেগতাড়িত হয়ে থাকে। তাদের ধারণা মারা গেলেই শহীদ, এরপরে জান্নাত। কিন্তু তারা কিভাবে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে? অথচ তাদের কল্পিত জিহাদ ইসলামের সহীহ চিন্তাধারার কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই তাদের এই জঙ্গী তৎপরতা কখনো জিহাদের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হবেনা। এতে তারা শহীদ হবেনা বরং হত্যাকারী ও অপরাধী বিবেচিত হবে।

তৃতীয়ত : খুরূজী মানহাজ: অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অস্ত্রধারণ করা। এই কাজটি প্রায় সমস্ত ওলামায় কিরামের ঐক্যমতে হারাম। কারণ এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মার রক্ত প্রবাহিত ছাড়া আর কোন কল্যাণ সাধিত হয়না। এতে ইসলামী রাষ্ট্রে সন্ত্রাস ও সহিংসতা বৃদ্ধি পায়, শান্তি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, এই কর্মনীতি খারিজীদের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার ।

চতুর্থত : ইনকারী মানহাজ: অর্থাৎ প্রতিবাদ ও অস্বীকার করার মূলনীতি। সকল ক্ষেত্রে প্রতিবাদ ও অস্বীকার করার মূলনীতি গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামে প্রতিবাদের ভাষা পদ্বতি ও মূলনীতি উল্লেখ করা আছে। খারিজী সম্প্রদায় ইসলামের এই পদ্ধতিকে উপেক্ষা করে সর্বাবস্থায় প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করাই তাদের আদর্শিক মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই তারা মনে করে থাকে প্রতিবাদ না করাও কুফরী। এটি একটি চরমপন্থা। এর মাধ্যমে তারা হত্যা ও জঙ্গী তৎপরতার গন্তব্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে।

পঞ্চমত : তাসনীফী মানহাজ: অর্থাৎ নিজেদের ব্যতীত অন্যদেরকে ব্যাপকভাবে পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত ও ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা। এই কর্মনীতি ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে। এখান থেকেই মূলত ফিরকাবন্দী শুরু হয়েছে। বর্তমানে অনেকে এ চিন্তাধারা লালন করে থাকে। তাদের এটি জানা নেই যে, একাজ ইসলামের মিশনারি চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। গ্রুপিং বা ঘরানা তৈরী করার চিন্তা থেকে ইসলাম অনেক উর্ধ্বে। খারিজী সম্প্রদায় সর্বপ্রথম হারুরাতে অবস্থান নিয়ে নিজেদেরকে সাচ্চা মুসলিম দাবী করে এবং নিজেদের বিশেষত্বের কথা তুলে ধরে। এ কর্মপদ্ধতি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআত কখনো গ্রহণ করে নি। উপরোক্ত

কর্মপদ্ধতিগুলো আলোচনার মাধ্যমে আমরা পাঠকদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এ কর্মনীতিগুলো যুগে যুগে ইসলামের নামে বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত গ্রুপগুলো আজকের দিন পর্যন্ত অনুসরণ করে চলছে। এরা মূলত খারিজী চিন্তাধারার প্রলম্বিত ধারা। এরা নিজেদেরকে খারিজী পরিচয় না দিলেও চিন্তা-চেতনা এবং কর্মপদ্ধতিতে এরা খারিজীদের অপর নাম। তাই এযুগের মুহাক্কিক উলামায়ে কিরাম এদেরকে খারিজী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। আমরা নিম্নে এদের ব্যাপারে এ যুগের শ্রেষ্ঠ আলেমদের কিছু দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলাম।

খারিজী কর্মনীতির ব্যাপার যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের কিছু বক্তব্য:

১. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বলেন:

"কোন ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা অবৈধ। যে ব্যক্তি এরূপ কর্মে জড়িত হবে সে বিদ'আতী। সুন্নাতী তরীকার বিরুদ্ধাচরণকারী।"[১]

২. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের প্রসিদ্ধ তরীকা এই যে, তারা রাষ্ট্রের প্রধান বা সরকার প্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা যুদ্ধ করাকে না-জায়েয মনে করেন, যদিও রাষ্ট্রপ্রধানগণ মাঝে মাঝে অত্যাচারী স্বভাবের হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বহু সহীহ প্রসিদ্ধ হাদীস এরই প্রমাণ বহন করে। কারণ বিদ্রোহ দ্বারা যে ফেতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্রপ্রধানদের দ্বারা সংঘটিত অত্যাচারের চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। ছোট ধরণের বিপর্যয় ঠেকাতে গিয়ে বড় বিপর্যয়ের সৃষ্টি করা যাবে না। হতে পারে রাষ্ট্রপ্রধানদের আনুগত্য পরিত্যাগ করে তাদের থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা বেশী বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যে দলই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে বিদ্রোহ করেছে তারাই স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে।"[২]

তিনি আরো বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বজন স্বীকৃত রাষ্ট্রপ্রধানদের আনুগত্য কারার নির্দেশ দিয়েছেন- যাদের জনগণ পরিচালনার ক্ষমতা রয়েছে। পক্ষান্তরে অপরিচিত

---

১. শারহু উছুলিল ই'তিকাদ, লালকাঈ, ১/১৬১; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃ. ২৯
২. মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবীয়াহ : ৩/৩৯১

অপ্রকাশ্য কোন নেতা এবং যাদের কোন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা ও আধিপত্য নেই তাদের আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি।"[১]

এখানে ইবন তাইমিয়্যাহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) আরো বলেন:

"আহলুস সুন্নাতের প্রসিদ্ধ মাযহাব এই যে, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ বৈধ নয়- যদিও তাদের নিকট যুলুম-অত্যাচার পাওয়া যায়। সহীহ হাদীসগুলো তারই প্রমাণ বহন করে।"[২]

৩. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের বিপক্ষে যুদ্ধ বা বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাত কায়েম করবে। যদিও তারা অত্যাচারী হয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ফলে যে বড় ধরণের বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা হতে পারে সে পথ রুদ্ধ করার জন্যই এ নির্দেশ। বাস্তবিকই পূর্ববর্তীকালে এমনটি ঘটেছিল তাদের বিপক্ষে বিদ্রোহ করে যুদ্ধ করার কারণে। ফলে তারা যে পরিমাণ মন্দ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ছিল তার চেয়ে বহু গুণে খারাপ অবস্থায় পড়ে যায় শুধুমাত্র রাষ্ট্রের আনুগত্য হতে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে। সেই অমঙ্গলজনক পথের উপর কিছু সংখ্যক বিপদগামী লোক অদ্যাবধি অবশিষ্ট রয়েছে।[৩] এর মাধ্যমে তিনি খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির অনুসারী জঙ্গী ও সন্ত্রাসীদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যার বাস্তবতা আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালেই খুব সহজে আমরা উপলব্ধি করতে পারি।"

৪. ইমাম বারবাহারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের নেতার নেতৃত্বের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে সে ব্যক্তি খারিজী (বিদ্রোহী) এবং সে মুসলিমদের শক্তিকে বিনষ্টকারী এবং সুন্নাতের বিরোধীতাকারী হিসাবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হলে তা হবে জাহিলী মৃত্যু।"[৪]

---

১. মিনহাজ ১/১১৫; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃ. ৭৭
২. মিনহাজুস সুন্নাহ, ৩/৩৯১; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃ. ৮১
৩. ইলামুল মুয়াক্কিঈন: ৩/১৭১
৪. শারহু সুন্নাহ, পৃ. ৭৬; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃ. ২৯

৫. ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"অধিকাংশ আলিমের বক্তব্য এই যে, ধৈর্য ধারণ করে অত্যাচারী শাসকের আনুগত্যে অটল থাকা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার চেয়ে উত্তম। কেননা তার সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, অস্ত্রধারণের দ্বারা ভয়ভীতি প্রদর্শন করা, রক্ত প্রবাহিত করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর মাধ্যমে যমীনে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা শান্তি-শৃঙ্খলাকে বিনষ্ট করার শামিল। অত্যাচারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করাকে মু'তাযিলা সম্প্রদায় তাদের মাযহাবে বৈধতা প্রদান করেছে। খারিজী সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তও তাই।"[১]

৬. শাইখ আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"আল্লাহর পথে দা'ওয়াত হতে হবে উত্তম পন্থা অবলম্বনের দ্বারা। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন ও হাদীসে যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম এই যে, আল্লাহর পথে দা'ওয়াতের মাধ্যম হচ্ছে উপদেশ প্রদান, বক্তব্য উপস্থাপন, উৎসাহ প্রদান ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা, যেমনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীগণ মক্কায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে করেছিলেন। তারা অস্ত্রের মাধ্যমে লোকদেরকে দা'ওয়াত প্রদান করেননি। গুপ্তহত্যা অথবা মারপিটের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে তরান্বিত করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের অনুসৃত তরীকা নয়। (সউদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফাতোয়াও এটিই)।"

৭. ড. সালেহ ইবন ফাওযান আল-ফাওযান বলেন:

"কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনায় গুপ্ত হত্যা জায়েয বা বৈধ হওয়ার দলীল মিলে না। কারণ কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা হয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশক্রমে যিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। কা'বের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা চুক্তি লঙ্ঘিত হওয়ায়, মুসলমানদেরকে তার অনিষ্টতা হতে রক্ষার জন্য তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তাকে হত্যার বিষয়টি রাষ্ট্রের প্রধানদের বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ হতে ছিল না। যেমনটি বর্তমান যুগের গুপ্ত হত্যাগুলোর ক্ষেত্রে ঘটছে। ইসলাম ও মুসলিমদের ভাগ্যে অভাবনীয় ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকায় এরূপ তৎপরতাকে ইসলাম আদৌও সমর্থন করে না।"

---

১. তাফসীর কুরতুবী, ২/১০৯; হাক্বীকাতুল খাওয়ারিজ, পৃ. ৩০

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, খারিজীদের গৃহীত কিতালী বা সন্ত্রসী কর্মনীতি ইসলামের সহীহ চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রমাণিত নয় বরং এটি তাদের প্রবৃত্তি তাড়িত বিচ্যুত চিন্তাধারার ফলাফল। এর মাধ্যমে তারা কোনভাবেই ইসলামী চিন্তাধারার সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে না।

তাকফিরী কর্মনীতি বা কাফির আখ্যাদান হারাম হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের উক্তি

তাকফিরী কর্মনীতির ব্যাপারে আলেমগণ নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক কর্মনীতি এভাবে তুলে ধরেছেন,

ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন : "নিরানব্বই দিক থেকে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যাদানের সম্ভাবনা থাকে আর এক দিক থেকে তার ঈমানদার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে মুসলিমের উপর ভাল ধারণা পোষণ করার লক্ষ্যে তাকে ঈমানদার হিসেবেই আমি গণ্য করব।"[১]

ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় সালফে সালেহীন কখনও খারিজীদের মত তাকফিরী মানহাজে বিশ্বাসী ছিলেন না বরং তারা লোকদেরকে ঈমানদার সাব্যস্ত করার জন্য সর্বতভাবে প্রচেষ্টা চালাতেন।

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিচারক ও আলিমদেরকে বলতেন:

"তোমরা যে কথা বল আমি যদি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই কাফির হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে কাফির আখ্যা দিতে পারছি না। কারণ তোমরা আমার দৃষ্টিতে অজ্ঞ।"[২] অর্থাৎ তিনি তাদের অজ্ঞতার কারণে কাফির আখ্যা না দিয়ে তাদেরকে অজ্ঞ মুসলিম হিসেবে প্রমাণিত করেন।

ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহীহ মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থে বলেছেন:

"জেনে রাখুন! হক্বপন্থীদের মাযহাব এই যে, গুনাহের কারণে কিবলার অনুসারী কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। এমনকি প্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসারী খারিজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায়কেও কাফির আখ্যা দেয়ার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন কিছুকে জেনে শুনে অস্বীকার করবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির। তবে যদি নব মুসলিম হয় অথবা দূরবর্তী এমন কোন গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী হয় যার নিকট ইসলামের সমস্ত নিয়ম-কানুন পৌঁছেনি সে

---

১. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬২

২. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬৩

কাফির হবে না। তাকে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অবহিত করার পরেও যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। অনুরূপভাবে যদি যিনা অথবা মদ পান অথবা হত্যাসহ বিভিন্ন ধরণের হারাম কর্মকে জেনে শুনে হালাল মনে করে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে।"[১]

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"কখনও কখনও মৌখিক কথা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হয়। এর ফলে এ কথার প্রবক্তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যেতে পারে এভাবে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলবে সে কাফির। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কুফরী কথা বলে তাহলে নির্দিষ্ট করে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না- যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপক্ষে এমন দলীল প্রতিষ্ঠিত না হবে যা তাকে কাফির হিসাবে প্রমাণ করে।"[২]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী বিধান সম্পর্কে না জেনে আব্দুল কাদির জিলানী অথবা সায়্যিদ বাদাবীর কবরে সিজদাহ করে, তাহলে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। তবে ইসলামের বিধান ও দলীল সম্পর্কে জানার পরেও যদি সিজদাহ করে তাহলে সে কাফির।"[৩]

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"সেই সব মুসলিমদেরকে আমরা কাফির আখ্যা দিতে পারি না কারণ তাদের নিকট কাফির আখ্যা দানের দলীলগুলো স্পষ্টকরে উপস্থাপন করা হয়নি। কেননা তাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ দাঈ নেই যারা জনগণের দারপ্রান্তে নির্ভেজাল তাওহীদের দা'ওয়াত পৌছাতে সক্ষম।"[৪]

শাইখ আবদুল আযীয ইবনু বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

"খারিজী সম্প্রদায় গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দিয়েছে এবং গুনাহগারদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও শাস্তির দিক থেকে (অথাৎ তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী) খারিজীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কিন্তু তারা

---

১. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬২
২. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৭৩
৩. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬৩
৪. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৭৪

তাদেরকে কুফর এবং ঈমান উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্থান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এসবই ভ্রষ্টতা। আহলুস সুন্নাহগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছন তাই চির সত্য। আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মুসলিমকে গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে হালাল না জানবে।"[১]

খারিজী চিন্তাধারার ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অবস্থান :

খারিজী চিন্তাধারা ইসলামী সহীহ চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত এতে কোন সন্দেহ নেই তবে খারিজেদের কাফির আখ্যায়িত করা হবে নাকি বিদ্রোহী হিসেবে তাদের উপর শাস্তি প্রযোজ্য হবে এ নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) খুব সুন্দরভাবে এ বিষয়টির সমাধান তুলে ধরেছেন: "শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) খারিজীদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য কি হবে এ বিষয়ে বলেন, মুসলিম উম্মার সকল ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে খারিজী সমাজ বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট ও নিন্দিত। তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে কিনা এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

প্রথম অভিমত হচ্ছে: তারা সীমালঙ্ঘনকারী এবং বিদ্রোহী তাই তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত না করে বাগি বা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

দ্বিতীয় অভিমত হচ্ছে: তারা মুরতাদদের মত কাফির, তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে এবং মুরতাদ হিসাবে শরীয়াতের বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য হবে"।[২]

এ বিষয়ে হাফিজ ইবনে হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, "একদল উলামায়ে কিরাম যারা খারিজীদেরকে খারিজী আখ্যায়িত করে থাকেন যেমন ঈমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) তারা মূলত খারিজীদেরকে মূলহিদদের সাথে সংযুক্ত করে থাকে।"[৩] এবক্তব্য থেকে বুঝা যায়, হাফিজ ইবনে হাজার ও ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও খারিজীদেরকে মুরতাদদের মত কাফির মনে করতেন না বরং তাদেরকে ইসলামী বিধানের ক্ষেত্রে চরমভাবে সীমালঙ্ঘন করার কারণে মুলহিদদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতেন।

ইমাম বাইহাক্বী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সুনানে কুবরাতে উল্লেখ করেন, আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি তাদেরকে

১. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৫৯

২. মাজমুয়া ফাতাওয়া ২৮/৫২

৩. ফাতহুল বারী ১২/৩১৩

(খারিজীদেরকে) কাফির মনে করেন? উত্তরে তিনি বলেন, তারা কুফুরি থেকে পালানোর চেষ্টা করেছে। তরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কি তাদেরকে মুনাফিক মনে করেন? উত্তরে তিনি বলেন, মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার খুব সামান্য যিকির করে থাকে অথচ তারা এমন নয় বরং সকাল-সন্ধ্যা তারা আল্লাহর যিকির করে থাকে। প্রকৃত কথা হল তারা আমাদের ভাই তারা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে।[১]

আলী ইবনে আবু তালবের এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, তিনি তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করার ব্যাপারেও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তাদেরকে হত্যা ও নির্মূল করার ক্ষেত্রে বাগি বা বিদ্রোহীদের বিধান তাদের উপর প্রযোজ্য করেছেন। তাই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ একদল ওলামায়ে কিরাম তাদেরকে মুরতাদ মনে না করে বাগি বা বিদ্রেহী হিসাবে আখ্যায়িত করাকে উপযুক্ত মনে করেন। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এক্ষেত্রে অতিরঞ্জন জায়েয মনে করেন না।

এ চিন্তাধারার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সঠিক পদ্ধতি:

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তাধারা, ও মতবাদ-মতাদর্শ থেকে বক্তব্য দিচ্ছে ও এর সমাধান বের করার চেষ্টা করছে। নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনা থেকে নাস্তিকরা যে বা যারা তাদের শত্রু রয়েছে তাদেরকে প্রতিহত করার উপায় হিসেবে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের প্রতিকার হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামী মূল্যবোধকে কারণ হিসাবে আখ্যায়িত করে যাচ্ছে। অপর দিকে সুফি দর্শনে বিশ্বাসী ও কবর এবং মাজার ভক্তদের চিন্তাধারা থেকে তারা তাদের কল্পিত দুশমনদের নির্মূল করার জন্য আহলুল হাদীস ও সালাফী চিন্তা-চেতনাকে দোষারোপ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি তাদের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা বিরোধীদের দেহে জঙ্গীর কুর্দি পরিয়ে জঙ্গিবাদ প্রতিহতের প্রশান্তির ঢেকুর তোলার চেষ্টা করছে। এভাবে কাওমি মাদ্‌রাসার লোকজন সরকারী মাদ্‌রাসার বিরুদ্ধে, সেকুলারগণ ইসলামিস্টদের বিপক্ষে, প্রত্যেকে তার বিরোধীকে জঙ্গীবাদের তকমা পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনি হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা যেখানে বিবেক-বিবেচনা, ন্যায় ইনসাফ ও আমানত দারিতার ঘাটতি থাকবে সেখানে প্রতিহিংসা, জিঘাংসা ও প্রতিশোধ প্রবণতা প্রবল হবে। নিজের শত্রুকে জঙ্গি বানাতে পারলে স্বীয় বিজয় অর্জন হবে এমনটা সকলেই ভাবতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমি

---

১. সুনানে কুবরা এবং বাইহাকী ৮/১৭৩

সকলের প্রতিহিংসামূলক অবস্থান তুলে ধরতে চাইনা। এটি একটি দীর্ঘ আলোচনা ও সমালোচনার দাবী রাখে। আমি কেবল সুফি দর্শনে বিশ্বাসী বন্ধুদের ও দেওবন্দি ঘরানার বন্ধুদের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করছি। কেননা তারা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিকার ও প্রতিবাদ করার জন্য সালাফী, আহলুল হাদীস ও সহীহ আক্বীদার বন্ধুদের টার্গেট বানিয়েছেন। কথায় কথায় তারা বলে যাচ্ছেন সালাফী চিন্তাধারায় পুষ্ট আহলুল হাদিসরাই জঙ্গী বা সালাফী চিন্তাধারা থেকেই জঙ্গীবাদেও উত্থান। কোন দলিল প্রমান ছাড়া এ ধরনের বক্তব্য দেয়া কতটুকু সঠিক ও গ্রহণ যোগ্য তারাই বিবেচনা করবেন তবে আমি অনুরোধ করবো প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ প্রবণ হয়ে কারো উপর কোনভাবে জুলুম করা উচিত নয় । আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"[১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ কর। এগুলো তিনি তোমদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেন,

إِيَّاكُمْ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তোমরা জুলম থেকে সাবধান হও! নিশ্চয় জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে।"[৩]

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ০৮

২. সূরা আল-আন'আম: ১৫২

৩. মুসনাদে আহমাদ: ৫৮৩২

বাইহাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে উপরোক্ত বর্ণনায় একটু বৃদ্ধি করে উল্লেখ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

قال محارب بن دثار : من أظلم الناس ؟ قال : من ظلم لغيره

মুহারিব বলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'সবচেয়ে অধিক জালেম কে? তিনি বললেন, যে অন্যের উপর জুলুম করে।'[১]

তাই বিবেক বিবেচনাকে উপেক্ষা করে সালাফী ও আহলুল হাদীসদের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী বানানো সত্যিই চরম মিথ্যাচার বৈ কি? কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন জঙ্গিদের কেউ কেউ রাফউল ইয়াদাইন করে, জোরে আমিন বলে তাই তারা সালাফী। আমরা বলব, তারাতো নামাযও পড়ে, সিয়ামও পালন করে থাকে, তাই বলে কি সকল নামাযীকে ঢালাও ভাবে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী বানানো যায়?

সন্ত্রাসীরা মুখে আল্লাহু আকবার বললেই তারা Islamist এই বক্তব্য কতটুকু যুক্তি নির্ভর ও বিবেক সম্মত? মূলত: সঠিক কারণ খোঁজ না করে এ ধরনের দোষারোপ করার চেষ্টা চালালে হিতে বিপরীত হতে পারে। জঙ্গিরা পার পেয়ে যেতে পারে, অপরদিকে ধরা পড়তে পারে নিরিহ মানুষ। এতে জঙ্গি তৎপরতা কোন দিন কমবে এ আশা করা সুকঠিন। আগে আমরা খারিজীদের মানহাজ ও তাদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেছি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস খারিজী চিন্তাধারা থেকে প্রসূত। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের উদ্ভব তারাই ঘটিয়েছিল। এবার আমরা আলোচনা করবো সালাফীদের পরিচয় ও মানহাজ নিয়ে, যাতে আমরা বুঝতে পারি সালাফী চিন্তা-চেতনার সাথে জঙ্গিবাদের সামান্যতম সম্পর্ক আছে কিনা ?

সালাফীদের পরিচয়:

السلفية هي منهج إسلامي يدعو إلى فهم الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة وفهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين باعتباره يميل نهج الإسلام الأصيل والتمسك بأخذ الأحكام من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة ويبتعد عن كل المدهلات الغربية عن روح الإسلام وتعاليمه (أصول وتاريخ الفرق الإسلامية ص/١٣)

অর্থাৎ সালাফী চিন্তাধারা হচ্ছে এমন একটি কর্মপদ্ধতী যা মুসলিমদেরকে আল কুরআন ও সুন্নাহ'র উপলব্ধির দিকে আহ্বান করে। যে উপলব্ধি এই উম্মাতের

১. শু'আবুল ঈমান: ৭৪৫৯

পূর্বসূরীগণ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে লাভ করেছিলেন। তারা হচ্ছেন, সাহাবা কিরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ। এটাই মূলত ইসলামের প্রকৃত ও মূল মানহায হিসেবে পরিচিত। তারা কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস থেকে বিধান সমূহ গ্রহণ করে থাকেন এবং ইসলামী চিন্তা-চেতনা শিক্ষা বিমুখ ও সকল প্রকার পাশ্চাত্য চিন্তা চেতনাকে বর্জন করে থাকেন।[১]

এর সংজ্ঞায় শাইখ মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আল-উসাইমিন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

السلفية هي إتباع منهج النبى (ص) وأصحابه لأنهم سلفنا تقدمواعلينا فإتباعهم هو السلفية وأما.......السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق فلاشك ان هذا خلاف السلفية (شرح العقيدة الواسطية ١/٥٣,٥٤ سلسلة اللقاءالباب المفدح ش/٥٧ سلسلة الهدى والنور- ش/٥١)

অর্থাৎ, সালাফী চিন্তাধারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার ছাহাবীদের মানহাজের অনুসরণ। এজন্যই তারা আমাদের সালাফ। তারা আমাদের পূর্বে অতিবাহিত (বিগত) হয়েছে সুতরাং তাদের পরবর্তী অনুসারীরাও সালাফী। আর সালাফী বিশেষ একটি চিন্তাধারা যার মাধ্যমে মানুষ বিশেষিত হয়ে থাকে। মুসলিমদের মধ্য থেকে যে বা যারা তাদের বিরোধিতা করে তারা পথভ্রষ্ট যদিও তারা সত্যের উপর থাকে। এ বক্তব্য বা এ চিন্তাধারা নিঃসন্দেহে সালাফী চিন্তাধারা বিরোধী।[২]

শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন:

السلفية نسبة إلى السلف..........والسلف هم أهل القرون للثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بالخيرية ......فالسلفية......... إلى هؤلاء السلف لا إلى غيرهم .(سلسلة الهدى والنور- ش /٥٧)

অর্থাৎ, সালাফী চিন্তাকে মূলত সালাফদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। সালাফরা হচ্ছেন ইসলামের প্রথম তিন যুগের ব্যক্তিবর্গ। যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণ ও মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তাই সালাফীয়ার

---

১. উসূল ওয়া তারিখ আল ফিরাক আল ইসলামিয়া, পৃ. ১৩
২. শরহু আল আক্বীদা আল ওয়াসিতিয়া ১/৫৩-৫৪, সিলসিলাতুন নূর ওয়াল হুদা, পৃ. ৫১

সম্পর্কটি সরাসরি ঐ সমস্ত সালাফদের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির দিকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয় না।[১]

তিনি আরো বলেন, উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি, সালাফী চিন্তাধারায় কখনো কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল ও গোত্রের দিকে সম্পর্কিত হয় না, বরং এটি ইসলামের প্রকৃত অনুসারী ও প্রকৃত স্বরূপের দিকে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সালাফী চিন্তাধারায় কোনভাবেই বিকৃতি ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই, কেননা এটি কখনও কোন যুগে কোন ব্যক্তি নির্ভর ছিলনা, আর সালাফদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কল্যাণ ও মর্যাদার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, সালাফী চিন্তাধারায় কোন ভাবে পরবর্তী যুগসমূহের বিকৃতি, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন ইত্যাদি প্রবেশ করতে পারেনা। কেননা তাদের চিন্তা-ধরাই ছিল ইসলামের প্রকৃত চিন্তাধারা ও সঠিক স্বরূপ।[২]

শাইখ আব্দুল কাদের ইবন আবু সালেহ আলজিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এ মানহায বা কর্মনীতির পরিচয় দিতে গিয়ে স্পষ্ট করে বলেছেন:

إعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر ... وكل ذالك عصبية وغياظ لأهل السنة ولا إسم لهم إلا إسم واحد وهو أصحاب الحديث (الغنية ٩٠/١)

অর্থাৎ, জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের অনেক আলামত রয়েছে, সবচেয়ে বড় আলামত হচ্ছে তারা আহলুল আসার যারা হাদীসের অনুসারী তাদেরকে গালি-গালাজ করবে। এসব মূলত সুন্নাহপন্থীদের বিরূদ্ধে তাদের গোড়ামী ও অন্তর্জালার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সুন্নাহপন্থিদের একটিই পরিচয়, একটিই নাম, আর তা হচ্ছে তারা আসহাবুল হাদীস বা হাদীসের অনুসারী।[৩]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি, সালাফী কোন দল বা গোষ্ঠীর নাম নয়, এটি একটি মানহায বা কর্মনীতি। এদের কোন ইমাম নেই, কোন পীর বা মুরব্বী নেই, এদের কোন সুনির্দিষ্ট বিশেষ আক্বীদা নেই। স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন কল্যাণধারা যা কুরআন ও সুন্নাহ হতে সরাসরি অনুসৃত তা হচ্ছে সালাফী মানহাজ। এবার আলোচনা করবো সালাফীদের কর্মনীতি নিয়ে যাতে আমরা বুঝতে পারি জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের কর্মনীতির সাথে সালাফীদের কর্মনীতির কোন প্রকার মিল আছে কিনা।

---

১. সিলসিলাতুন নূর ওয়াল হুদা, পৃ. ৫৭
২. সিলসিলাতুন নূর ওয়াল হুদা, পৃ. ৫৩
৩. গুনিয়া ১/৯০

সালাফী চিন্তাধারায় অনুসৃত কর্মনীতিসমূহ:

১. তারা সরাসরি কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করেন, এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দলের অন্ধ অনুসরণ করেন না।

২. তারা ইসলামের প্রসিদ্ধ আলিম, মুজতাহিদ ও ইমামদের গালিগালাজ করেন না এবং তাদের কোনভাবে অসম্মান করেন না। বরং তাদের প্রতি রহমতের দো'আ করে থাকেন এবং ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাদের যে কোন ভুল ত্রুটির জন্যে তাদেরকে সওয়াবের অধিকারী মনে করে থাকেন।

৩. এ চিন্তাধারায় কোন ব্যক্তিচর্চা বা অনুসরণ প্রাধান্য পায় না বরং কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীলই একমাত্র এই কর্মনীতির মূল উৎস।

৪. তারা সুনির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলকে কোন প্রকার দলিল প্রমাণ ছাড়া আন্দাজ-অনুমান ও সন্দেহের উপর ভিত্তি করে কাফির আখ্যায়িত করে না।

৫. তারা ইসলামী রাষ্ট্র অথবা মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট কুফরি-প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিদ্রোহ করা, সংঘাত করা বা যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করেন না।

৬. কোন ধরণের শরিয়া অনুমোদিত কারণ ছাড়া রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের বাইরে যাওয়া গর্হিত কাজ ও বড় অপরাধ। এর শাস্তি ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী হত্যা। একাজটি রাষ্ট্র ও সমাজে বড় ধরণের বিপর্যয়ের কারণ। এ অবস্থায় যদি বিদ্রোহীর স্বাভাবিক মৃত্যুও হয় বা তাহলে তা জাহেলী মৃত্যু হিসেবে বিবেচিত হবে।

৭. ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান যদিও ফাসিক, ফাজির বা পাপিষ্ট ও পাপাচারী হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সুস্পষ্ট কুফুরি প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আনুগত্য করা অপরিহার্য মনে করে এবং তার পিছনে সালাত আদায় করাকে বৈধ মনে করে।

৮. জিহাদ রাষ্ট্রীয় বিধান ও আনুগত্যের একটি বিষয়। শুধু ব্যক্তিগত জযবা ও ধর্মীয় আবেগের উপর নির্ভরশীল বিষয় নয়। তাই যেকেউ স্বাধীনভাবে জিহাদের ঘোষণা দেয়ার অধিকার রাখে না বরং জিহাদের বৈধ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান। তাই তাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা আসা ব্যতীত যে কোন ধরণের জিহাদ সন্ত্রাসী তৎপরতা বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

৯. আল-আমরু বিল মা'রুফ ও ইনকারুল মুনকার অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে লোকজনদের বারণ করার পদ্ধতী ইসলামে সুবিদিত ও সুনির্দিষ্ট। তাই প্রতিবাদের ভাষা গণতান্ত্রিক অধিকারের চেয়েও ইসলামের অনুমোদন এর জন্য অপরিহার্য। যে সমস্ত প্রতিবাদ ইসলামি শরীয়া অনুযায়ী অনুমোদিত নয় অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চর্চা করা হচ্ছে। এই চিন্তাধারায় এইসব চর্চাকেও সঙ্গত ও অনুমোদিত মনে করা হয় না।

১০. সালাফী চিন্তা ধারায় রাষ্ট্রপ্রধান প্রকাশ্য কাফির প্রমাণিত না হলে, তার জন্যে হিদায়াতের দো'আ করা বৈধ। কেননা তার হিদায়াতের উপর সমগ্র উম্মাহ'র হিদায়াত ও পরিশুদ্ধি নির্ভর করে।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা স্পষ্টভাবে এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, সালাফী চিন্তাধারা সম্পর্কে আমরা না জেনেই বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছি। অনেকেই আন্দাজ-অনুমানের উপর ভিত্তি করে তাদের গায়ে জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের পোশাক পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। এ চিন্তাধারার সাথে কোনভাবে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ সম্পৃক্ত হতে পারে না। কেননা এচিন্তা ধারায় রাষ্ট্রীয় আনুগত্যকে মুসলিম উম্মাহর শৃঙ্খলার স্বার্থে অপরিহার্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই যেসব বন্ধুগণ শুধু আন্দাজ ও অনুমানের উপর নির্ভর করে বক্তব্য দিচ্ছেন তারা মেহেরবানী করে সালাফী চিন্তাধারা সম্পর্কে আরো অধ্যায়ন করার চেষ্টা করুন।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি, খারিজী চিন্তাধারা থেকেই মূলত ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের আবির্ভাব। আর তারা এই চিন্তাধারাকে ইসলামে সহীহ চিন্তাধারা তথা সালাফী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত করার যেভাবেই চেষ্টা করুক না কেন সালাফী চিন্তাধারা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে কোনভাবেই সমর্থন করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবাদের ভাষা ও পদ্ধতি কী তা হাদীসে সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ رَأى مِنكُمْ مُنكَراً فَليُغيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি কোন অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতর স্তর।[২]

---

১. এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মিনহাজুস সুন্নাহ আন নববীয়া ১/৫৪৭, মাজমু আল ফাতাওয়া, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ৩৫/৪৪, কিতাবুস সুন্নাহ, ইবন আবু আসিম ২/৪৯০, হুকুকুর রাঈ ও রাঈয়্যা, ইবন উসাইমিন ৪২, কাওয়াদুল আহকাম ১/১০৪, আল আহকামুল সুলতান আবু ইয়া'লা পৃ.২৩

২. সহীহ মুসলিম: ১৭৬

'ইসলাম' সন্ত্রাস নয়, শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম

الإسلام ليس بإرهاب : إنما هو دين السلام والأمان

ড. মোহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

সহযোগী অধ্যাপক

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে মানুষকে একমাত্র তাঁর দাসত্ব করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন।[১] আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্বের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া দু'ভাবে সম্পন্ন হয়। এক. হাক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক আদায়, দুই. হাক্কুল 'ইবাদ বা বান্দার হক প্রতিষ্ঠা। আল্লাহর হক ও বান্দার হক প্রতিষ্ঠার মধ্যে সুদৃঢ় একটি বন্ধন ও সংযোগ রয়েছে, যা একটি হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي. قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ

'আল্লাহ কিয়ামতের দিন বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমার সেবা-পরিচর্যা করনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কিভাবে আপনার সেবা করবো, আপনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার বান্দা অমুক অসুস্থ হয়েছিল, তুমি তার সেবা করনি। যদি তুমি তার সেবা করতে তাহলে তুমি আমাকে তার নিকট পেতে...'।[২]

বান্দার হক প্রতিষ্ঠার মধ্যে আল্লাহর হক প্রতিষ্ঠা নিহিত, এ হাদীসটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্যে আল্লাহ যুগে যুগে তাঁর মনোনীত রাসূল ও নবী আলাইহিস সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাদের সাথে আসমানী কিতাব ও সাহীফাসমূহ দিয়েছেন। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআনুল কারীম দিয়ে ইসলামকে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত পরিপূর্ণ দ্বীন হিসাবে পাঠিয়েছেন। এ দ্বীন ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'লার দাসত্ব প্রতিষ্ঠা, যার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক ও সার্বজনীন কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষসহ বিশ্বব্যবস্থায় শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা। সুতরাং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য। শান্তির বিপরীত অশান্তি, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় ইত্যাদিকে দূর করা। আর নিরাপত্তার বিপরীত ভয়-ভীতি, শঙ্কা অস্থিতিশীলতা ইত্যাদির মূলোৎপাটন করা। 'ইসলাম' ও 'ঈমান' এ পরিভাষাদ্বয়ের মধ্যেও এর বাস্তবতা পাওয়া যায়। যেমন:

---

১. সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬
২. সহীহ মুসলিম: ৬৭২১

'ইসলাম' শব্দটির মধ্যে রয়েছে 'সালাম', যার অর্থ 'শান্তি'। এ অর্থের আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম হলো 'আস্‌সালাম' (সর্বময় শান্তি)। আমরা সালাতে দু'আর মধ্যে পড়ি, 'আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সালাম, ওয়া মিনকাস্ সালাম ..., অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনিই মহাশান্তি, আপনার নিকট থেকেই শান্তি ...'। অপরদিকে 'ঈমান' শব্দের মধ্যেও রয়েছে 'আমন', যার অর্থ, নিরাপত্তা; সমাজ ও সমাজের সকল মানুষের শান্তি অনুভব করা এবং স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করার পরিবেশ থাকাই হলো নিরাপত্তা, যেখানে কোন ধরন ও প্রকারের ভীতি, সন্ত্রস্ততা ও অস্থিরতার লেশ মাত্র উপস্থিত থাকবে না।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার সকল বিধি-বিধান ও ব্যবস্থাই হলো শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার বিধান। এ কারণে আল্লাহ সুবহানাহুর সকল নবী ও রাসূলগণ সৃষ্টিকর্তার বিধি-বিধানের দিকে আহ্বান করার মাধ্যমে পৃথিবীতে ও মানুষের সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করেছেন। আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেও আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান ইসলামকে পরিপূর্ণ করে বিশ্বজগতের জন্যে তাকে শান্তি ও নিরাপত্তার নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি সকল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তাই প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা শান্তির দ্বীন হিসাবেও ইসলামের নামকরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾

"তিনি তোমাদেরকে পূর্ব থেকেই মুসলিম (ইসলামের অনুসারী ও শান্তিকামী) হিসাবে নামকরণ করেছেন"।[১]

তাছাড়াও আল্লাহ তাঁর নবীকে 'রাহমাতুল লিল 'আলামীন'; বিশ্বজগতের রহমাত ও করুণার মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

"আমরা আপনাকে বিশ্বজগতের রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি"।[২]

তাই রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একদিকে মানবতার ইহকালিন শান্তি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরদিকে তাদেরকে পরকালের প্রশস্ত জীবনে চূড়ান্ত শান্তির আবাস ভূমি জান্নাতে প্রবেশ করানো।

---

১. সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮
২. সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সময় অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, ভয়-ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদির মধ্যে সারা পৃথিবী নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা সেই চিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন। 'তারা যদিও ইতোপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে ছিল'।[1] তিমিরাচ্ছন্ন ও জমকালো অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবীর এই ক্রান্তিলগ্নেই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও নিরাপত্তার মশাল নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। হাজার হাজার বছরের বিভিষিকাময় পরিস্থিতি, যুলম, ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, শোষণ ও বর্বরতার অগ্নিগিরি মূহুর্তের মধ্যেই নিভে গিয়েছিল। তাঁর আলোতে বিশ্বজগত আলোকিত হয়েছিল। তাঁর জন্ম থেকে জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরে তিনি শান্তি, নিরাপত্তা, ন্যায়-নীতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তার গুরুত্ব

ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্র ও মানবতার জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। মানবতার সকল ক্ষেত্রে সকল প্রকার উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং সার্বিক ও সার্বজনীন অগ্রগতির ভিত্তি হলো শান্তি, স্থিতিশীলতা, ও নিরাপত্তা। এ দিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ খাদ্যের নিশ্চয়তার সাথে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানকে মানুষের জন্যে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ বলে ব্যক্ত করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন:

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ - الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾

"তারা যেন অবশ্যই এই ঘরের (কা'বা ঘর) মালিকের 'ইবাদাত করে, যিনি তাদেরকে ক্ষুধার সময় খাদ্য এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন"।[2]

ইসলামী শারী'আতের উদ্দেশ্যসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো নিরাপত্তা বিধান করা। বিশেষজ্ঞগণ অত্যন্ত জরুরী ও অত্যাবশ্যক উদ্দেশ্যকে ৬টি বিষয়ের নিরাপত্তা বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। সেগুলো হলো; ধর্ম, জীবন, বংশ, সম্পদ, বুদ্ধিমত্তা ও সম্মানের সংরক্ষণ করা ও এগুলোর নিরাপত্তা বিধান করা। ইসলামী বিশেষজ্ঞ আল-মাওয়ারদী বলেন, পৃথিবীর স্থিতিশীলতা ও এর শৃঙ্খলা বিধান ৬টি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে। তন্মধ্যে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যেখানে মানুষ অতি তৃপ্তির সাথে বসবাস করবে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে, ভাল মানুষ সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করবে আর দুর্বল মানুষও যেখানে ভালোবাসা, সহযোগিতা বন্ধুত্বভাব অর্জন করবে ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম।

---

১. সূরা আলে ইমরান: ১৬৪; সূরা আল-জুম'আহ: ২
২. সূরা কুরাইশ: ৩-৪

ইসলাম মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে আহ্বান জানায় যে, হে মানব সকল! তোমরা সৃষ্টিকর্তার বিধি-বিধান ও ব্যবস্থার সাথে একমত পোষণ কর। তাতে সকল মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। নিরাপত্তা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

"তোমরা এমন একটি ঘোষণার (ব্যবস্থা) দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান"।[১]

আল্লাহর এ আহ্বানে তারা যদি সাড়া না দেয় তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায়ের স্বার্থে তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾

"তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্য আর আমার ধর্ম আমার জন্য"।[২]

শুধু তাই নয়, অশান্তি, অস্থিরতা ও ভীতির অবস্থা, বিশৃঙ্খলা, বিপর্যয়ের সৃষ্টি ও নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্যে যারা অন্যান্য ধর্ম, দেব-দেবতা ও ব্যবস্থার অনুসরণ করে তাদেরকে গালি দিতে পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে ডাকে তোমরা তাদেরকে গালি দিওনা"।[৩]

এ শান্তিরভাব তৈরী ও বজায় রাখার জন্যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন:

﴿كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا﴾

"তোমরা সকলে আল্লাহর বান্দা হিসাবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও"।[৪]

---

১. সূরা আলে ইমরান: ৬৪
২. সূরা আল-কাফিরূন: ৬
৩. সূরা আল-আন'আম: ১০৮
৪. সহীহ আল-বুখারী: ৬০৬৪; সহীহ মুসলিম: ৬৬৯০

সুতরাং যে মু'মিন-মুসলিমদের ব্যাপারে মানুষেরা তাদের জীবন ও সম্পদ নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, তারা তাদের ধর্মীয় উপাসনা ও শ্রদ্ধা-সম্মানের পবিত্র স্থানগুলোর ব্যাপারেও কোন ভীতিকর অবস্থায় থাকার প্রশ্নই আসেনা। তাই প্রকৃত কোন মুসলিমের অন্যের ধন-সম্পদ, জীবন, তাদের উপাসনালয় ইত্যাদির উপর চড়াও হওয়ার, আঘাত করার কোন কল্পনাই করা যায় না। ইসলাম এটাকে কোনভাবেই অনুমোদন দেয় না।

ইসলাম থেকে মানবজাতির যে প্রজন্ম শিক্ষা অর্জন করেছে, আবার নিষ্ঠার সাথে যারা তাদের অনুসরণ করেছে এবং করছে তারা সকলেই এর চির শাশ্বত মহান শিক্ষার সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে কার্যকরী করেছে। এমনকি ঘোষিত যুদ্ধের ময়দানেও তারা দুর্বল, বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও নিরীহ সাধারণ মানুষদের সাথে অসদাচারণ করতেন না। গাছ, শস্য ফল-ফলাদি ইত্যাদি নষ্ট করতেন না। তারা ইসলাম ও তাদের নবীর শিক্ষা ও যুদ্ধ নীতির সামান্যতম সীমাও লঙ্ঘন করতেন না। নিহত ব্যক্তির অঙ্গহানী করতেন না। মরদেহের সাথে অসম্মানজনক ব্যবহার করতেন না। প্রতিপক্ষ শক্তি যখন সন্ধি করার ইচ্ছা ব্যক্ত করতো তখন আল্লাহর নির্দেশের আলোকে সঙ্গে সঙ্গেই মুসলিমগণ তাদের সাথে সন্ধি করে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরীতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে আপনিও তার দিকে ঝুঁকে পড়বেন"।[১]

আর চুক্তিবদ্ধ পক্ষের সাথে কখনো আগে চুক্তি ভঙ্গ করতেন না।

ইসলাম নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে নিষেধ করে। বরং সশস্ত্র ব্যক্তিরাও যদি চুক্তিতে এগিয়ে আসে তাহলে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾

"অতঃপর তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি"।[২]

---

১. সূরা আল-আনফাল: ৬১

২. সূরা আন-নিসা: ৯০

রক্তপাত এড়ানো এবং শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য ও দূরদৃষ্টি নিয়ে সাথীদের চরম ক্ষোভ ও অসমর্থন থাকা সত্ত্বেও নতজানু ও স্পষ্টত অপমানজনক শর্তগুলো মেনে নিয়ে আল্লাহর নবী সেদিন হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন।

মক্কা বিজয়ের সময়েও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁকে ও তাঁর সাথী মুসলিমদেরকে যারা অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছে, জীবন, ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছে, তাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এ সব কিছুই ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। রক্তপাত, ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধন, ভীতিকর, অস্বস্তিকর, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করে দেয়া।

শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবতার প্রতি সম্মানবোধের প্রতি ইসলামের সর্বোচ্চ গুরুত্ব এই পর্যায় পৌঁছেছে যে, কোন মানুষকে ন্যায়বিচারের মাধ্যমে হত্যার দোষে দোষী হওয়ার অপরাধে হত্যা করার কারণ ছাড়া যদি হত্যা করা হয়, তাতে যেন সকল মানুষকে হত্যা করার শামিল হয়। পক্ষান্তরে একজন মানুষকে জীবিত রাখা যেন সকল মানুষকে জীবিত রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"(মানবহত্যা বা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া) কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল"।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾

"আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমরা তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি"।[২]

এখানে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, 'যথার্থ কারণ ছাড়া' ন্যায়সঙ্গতভাবে এ বিষয়টি নির্ধারণ করবে রাষ্ট্র ও এর বিচার বিভাগ। এর অর্থ কোনভাবেই এটা নয় যে, ব্যক্তি

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৩২
২. সূরা বানী-ইসরাঈল: ৩৩

আইন নিজের হাতে তুলে নেবে। তাহলে তো সমাজে আরো বেশী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে যা ইসলামী নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ইসলাম মানুষের কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়েছে, মানবতার কল্যাণের অন্যতম দিক হলো শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা। এ দায়িত্ব মুসলিম জাতির উপর ন্যাস্ত। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে আল্লাহ তাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য"।[১]

ইসলামের এ মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটেই 'দ্বীন'কেই সর্বৈব কল্যাণকামিতা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"দ্বীন সর্বৈব কল্যাণকামিতা' (বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকামী)। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! কার জন্য? তিনি বলেন, 'আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং তাদের সর্ব–সাধারণের জন্য"।[২]

আর মানবতার কল্যাণকামিতার সর্বোচ্চ দিক হলো মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই ইসলামী ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় মানুষের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য, হিংসা–বিদ্বেষ, জিঘাংসা, হানাহানি, খুন খারাপী, হতাশা, বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন এবং সাধারণ ও স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে চির ধরায়, ইসলাম এ সকল বিষয়কে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং হারাম ঘোষণা করেছে। তাই ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদসহ যে কোন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কোনই সম্পর্ক নেই। 'ইসলাম' শান্তির ধর্ম, নিরাপত্তার ধর্ম, মানবতার ধর্ম।

---

১. সূরা আলে ইমরান: ১১০
২. সহীহ মুসলিম: ২০৫

জঙ্গিবাদ ও ইসলামঃ আজকের প্রেক্ষাপট ও আমাদের করণীয়

الإسلام والإرهاب : الوضع الراهن وواجباتنا

ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

সহযোগী অধ্যাপক, আল-ফিক্‌হ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ভূমিকা

অনেকেই মনে করে থাকেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণেই এই নব্য জঙ্গিবাদের উত্থান। তারা আরও মনে করে থাকেন যে, পাশ্চাত্যের লোকেরা ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, সত্যিকার ইসলাম ও ইসলাম প্রচারকদের বিতর্কিত করতে 'জঙ্গিবাদ' শব্দটিকে ব্যবহার করছে। তাছাড়া হতে পারে ইসলামী দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নতির পথ রোধ করতে এবং এসব দেশে তাদের সামরিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে তারা একে কাজে লাগাচ্ছে। তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছু বিভ্রান্ত মুসলিমকে বেছে নিয়েছে। তাদেরকে দিয়ে জঙ্গিবাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে, এ সকল মুসলিম বুঝে হোক না বুঝে হোক তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে। অথচ এদের অনুধাবন করা উচিত ছিল ইসলাম কখনো বোমাবাজি, হত্যা, গুপ্তহত্যা, আত্মঘাতী হামলাসহ কোনো ধরনের অরাজকতা সমর্থন করে না। পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রের কারণে হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে হোক যারাই এই পথে পা বাড়িয়েছে তারা জঘন্যতম অপরাধে জড়িত হয়েছে এবং ফিতনা-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছে।

জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা

জঙ্গি, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদী শব্দগুলোর মূল হল জঙ্গ। এটি ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দ। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, তুমুল কলহ, লড়াই, প্রচণ্ড ঝগড়া। জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা। সেভাবে জঙ্গিবাদ অর্থ জঙ্গিদের মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ড। জঙ্গিবাদ যেহেতু নতুন শব্দ তাই এর আরবী প্রতিশব্দ আরবী অভিধানসমূহে পরিলক্ষিত হয় না। তবে এর কাছাকাছি যে শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই তা হলো 'ইরহাব'। অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা, ভীতি প্রদর্শন করা। পারিভাষিক অর্থে, ধর্মীয় কারণে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে চোরা গোপ্তা হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, হত্যা করা, আত্মঘাতী হামলা কিংবা কোনো নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে জঙ্গিবাদ বলে।

আধুনিক বিশ্বে জঙ্গিবাদের বিশেষ উত্থান

অনেক বিশ্লেষক বলে থাকেন যে, বিশ্বে বর্তমান জঙ্গিবাদের উত্থান হয় ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে দেয়ার পর। যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে হামলা চালায়। হাজার হাজার টন বোমা ফেলে আফগানিস্তানের হাজার হাজার মুসলিম নাগরিককে হত্যা করে। অনুরূপভাবে ইরাকের কাছে গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে বলে মিথ্যা অভিযোগে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র ও

যুক্তরাজ্য হামলা চালায় ইরাকের উপর। সেখানেও তারা অজশ্র টন বোমা নিক্ষেপ করে হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করেছে। তাদের সেসব কর্মকাণ্ডকে উপজীব্য করে অনেকেই যুবক শ্রেণির মধ্যে ভাবাবেগ তৈরী করে দেশে দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান করে।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ধর্মপ্রীতি এদেশের ঐতিহ্য। আমাদের সমাজ কাঠামোর ভেতর কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এদেশে কোনো ব্যবস্থা নিতে হয় না। কিন্তু একটি কুচক্রিমহল বাংলাদেশের এ ঐতিহ্যকে মোটেই সহ্য করতে পারছে না। তাই তারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ধারা বিনষ্ট করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাস কবলিত মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। এজন্য তারা ইসলামের নামধারী কয়েকটি সংগঠন বিশেষ করে 'জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ' বা জেএমবিকে ব্যবহার করে গত ১৭ আগস্ট ২০০৫ গাজীপুর ও চট্টগ্রাম আদালত প্রাঙ্গনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক নজিরবিহীন সন্ত্রাসী ঘটনার জন্ম দেয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে অনেক নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে। শুধু তাই নয় এ সকল জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ইসলামের নাম ব্যবহার করে তারা ইসলামের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালায়। মূলত তখন থেকেই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়।

বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ উত্থানের অন্যতম কারণ

ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানের পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান। কোনো বিষয় সন্ত্রাস উস্কে দিচ্ছে, কোনো কোনো বিষয় জঙ্গিবাদীরের প্রচারণা ইসলাম-প্রেমিক সরলপ্রাণ যুবক-যুবতীদের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারছে। কারণগুলি চিহ্নিত করে সেগুলির প্রতিকার করতে পারলে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে তা সহায়ক হবে বলে মনে হয়। এগুলির মধ্যে কিছু কারণ সৃষ্টি করেছেন অমুসলিমগণ এবং কিছু কারণ সৃষ্টি করেছেন মুসলিমগণ। মুসলিম সৃষ্ট কারণগুলির মধ্যে কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক এবং কিছু ধর্মীয়। এখানে এই জাতীয় কিছু সম্ভাব্য কারণ আলোচনা করছি।

ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের উত্থানের অন্যতম কারণ বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের উপর নির্বিচার অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ। ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, ইরাক, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, চীন ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নির্বিচার জুলুম, অত্যাচার ও জাতিগত নিধনযজ্ঞ চলছে। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের অদম্য আবেগই জঙ্গিবাদের জন্ম দিচ্ছে। মানুষ যখন নির্বিচার অত্যাচারের প্রতিবাদে আইনগতভাবে কিছুই করতে না পারে তখন বে-আইনীভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করে এবং তার বে-আইনী কর্মকে 'আদর্শিক' ছাপ দেয়। মার্কিন সরকারের হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ গ্রহণ বা জুলুমের প্রতিকার করতে আবেগী যুবক সাধারণ মার্কিন নাগরিককে বা মার্কিনীদের সাথে সহযোগী বলে অন্য কোনো দেশ ও ধর্মের কোনো মানুষকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে একটি কঠিন অন্যায় ও পাপের মধ্যে নিপতিত হন। কারণ;

* ইসলাম অন্যায়ের প্রতিবাদ অন্যায় পদ্ধতিতে করতে অনুমতি দেয় না।

* ইসলাম একের অপরাধে অন্যকে শাস্তি প্রদানের অনুমতি দেয় না। অনুরূপভাবে,

* ইসলাম কোনো ব্যক্তি দল বা গোষ্ঠীকে বিচার বা শাস্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণের অনুমতি দেয় না।

এজন্য প্রাজ্ঞ আলিমগণ এ সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে, শান্তিপূর্ণভাবে সহিংসতা বর্জন করে প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনের উৎসাহ দেন। কিন্তু আবেগী যুবকের কাছে তাদের মত দুর্বলতা বা দালালি বলে মনে হয়। এই পরিস্থিতিতে 'আধুনিক অর্ধ-আলিম ধর্মগুরুদের' 'ফাতওয়া' তাদের কাছে যুগোপযোগী, সঠিক ও দ্রুত ফললাভের সহায়ক বলে মনে হয়। এভাবেই জঙ্গিবাদের উত্থান ও প্রসার ঘটতে থাকে।

জঙ্গিবাদ বনাম জিহাদ

মুসলিম জঙ্গিবাদী বিপথগামীরা সাধারণত তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামের পবিত্র পরিভাষা জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তারা জিহাদের নামেই তাদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিতালের প্রসঙ্গ তুলে ধরছে। অথচ এই জিহাদ ও কিতাল বৈধ কোনো কর্তৃপক্ষ ছাড়া অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সরকার ছাড়া কেউ ঘোষণা দিতে পারে না।

বস্তুত জিহাদের কাজ শুরু হয় মানুষের ব্যক্তি জীবনের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তারপর নিজের আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যমে। এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক অব্যাহত প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া। সর্বশেষ প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের অর্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর সেটি হবে সামনাসামনি যুদ্ধ

যা কিতাল এবং তা হবে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের আদেশে এবং তাঁর নেতৃত্বে। সেজন্য ইসলাম জিহাদ ও কিতালের ক্ষেত্রে অনেক শর্ত আরোপ করেছে। নিঃশর্তভাবে যার ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা জিহাদ শুরু করার সাধারণ ক্ষমতা সবাইকে দেয়া হয়নি।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন জিহাদের প্রধানতম শর্ত

রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিই কেবল জিহাদের ঘোষণা দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ

'রাষ্ট্রপ্রধান হলো ঢাল, তাঁর পিছনে থেকেই যুদ্ধ করতে হবে'।[১]

যদি কোনো দল বা গোষ্ঠীকে অথবা কোন দল বা আমীরকে জিহাদ বা কিতালের ঘোষণা দেয়ার অধিকার দেয়া হয় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, মারামারি ও গোলযোগ শুরু হয়ে যাবে। এভাবে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে যার পরিণতিতে দেশ ও জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তা ছিল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। তদ্রুপ উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুদ্ধও রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ ছিল।

আত্মঘাতী হত্যার মাধ্যমে মানুষদেরকে হত্যা করা, নিরীহ জনগণকে হত্যা করা, কিংবা গুপ্ত হত্যা করা, পিছন থেকে হত্যা করা, বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা করা, জান-মাল ধ্বংস করা কিছুতেই জিহাদ হতে পারে না। বিগত দেড় হাজার বৎসর ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে 'জিহাদ' নামে এরূপ অপকর্ম কখনোই দেখা যায়নি। রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোনো নিষ্ঠাবান মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা করেছে, আত্মহত্যার মাধ্যমে মানুষ হত্যা করেছে, কারো বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে, কোন জনপদে বোমাবাজি ও অরাজকতা করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, ইত্যাদির কোনো নজির দেখা যায় না। সুতরাং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডকে জিহাদের নামে চালিয়ে দেয়া মোটেও বৈধ নয়।

আল-কুরআনে জিহাদ ও তৎসম্পর্কিত শব্দ ৩৬ বার এসেছে এবং প্রতিবারই ন্যায়নীতির সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে জঙ্গিবাদ হলো অন্যায়ভাবে মানুষদেরকে আক্রমণ করা, তাদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং নিরিহ লোকজনকে হত্যা করা ইত্যাদি।

---

১. সহীহ আল-বুখারী, ২৯৫৭

জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট অবস্থান

জঙ্গিবাদীরা সাধারণত সে সকল জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হাসিল করতে চায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে (ক) বোমাবাজি করে অরাজকতা সৃষ্টি করা। (খ) মানুষ হত্যা ও (গ) আত্মঘাতী হামলা।

ক. বোমাবাজি ও অরাজকতা সৃষ্টি করা :

জঙ্গিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে থাকে, তার মধ্যে একটি হল বোমাবাজি করে অরাজকতা সৃষ্টি করা, সমাজে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ করা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা। পবিত্র কুরআনে এগুলোকে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' শব্দদয় দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। ফিতনা-ফাসাদ মহান আল্লাহর কাছে অতীব ঘৃণিত একটি মহাপাপ, কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সমস্ত কাজকে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলোর জন্যে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

"পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না"।[১]

তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ তথা দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়িও না"।[২]

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ তথা দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়িও না"।[৩]

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ তথা দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়িও না"।[৪]

---

১. সূরা আল-আ'রাফ: ৫৬
২. সূরা আল-বাকারাহ্: ৬০
৩. সূরা আল-আ'রাফ: ৭৪
৪. সূরা হূদ: ৮৫

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ তথা দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়িও না"।[১]

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ তথা দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়িও না"।[২]

খ. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা

জঙ্গিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আরেকটি জঘন্য অপরাধ করে থাকে তা হলো মানব হত্যা। এটা বিভিন্নভাবে করে থাকে, গুপ্তভাবে, পিছন থেকে, বোমা মেরে কিংবা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দিয়ে।

সেজন্য মহান আল্লাহ একজন মানবের জীবন সংহারকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন। মানব জীবনের নিরাপত্তার প্রতি ইসলাম যতটা গুরুত্ব দিয়েছে অন্য কোনো ধর্মে বা মতাদর্শে এর নযির নেই। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"এ কারণে আমি বনী ইসরাইলকে এরূপ লিখে দিয়ে ছিলাম যে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করলো আর যে ব্যক্তি কোন একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করলো"।[৩]

গ. আত্মঘাতী হামলা বা সুইসাইড স্কোয়াড

জঙ্গিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অপর যে জঘন্য কর্মটি করে থাকে সেটা হলো আত্মঘাতী হামলা। আর এটি করে সাধারণত সুইসাইড স্কোয়াড বা আত্মঘাতী দল গঠনের মাধ্যমে। কিছু সহজ-সরল সাদাসিধে মুসলিমকে জান্নাত পাবার লোভ, কিংবা অন্যান্য পুরস্কারের কথা বলে এ কাজে নিয়োজিত করে থাকে। অথচ মহান আল্লাহ যে ভাবে অপরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সেভাবে নিজের জীবনকেও ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। আত্মহত্যা করতে বারণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উদ্ধৃত করা হলো। মহান আল্লাহ বলেন,

---

১. সূরা আশ-শু'আরা: ১৮৩
২. সূরা আল-আনকাবুত: ৩৬
৩. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না"।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর দয়ালু"।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

"যে ব্যক্তি নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করবে (আত্মহত্যা করবে) সে জাহান্নামে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করবে। আর যে নিজেকে আঘাত করবে (আত্মহত্যা করবে), সে জাহান্নামেও নিজেকে আঘাত করবে"।[৩]

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে করণীয়

আমরা মনে করি জঙ্গিবাদ কোনো বড় ধরনের সমস্যা নয়। গুটি কয়েক ব্যক্তি এর সাথে জড়িত। এরা অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত। যদি সদিচ্ছার সাথে কিছু সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেওয়া যায় তাহলে এ সমস্যাটি সহজে দূর করা যাবে বলে বিশ্বাস করি, নিম্নে এ লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাব পেশ করা হলো।

১. যে সকল মুসলিম দেশে জঙ্গিবাদ সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের শাসকদের বুঝতে হবে এটা ইসলাম বিদ্বেষী-পশ্চিমা শক্তি, ইয়াহুদী গোষ্ঠী ও তাদের দোসরদের ষড়যন্ত্র, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদসৃষ্টি ও মুসলিমদের শক্তিকে দুর্বল করার জন্য তারা এ সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অতএব, তাদের পাতা ফাঁদে পা দেয়া যাবে না।

২. এই জঙ্গিবাদের সাথে গুটি কয়েক বিভ্রান্ত মুসলিম জড়িত। এদেরকে হিদায়াতের জন্য সত্যিকার আলিম-ওলামাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে যে, জঙ্গিবাদ কোনোক্রমেই ইসলামের পথ নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে জাহান্নামের পথ।

---

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯৫
২. সূরা আন-নিসা: ২৯
৩. সহীহ আল-বুখারী: ১৩৬৫

৩. যেহেতু জঙ্গিবাদের সাথে সত্যিকার আলিমরা ও দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানী লোকেরা জড়িত নয়, তাই জঙ্গিবাদ দমনের জন্য তাদের সহযোগিতা নিতে হবে এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

৪. দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের ইমাম খতিবদের সহযোগিতা নিতে হবে, তারা যেন জুম'আর খুতবায় ও অন্যান্য সময়ে মসজিদগুলোতে জঙ্গিবাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদেরকে অবহিত করতে পারেন।

৫. দ্বীনকে ও দ্বীনী শিক্ষাকে কোনঠাসা করার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শ, মাদ্‌রাসা-মক্তবকে ঢালাওভাবে জঙ্গি আখড়া, জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র, তালেবান দুর্গ, মৌলবাদী অভয়ারণ্য বলার মত উসকানিমূলক বক্তব্য বন্ধ করতে হবে।

৬. জনগণকে সাথে নিয়ে এই জঙ্গিবাদ দমন করতে হবে। তাই জনগণের বিশ্বাস, ধর্ম-বিশ্বাস, তাদের লালিত মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে সম্মান করতে হবে। এ সবের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসকদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনক্রমে ইয়াহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। সে লক্ষ্যে এদের পরিবর্তে মুসলিম বিশ্ব ও সত্যিকার দ্বীনের জ্ঞানীদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

৮. ব্যক্তিগতভাবে আলিম-ওলামাগণ জঙ্গীবাদ দমনে এগিয়ে আসতে পারেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা, ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সর্ব সাধারণকে সতর্ক করতে পারেন।

৯. তদরূপ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে এর ভয়াবহতা ও অনিষ্টকর দিকগুলো সম্পর্কে জন-সাধারণকে অভিহিত করতে পারেন।

উপসংহার

আমরা সকলে জানি, ইসলাম অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা ও মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবকুলের শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও উন্নতির জন্য মনোনিত করেছেন ইসলাম ধর্মকে। অতএব একজন মুসলিম অপর মুসলিমের অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে না। তাইতো একজন আরেক জনের সাথে দেখা হতেই 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে সম্বোধন করে। যার অর্থ "আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক"। তাহলে কিভাবে সে অন্যকে

অশান্তিতে ফেলে দেবে? অন্যের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে? সুতরাং ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বের এমনকি বাংলাদেশেরও কোনো প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত আলিম বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কোনো ধরনের জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নেই। জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতা দিয়ে একে তো দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। আর করা গেলেও তার কোন শুভ ফল আশা করা যায় না। এ কথা সর্বমহলে স্বীকৃত যে, ইসলাম তার অন্তর্নিহিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তরবারি, জঙ্গিবাদ কিংবা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়। তবে নতুন গজিয়ে ওঠা কিছু গ্রুপ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন দিচ্ছে। তারা জিহাদের নামে ইসলামের নামে বিভিন্ন অরাজকতামূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করছে। অথচ এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, যা আমরা ইতোপূর্বে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝতে পেরেছি। ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণ হারাম। বোমাবাজি, মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও আত্মঘাতী তৎপরতা ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা এগুলো করছে তারা বিভ্রান্ত, ইসলাম বিরোধীদের ক্রীড়নক। এদের চিহ্নিত করে প্রতিহত করা প্রয়োজন।

ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ: উৎপত্তি, কারণ ও প্রতিকার

الإرهاب على ضوء الإسلام : نشأته وأسبابه ومعالجته

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

মহাপরিচালক

ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড কালচার, উত্তরখান, ঢাকা।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর যাবত বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে বোমা হামলা চালানোর মাধ্যমে বিভিন্ন সময় সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ সবের কিছু কিছু ঘটনা ইসলাম প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের চেষ্টার অংশ হিসাবে করা হয় বলে দাবী করা হয়। বিশেষ করে ইসলামী দাওয়াত প্রচারের নামে ১৭ আগষ্টে পরিচালিত সারা দেশব্যাপী পরিচালিত সিরিজ বোমা হামলা, ৩রা অক্টোবর বিভিন্ন আদালতে বোমা হামলা এবং ১৪ই নভেম্বর ২০০৫ তারিখে ঝালকাঠিতে ও ১৮ নভেম্বর গাজীপুরে আত্মঘাতী বোমা হামলা করে বিচারক হত্যার ঘটনা, সম্প্রতি ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজন ব্যাকারী ও কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া ঈদগাহে ঈদুল ফিতরের সালাতের সময় হামলা এবং হত্যা সহ বিভিন্ন হুমকিমূলক চিঠি বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বরাবর প্রেরণ করছে। এসব কর্মকাণ্ডকে উগ্রবাদী সঙ্গানগুলো জিহাদী কর্মকাণ্ড হিসাবে মনে করে নিজেদেরকে শহীদ কিংবা গাজী হওয়ার দাবী করছে। এহেন পরিস্থিতিতে তাদের এ কর্মকাণ্ড ইসলামের সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তা যাচাই করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধে কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো।

সন্ত্রাস কী?

যে কোন কারণ ও উদ্দেশ্যে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, জান-মালের ক্ষতি সাধন, দেশ ও সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন, স্থাপনা ও স্থাপত্য ধ্বংস ও সর্বস্তরের নাগরিকদেরকে যা আতঙ্কিত করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখিন করে তাকেই বলা হয় সন্ত্রাস।[১]

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিভিন্নরূপ

১. মুসলিম ও অমুসলিম বিভিন্ন দেশে স্থাপনা ও কূটনৈতিক এলাকা ও ভবনে বোমা বিস্ফোরণ।
২. শাসকদের আনুগত্য হতে বেরিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা।
৩. গোপন হত্যা।
৪. আত্মঘাতী হামলা চালানো।
৫. বিমানসহ অন্যান্য যানবাহন ছিনতাই।
৬. ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে কাফির বলে আখ্যাদান ও ধর্মত্যাগী হিসাবে চিহ্নিত করা ও তাদেরকে হত্যার হুমকি প্রদান।
৭. ভিন্ন মতাবলম্বী আলেম ওলামাকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা।

---

১. দেখুন মাসিক আল-ফুরকান আরবী ম্যাগাজিন আর, আই, এইচ, এস কুয়েত, সংখ্যা ৯৭, মে ১৯৯৮ পৃ: ৬; আল কিত্বাউল খায়রী ওয়া দায়াওয়াল ইরহাব, পৃ. ১১০

৮. অমুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠণ।
৯. বিভিন্ন এনজিও অফিস ও ব্যাংক ডাকাতি।
১০. চিঠিপত্রের মাধ্যমে বা সরাসরিভাবে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তিদের জীবননাশের হুমকি প্রদান।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান

ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় বিশ্বাসী সহ সকল শ্রেণীর মানব জাতির জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ধর্ম। ইসলাম কোনভাবে উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতাকে স্বীকার ও সমর্থন করে না। এবং এর কোন দিন ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয় না বা এ পন্থায় কাউকে মুসলিম বানানো যায় না। নিম্নে বর্ণিত কুরআন ও হাদীসের দলীল এরই প্রমাণ বহন করে :

১। ইসলামে ন্যায়-নিষ্ঠা, সদাচরণ ও সহানুভূতির আদেশ রয়েছে, আর নিষেধ রয়েছে অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনঃ

তার প্রমাণ নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা সদাচরণ এবং আত্মীয়কে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর"।[১]

এ সকল বোমা হামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চরম অন্যায় ও বর্বরতা, এতে কোন ন্যায়-নিষ্ঠা, সহানুভূতি ও সদাচরণ নেই। বরং এটি নিছক অন্যায় ও বিরুদ্ধাচরণমূলক কাজ।

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لاَ تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إلاَّ مِنْ شَقِيٍّ

"একমাত্র নির্দয় ব্যক্তি হতেই দয়া ছিনিয়ে নেয়া হয়"।[২]

---

১. সূরা আন-নাহল: ৯০
২. সুনান আবু দাউদ: ৪৯৪২; সুনান তিরমিযী : ১৯২৩; আলবানীর সহীহুল জামি : ৭৪৬৭

এই মহানুভবতার দিকে লক্ষ করুন যার দিকে ইসলাম আহ্বান করেছে। অতঃপর আপনি চিন্তা করে দেখুন যারা এই বোমা বিস্ফোরণের মত অন্যায় কাজ সংঘটিত করছে, যার দ্বারা শিশুরা ইয়াতীম, নারীরা বিধবা, অসংখ্য প্রাণ হরণ, হৃদয় আতঙ্কিত, সম্পদ বিনষ্ট এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তি বিলুপ্ত করা হচ্ছে। এর মাঝে কোথায় ইসলামের সেই মহানুভবতা, তারা কি বুঝে না?

২। আল্লাহ তা'আলা অবৈধভাবে যেকোন ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটাতে নিষেধ করেছেন : বিশেষ করে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা মহা অপরাধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলিমকে হত্যা করে তার শাস্তি জাহান্নাম। সে তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন"।[১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে"।[২]

আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"তোমরা নিজেরা পরস্পরকে হত্যা করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল"।[৩]

---

১. সূরা আন-নিসা: ৯৩
২. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২
৩. সূরা আন-নিসা: ২৯

আবুদ্ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

আল্লাহর সাথে শিরককারী ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার গুনাহ ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহকে আল্লাহ হয়তো ক্ষমা করে দিবেন"।[১]

উবাদা ইবনুস সামেত রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আল্লাহ তা'আলা তার কোন নফল ও ফরয ইবাদাত গ্রহণ করবেন না"।[২]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا

"মু'মিন ব্যক্তি উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন জীবন-যাপন করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম পন্থায় অন্যের রক্তপাত না ঘটাবে"।[৩]

৩। ইসলামে অন্যায়ভাবে নির্দোষ মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা হারাম :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

"ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করোনা- যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন"।[৪]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন,

---

১. সুনান আবূ দাউদ: ৪২৭০
২. সুনান আবূ দাউদ: ৪২৭০
৩. সুনান আবূ দাউদ : ৪২৭০
৪. সূরা বানী ইসরাঈল : ৩৩

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ

"ব্যভিচার, হত্যা এবং ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অপরাধ ব্যতীত আল্লাহ ও রাসূলে বিশ্বাসী কোন মানুষকে হত্যা করা বৈধ নয়"।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَزَوالُ الدُّنْيا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُسْلِمٍ

"আল্লাহর নিকট সারা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও গুরুতর বিষয় হচ্ছে কোন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা"।[২]

অথচ বোমা হামলার ন্যায় অন্যায় কাজ দ্বারা কত অসংখ্য মুসলমানই না নিহত হচ্ছে।

৪। মু'মিনদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ইসলামে নিষিদ্ধ :

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়"।[৩]

৫। অস্ত্র বা এ জাতীয় বস্তু দ্বারা কোন মুসলিমকে হুমকি দেয়া ইসলামে হারাম :

চাই তা স্বেচ্ছায় হোক বা হাসি-তামাশার ছলেই হোক। এমনিভাবে মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে খোলা অবস্থায় অস্ত্র বহন করা নিষেধ করা হয়েছে।

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৬৮৭৮; সহীহ মুসলিম: ১৬৭৬

২. সুনান তিরমিযী : ১৩৯৫

৩. সহীহ আল-বুখারী: ৭০৭০; সহীহ মুসলিম: ৯৮

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

"তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা হুমকি না দেয়। কেননা হতে পারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান তার হস্তদ্বয়ে আঘাত হানার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটবে, অতঃপর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"।[১]

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আরো বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

"কোন ব্যক্তি যদি লোহা দ্বারা তার ভাইকে হুমকি দেয় তবে তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন যদিও হুমকি প্রদানকৃত ব্যক্তি তার সহোদর ভাই হয়"।[২]

অতএব, উক্ত হাদীসগুলোর আলোকে ইচ্ছাকৃতভাবে এ ধরণের বোমাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও জঘন্য অপরাধ এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

৬। ইসলামে আত্মঘাতী হামলা আত্মহত্যার শামিল, আর উভয়ই স্পষ্ট হারাম :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"তোমরা নিজেরা পরস্পরকে হত্যা করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল"।[৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"তোমরা নিজের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না আর মানুষের প্রতি সদাচরণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সদাচরণকারীদের ভালোবাসেন"।[৪]

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৭০৭২; সহীহ মুসলিম: ২৬১৭

২. সহীহ মুসলিম: ২৬১৬

৩. সূরা আন-নিসা: ২৯

৪. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৯৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

"যে ব্যক্তি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে তাকেও জাহান্নামে অনুরূপভাবে আঘাত করা হবে"।[১]

তিনি আরো বলেন :

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি নিজেকে কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে"।[২]

অতএব যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে তাকে সেভাবে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামে আত্মঘাতী হামলা চালানোর কোনই সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে যারা আত্মঘাতী হামলায় অংশগ্রহণ করছে ইসলামকে না বুঝে বিকৃত মানসিকতার কারণে তা করছে।

৭। ইসলাম অমুসলিমকেও হত্যা করা হারাম করেছে :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে"।[৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ১৩৬৫

২. সহীহ আল-বুখারী: ৬০৪৭; সহীহ মুসলিম: ৩১৫

৩. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২

"অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না-যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন"।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদে বসবাসকারী চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতেও তার সুগন্ধ পাওয়া যায়"।[২]

আম্‌র ইবনুল হামক আল-খুযাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أيما رجل أمن رجلا على دمه ثم قتله فأنا من القاتل بريء وإن كان المقتول كافرا

"যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির রক্তের নিরাপত্তা প্রদান করে পরবর্তীতে হত্যা করল, আমি ঐ হত্যাকারীর থেকে মুক্ত অর্থাৎ আমার সাথে ঐ হত্যাকারীর কোন সম্পর্ক নেই, যদিও নিহত ব্যক্তি কাফির হয়"।[৩]

কাফিররা যদি মুসলিম রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অথবা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির শান্তি চুক্তিতে প্রবেশ করে বসবাস করে, তবে তাদের শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তার পরিপন্থী কোন কাজ করা যাবে না। অথচ এ বোমা হামলাকারী সীমালঙ্ঘনকারীরা মুসলিমদের যিম্মা, চুক্তি ও ওয়াদার প্রতি বিবেচনা করে না বরং তারা চুক্তিবদ্ধ ও শান্তি চুক্তিবদ্ধ, মানুষকে হত্যা করে থাকে।

৮। ইসলাম বিপর্যয় সৃষ্টিকে হারাম করেছে। আর বিপর্যয় সৃষ্টি মুনাফিকদের কাজ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

"যখন সে (মুনাফিক) জনপদে ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে ফাসাদ সৃষ্টি, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস ও প্রাণনাশ করতে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করে না"।[৪]

---

১. সূরা বানী ইসরাঈল : ৩৩
২. সহীহ আল-বুখারী : ৩১৬৬
৩. সহীহ ইবনু হিব্বান : ৫৯৮২
৪. সূরা আল-বাকারাহ্: ২০৫

তিনি আরও বলেন :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾

"যখন তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) বলা হয় : দুনিয়ার বুকে তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে আমরাতো শান্তি স্থাপনকারী"।[১]

৯। ইসলামে ভয়-ভীতি দেখানো নিষিদ্ধ বা অবৈধ :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

"কোন মুসলিমের পক্ষে অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত করা বৈধ নয়"।[২]

অতএব তথাকথিক জিহাদীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভীতি প্রদানের কাজটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। এগুলো ঈমানদার কোন মানুষের কর্ম হতে পারে না।

১০। ইসলাম অমুসলিমদের সাথে সদাচারণ করার নির্দেশ দিয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে :

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেনি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকদের ভালোবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছে এবং বহিস্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই অত্যাচারী"।[৩]

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্: ১১

২. সুনান আবূ দাউদ: ৫০০৪

৩. সূরা আল-মুমতাহিনাহ্ : ৮-৯

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"আর লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[১]

অতএব অমুসলিম হলেই তাকে হত্যা করতে হবে এরূপ ধারণা ইসলামকে বিকৃত করার শামিল তাতে কোন প্রকারের সন্দেহ নেই। মুসলমানরা তাদের পক্ষ হতে কোন নির্যাতন নিপীড়নের শিকার না হলে তাদের সাথে অসদাচরণ করা যাবে না। বরং তাদের সাথে সদাচরণ করেই চলতে হবে।

১১। ইসলাম সীমালঙ্ঘন ও অত্যাচার করাকে নিষিদ্ধ করেছে :

আল্লাহ তা'আরা বলেন :

﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালোবাসেন না"।[২]

হাদীসে কুদসীতে, এসেছে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

"হে আমার বান্দাহগণ! আমি আমার জন্য অত্যাচারকে হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে অত্যাচারে লিপ্ত হইওনা"।[৩]

অতএব এই কাজ (বোমা হামলা) সীমালঙ্ঘন ও অপরাধ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১২। ইসলাম অন্যের উপর চড়াও হওয়া ও তাদের সম্পদ ধ্বংস করাকে হারাম করেছে :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্ : ১৯০
২. সূরা আল-বাকারাহ্ : ১৯০
৩. সহীহ মুসলিম : ২৫৭৭

আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বিদায় হজ্জের ভাষণে) বলেছেন :

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য ঐরূপ হারাম- আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহরে যে রকম হারাম"।[1]

এই পাপাচারী ও সীমালজ্ঘনকারীরা কত ঘড়-বাড়ী ও ধন সম্পদই না ধ্বংস করে থাকে।

১৩। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা ঘুমন্ত অবস্থায় আরামের সময় তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন:

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ رَمَانَا بِاللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি রাতের বেলা আমাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে সে আমাদের দলভূক্ত নয়"।[2]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, জঙ্গিবাদীরা জিহাদ ও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের নামে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত এবং প্রশাসন, বিচার ও নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বোমা হামলা করে হত্যাযজ্ঞ ঘটানো নিছক সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কাজ। যারা এসমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারা ইসলাম, মুসলমান, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও জাতির শত্রু।

১৪। তথাকথিত ইসলাম দরদী জিহাদীদের চরমপন্থা অবলম্বনের অন্যতম কারণ হলো তারা চায় সকল মানুষকে বল প্রয়োগ করে মুসলিম বানাতে। অথচ আল্লাহ বল প্রয়োগের মাধ্যমে তা চান না। বরং তিনি চান যে কোন ব্যক্তি বুঝে শুনে স্বজ্ঞানে মুসলিম হোক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

১. সহীহ আল-বুখারী : ৬৭; সহীহ মুসলিম : ১৬৭৯
২. মুসনাদে আহমাদ : ২/৩২১; সহীহুল জামি, আলবানী : ৬২৭০

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত পথভ্রষ্টতা হতে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা পথভ্রষ্টকারী 'তাগূত'দেরকে মান্য করবে না এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী"।[১]

এ মর্মে কুরআনে বহু আয়াত আছে।

জনৈক আনসারী ছাহাবী তাঁর দুই পুত্রকে খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হওয়ার প্রতি বাধ্য করার সময় উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।[২]

এ সব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটানোর কারণসমূহ :

(ক) ইসলামী জ্ঞানের অপর্যাপ্ততা, অপরিপক্কতা এবং বিজ্ঞ আলিমগণের শরণাপন্ন না হওয়া :

১। মূর্খতা ও শরঈ জ্ঞানের স্বল্পতা।

২। জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে হক নাহক যাচাই-বাছাই না করা।

৩। শরঈ জ্ঞানার্জনে নির্ভরযোগ্য আলেমদের থেকে ইসলামী জ্ঞানার্জন না করা।

৪। সঠিক জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় এমন ধর্মাবেগ।

৫। আল্লাহর প্রতি ভয়ের স্বল্পতা এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থাকা। বিশেষ করে আল্লাহভীরু গভীর ইলমের অধিকারী আলিমগণ দ্বারা কোন বিষয়ের হুকুম স্পষ্ট হওয়ার পরেও তা লঙ্ঘন করা।

৬। আলিমগণের ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রাথমিক স্তরের জ্ঞানেস্বষণকারী ছাত্রদের নিজে নিজে ইজতিাদ করা।[৩]

৭। শাসকগোষ্ঠী, সরকার, আলিম-উলামাদের একদলকে কাফির মনে করা।

(খ) পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক কারণসমূহ :

১। বাংলাদেশী দেশাত্মবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধে যারা বিশ্বাসী নয়, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে উক্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হতে পারে। যারা ইসলামকে

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্ : ২৫৬
২. দেখুন, তাফসীর ইবনু কাছীর : ১/২৯৪
৩. দেখুন, বারাআতুল ইসলাম মিন কাতলিল আবরিয়া, পৃ. ৭-৯

নিপাত করার জন্য বিদেশী প্রভুদের খুদ কুড়া খেয়ে ইসলামী আদর্শের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে এবং ইসলাম ও ইসলামী নেতৃত্ব এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানকে জনসম্মুখে ও বিশ্বময় কলঙ্কিত করতে চাচ্ছে, উক্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও বোমাবাজীতে তাদের কালো হাত থাকতে পারে।

২। বহির্বিশ্ব ও দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ইসলামের দুশমনরা বাংলাদেশের গণবিচ্ছিন্ন ধর্মীয় লেবাসধারী একটা ইচঁড়ে পাকা শ্রেণীকে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করে উক্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে।

৩। বোমা ও গ্রেনেড তৈরি করার সরঞ্জামাদির সহজ লভ্যতা, বিনা বাধায় দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে জড়িত লোকদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ উক্ত বেআইনী কার্যক্রম অব্যাহত থাকার ফলে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া গতি সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ক্ষতি ও ভয়াবহ পরিণতি :

১। প্রভাবশালী অমুসলিম দেশ কর্তৃক প্রভাব বিস্তার ও আগ্রাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যাতে দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়।

২। ইসলাম ও ইসলামী দা'ওয়াত ও ইসলামী জনকল্যাণমূলক সংস্থা সমূহ কোন ঠাসা হয়ে পড়ে।

৩। প্রকৃত ইসলামী জাগরণ বাধাগ্রস্থ হয়।

৪। ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করে।

৫। ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যক্রমকে ক্রুটিযুক্ত ও দোষারোপ করা হয়।

৬। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়।

৭। স্বাভাবিক ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রেও আলিম-ওলামাগণ ভীতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন।

৮। মুসলিমদের মাঝে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়ে তাদের মধ্যকার ঐক্য বিনষ্ট হয়।

৯। ইসলাম বিদ্বেষী প্রচারমাধ্যমগুলো ইসলাম, ইসলামী জিহাদ ও সেবামূলক কল্যাণমূখী কাজ বিকৃত করে তুলে ধরার সুযোগ পায়।

১০। দেশের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধি পায়।[১]

১১। জিহাদের নামে পরিচালিত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ইসলামী জিহাদকেই কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্থ করে।

---

১. দেখুন, বারাআতুল ইসলাম মিন কাতলিল আরাবিয়া, পৃ. ৭-৯

জঙ্গিবাদের প্রতিকারের উপায় :

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন ও নির্মূল করতে হলে সরকারী ও বেসরকারী সকল দল ও মহলকে এর জন্য কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। নিম্নে বিভিন্ন দল ও মহলের কিছু ভূমিকা উল্লেখ করা হল :

প্রথমত : সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা :

১। জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরকারী দল ও সকল বিরোধী দলের মাঝে জনগণকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলা।

২। সকল আলিম ওলামা ও জ্ঞানীজন এবং প্রচারণার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দেশে কোন নতুন মতাদর্শের আবির্ভাব হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে সরকারী তত্ত্বাবধানে সারাদেশব্যাপী মনিটরিং কমিটি গঠন করা।

৩। সন্ত্রাসীদের অর্থ সম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র জোগানদাতাদের চিহ্নিত করা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্দেহজনক লেনদেন কঠোরভাবে দ্রুত তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। সকল প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ এবং মসজিদের ইমামদেরকে নিয়ে জেলাভিত্তিক সন্ত্রাসীদের চিন্তাধারা ও যুক্তি খণ্ডনকল্পে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনারের ব্যবস্থা করা।

৫। আটককৃত জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দ্রুত সিদ্ধান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। পক্ষান্তরে নিরাপরাধীদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের মদদ দাতা ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতাদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধেও দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যে কোন দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা মদদ দাতা প্রমাণিত হলেও তার পক্ষে কোন দলীয় অবস্থান গ্রহণ না করা।

৭। সরাসরি সরকারী প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বর্তমান সময়ে সারা দেশব্যাপী কার সন্তান কোথায় কি করে এবং কতদিন হতে বাড়িতে নেই সাধারণ লোকদের সাথে তথ্য সংগ্রহ করে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা।

দ্বিতীয়ত : পরিবারের ভূমিকা :

১। পিতা-মাতা কর্তৃক তাদের সন্তানদের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা এবং এরূপ সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখা।

২। ধর্মীয় বিষয়ে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে গভীর ও পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী আলিমদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য সন্তানদের প্রতি তাগিদ দেয়া।

৩। সন্তানেরা যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধবের সাথে চলাফেরা করে তাদের মতি-গতি, দৃষ্টিভঙ্গি, কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। তাকে সন্ত্রাসী ও সন্দেহভাজনদের সাথে চলাফেরা করতে দেয়া যাবে না।

৪। পিতা-মাতাদেরকে সন্তানরা কোথায় কী করে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে থাকলে তার খবরদারী করতে হবে।

তৃতীয়ত : মিডিয়ার ভূমিকা :

১। দেশের ধর্ম ও তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্নমুখী সন্ত্রাস বিরোধী কর্মসূচী গ্রহণ করা। যেমন- পুস্তক, পোষ্টার, লিফলেট, হ্যাণ্ডবিল, স্টিকার বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে গণসচেতনতা গড়ে তোলা।

২। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পেপার-পত্রিকার মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গঠনমূলক ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে গণসচেতনতা গড়ে তোলা।

৩। সরকারী ও বেসরকারী বেতারকেন্দ্র ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

চতুর্থত : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা :

১। সকল প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি স্তরের ছাত্র/ছাত্রীদের সন্ত্রাস সম্পর্কে ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিষয়টি সিলেবাসভুক্ত করা।

২। শিক্ষকগণ কর্তৃক কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ককারী বক্তব্য প্রদান করা।

৩। সন্ত্রাসবাদ বনাম ইসলাম বিষয়ে বিতর্ক ও প্রবন্ধ রচনার উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

৪। জঙ্গিবাদীদের উপস্থাপিত বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ ও সংশয় খণ্ডনের জন্য নাটিকা ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

পঞ্চমত : আলিম-ওলামাগণ ও শিক্ষিত সমাজের ভূমিকা :

১। সকল আলিম ওলামা ও জ্ঞানীজন এবং প্রচারণার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে, দেশে কোন নতুন মতাদর্শের আবির্ভাব হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে দেশের প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লার অধিবাসীদের সচেতন করা।

২। বই, পুস্তক, লিফলেট ও প্রবন্ধ রচনা করে ছাপিয়ে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা করা।

৩। মাসজিদে খুৎবাহর ভিতর ও বিভিন্ন মাহফিলে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কথা বলা।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বিশুদ্ধ ইসলামী 'আক্বীদার গুরুত্ব

دور العقيدة الإسلامية الصحيحة لمكافحة الإرهاب والترويع

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

প্রিন্সিপাল

মাদ্‌রাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা।

সমগ্র বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, পরিচালক ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। তিনি শান্তিময় ও শান্তিদাতা। তাঁরই একমাত্র মনোনীত শান্তির ধর্ম ইসলাম। শান্তিময় বিশ্বের জন্য ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ইসলাম ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

"আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্বেষণ করবে তা কখনই কবূল করা হবে না বরং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।[১]

সুতরাং আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি আন্তর্জাতিক বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামের কোন বিকল্প নেই। মূলতঃ এটাই আমাদের বিশ্বাস এবং এটাই চিরন্তন সত্য। তাহলে কেন কিছু নগণ্য ব্যক্তি ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে অশান্তির আগুন প্রজ্জ্বলিত করছে? বিষয়টি অবশ্যই ভাববার, চিন্তা করবার। কারণ, যে ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে শান্তির বার্তা নিয়ে, সেই ধর্মের দোহাই দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে না। তবে কেন এমনটি হচ্ছে? নিশ্চয়ই এর পিছনে কোন রহস্য আছে! আর সে রহস্যের উদঘাটন করতেই "সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বিশুদ্ধ ইসলামী 'আক্বীদা'র গুরুত্ব" শিরোনামে দু'কথা লিখতে চাই।

ইসলামের নামে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনার পিছনে নানাবিধ কারণ অবশ্যই রয়েছে; তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, সঠিক ইসলামী 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের বিচ্যুতি। সুতরাং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সঠিক ইসলামী 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামের অনুসারী মাত্রই– প্রথমতঃ তার দু'টি দিক রয়েছে– একটি অভ্যন্তরীণ অপরটি বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কারণেই অনেক সময় বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ﴾

"যে আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে সম্মান করবে এটা যেন তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ"।[২]

অতএব বাহ্যিক পরিবর্তন যেন অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনেরই বহিঃপ্রকাশ। এজন্য ইসলাম অভ্যন্তরীণ বিষয়টির ওপর অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

১. সূরা আলে ইমরান: ৮৫
২. সূরা আল-হাজ্জ: ৩২

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾

"তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফ্রীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার অন্তর ঈমানের উপর অবিচল থাকে"।[১]

একইভাবে যারা অন্তরে নষ্টামী রেখে বাহ্যিক ভদ্রতা প্রকাশ করতে চায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরও নষ্টামী প্রকাশ করে বলেন :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী। (আল্লাহ তা'আলা বলেন) জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী"।[২]

কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত এরূপ অগণিত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, মানুষের অন্তরের কর্মের প্রতিফলন বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অন্তরের কর্ম হলো 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস আর বাহ্যিক কর্ম হলো 'আমল-আখলাক। যারা বাহ্যিকভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত– নিশ্চয়ই তাদের অন্তরের কর্ম বা 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাস সঠিক নয়। তাদের অন্তর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড লালন করে বলেই এক পর্যায়ে সেই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুতরাং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ হলো 'আক্বীদাহ্ সংশোধন বা 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা।

ইসলামের সূচনা থেকেই এক শ্রেণীর মানুষ বাহ্যিকভাবে মুসলিম হিসেবে পরিচিত; কিন্তু তাদের 'আক্বীদাহ্ বা বিশ্বাসগত ত্রুটির কারণে তারা যুগে যুগে ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। আজও যারা ইসলামের নামে দেশে-বিদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গি কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে তারা যেন 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলে ঐ একই সুতায় গাঁথা। ইসলামের ইতিহাসে তারা খারিজী নামে পরিচিত। তারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম বলে পরিচিত হলেও 'আক্বীদাহ্গতভাবে বড় ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। সেই ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্ আজও যারা লালন করে তারাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। অতএব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ ও নির্মূল করতে চাইলে ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্ সংশোধন করা অপরিহার্য। অতীতে ও বর্তমানে যারা খারিজীদের বিদ্রোহী ও সন্ত্রাসী 'আক্বীদাহ্ ও 'আমলের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং এ বিষয়ে বহু বই-পুস্তক রচনা করেছেন,

১. সূরা আন-নাহ্ল: ১০৬

২. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১১-১২

তারাই হলেন সালাফী বা আহ্‌লে হাদীস। দেশে-বিদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের প্রতিবাদে সালাফী বা আহ্‌লে হাদীস ইমাম-গবেষকদের বক্তব্য, বিবৃতি ও ফাতাওয়া সময়-সুযোগে স্ববিস্তারে উল্লেখ করব –ইনশা-আল্লাহ।

এক্ষণে আমরা খারিজীদের যেসব ভ্রান্ত 'আক্বীদার দরুণ তারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে থাকে– এমন কিছু তথ্য নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করব। সেই সাথে সালাফী 'আলেমদের কিছু মন্তব্য তুলে ধরতে চেষ্টা করবো ইনশা-আল্লাহ।

খারিজীদের ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্ উল্লেখের পূর্বে তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, উৎপত্তি ও সময়কাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া ভাল মনে করছি। বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক প্রফেসর ড. নাসের বিন আব্দুল কারীম আল-আকল বলেন, "খারিজী হলো তারা, যারা মুসলিমদের অপরাধে লিপ্ত হওয়ার কারণে কাফির বলে আখ্যায়িত করে এবং মুসলিমদের শাসক ও সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে"।

সকল যুগে ও স্থানে যারা এ নীতি ও পদ্ধতিতে চলে তারাই সর্বদাই খারিজী বলে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল যুগের খারিজীদের ব্যাপারে অবহিত করেছেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ، فَإِنَّ فِيْ قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ

"শেষ যামানায় একটি শ্রেণীর আগমন ঘটবে, যারা বয়সে ছোট হবে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে কম হবে (অর্থাৎ- ইসলামী বিদ্যায়), কথা খুব ভাল বলবে, (অর্থাৎ- কথায় কথায় কুরআনের উদ্ধৃতি দিবে), কিন্তু এতদসত্ত্বেও ঈমান তাদের কণ্ঠনালীর ভিতরে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ- শুধু বাহ্যিকভাবে ঈমানদার হবে)। প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর লক্ষ্যবস্তু ভেদ করে বের হয়ে যায়। তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে, কেননা যে হত্যা করবে কিয়ামতের দিবসে সে বড় প্রতিদান পাবে। (অর্থাৎ- ইসলামের স্বার্থে মুসলিম শাসকগণ তাদের হত্যা করবে)"।[১]

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৬৯৩০; আল খাওয়ারিজ: পৃ. ১৯

তৃতীয় খলীফা 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু 'আন্হু) নিহত হওয়ার পরেই বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো, উষ্ট্রী ও সিফ্ফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এর মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম মুসলিমদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দলীয়ভাবে খারিজী ও শী'আরা আত্মপ্রকাশ করল, যা ৩৭ হিজরী ও তার পরবর্তী সময়কাল।[১]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"খারিজী ও শী'আ এ দু'টি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে 'উসমান (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু)-এর হত্যার পর। আবূ বক্র, 'উমার ও 'উসমান (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু)-এর প্রথম যুগে মুসলিম উম্মাহ ঐকবদ্ধ ছিল, কোন বিভক্তি ছিল না। 'উসমান (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু)-এর খিলাফতের শেষের দিকে কিছু মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তারা 'উসমান (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু)-কে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। তাঁর হত্যার পরে মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। 'আলী (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু) ও মু'আবিয়াহ্ (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু) উভয়ের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা চললে 'আলী (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু)-এর সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যে দলটি মুসলিমদের দল হতে বের হয়ে হারুরা নামক স্থানে আশ্রয় নেয় (এবং সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও হত্যাযজ্ঞ চালায়) তারাই খারিজী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে।[২]

খারিজী চিন্তার মানুষেরা যে সব ভ্রান্ত 'আক্বীদার কারণে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ড শুধু বৈধ নয় বরং তাদের অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে জীবন বাজি রেখে আনজাম দেয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয় নিম্নে তুলে ধরা হলো :

এক. কবীরা গুনাহ'য় লিপ্ত মুসলিম ব্যক্তিকে নির্দ্বিধায় কাফির বলে আখ্যায়িত করা এবং তার জান-মাল সবকিছুতে কাফিরের হুকুম জারি করা।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন :

"খারিজীরাই মুসলমানদেরকে সর্বপ্রথম কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা কবীরা গুনাহ'য় লিপ্ত হলে কাফির বলে, অনুরূপ যারা তাদের অন্যায়ের বিরোধিতা করে তাদেরকেও কাফির বলে এবং তাদের জান-মালে হস্তক্ষেপ করা হালাল মনে করে"।[৩]

---

১. আল খাওয়ারেজ, পৃ. ২২

২. মাজমূ ফাতাওয়া ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্, পৃ.১৩/৩২

৩. মাজমু ফাতাওয়া ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্, পৃ.৩/২৭৯

দুই. যারা তাদের মতবাদ সমর্থন করে না, খারিজীদের ভাষায় তারাও কাফির। তাদের মতবাদই যেন শরীয়তের সীমারেখা, কুরআন সুন্নাহ নয়! এর চেয়ে ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ আর কি হতে পারে। নিশ্চয়ই তারা কেবল প্রবৃত্তিরই অনুসারী। তাদের এ ভ্রান্ত মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শীর্ষ সালাফী 'আলেম আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) "ফিত্নাতুত্ তাকফীর" (অন্যকে কাফির বলার ফিতনা) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। কুরআন-সুন্নাহর অগণিত দলীল ও বাস্তব যুক্তি দিয়ে খারিজীদের ভ্রান্ত মতবাদের অসারতা প্রমাণ করেন এবং মুসলিম উম্মাহকে এ বিষয়ে সজাগ ও সর্তক করেন।

তিন. শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। খুলাফায়ে রাশেদার যুগে যেমন খারিজীরা 'উসমান (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু) ও 'আলী (রযিয়াল্লাহু 'আন্হু)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং তাঁদের দু'জনকেই হত্যা করেছিল, সেই 'আক্বীদাহ্ ও চেতনায় আজও তারা বিশ্বাসী। শাসক মুসলিম হোক আর না হোক, তাদের সমর্থনে না হলে বিদ্রোহ ঘোষণা করাই তাদের প্রধান কাজ। পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এমন বিদ্রোহ ঘোষণা কখনও বৈধ নয়। কারণ এতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "শাসকের প্রতিবাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করা সকল অকল্যাণ ও ফিতনার মূল, যা কখনও শেষ হওয়ার নয়"।[১]

আহ্লে সুন্নাহ তথা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারীদের এটাই 'আকীদাহ বিশ্বাস যে, অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে শাসকের বিদ্রোহ ঘোষণা করা, বিশেষ করে যাতে রক্তপাত ঘটে ও অশান্তি সৃষ্টি হয় তা কখনও বৈধ নয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী স্কলার, সালাফী বা আহ্লে হাদীস 'আলেম আল্লামা 'আবদুল 'আযীয বিন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি), আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)-সহ সাউদী আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া বোর্ডের এটাই ফাতাওয়া। (বিস্তারিত দ্র. আল মুযাহারাত ফি আশ-শরীয়াহ আল ইসলামিয়্যাহ, শায়খ 'আবদুর রহমান আশ-শাসরী)

চার. মুসলমানদের দল হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং যারা তাদের সমর্থন করে না তাদেরকে কাফির মনে করে তাদের আবাসস্থলকে কুফ্রী অঞ্চল ঘোষণা দিয়ে তাদের জান-মাল হালাল মনে করে লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করা। তাদের এ 'আক্বীদাহ্ ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না।

---

১. ইলামুল মুআক্কিয়ীন: পৃ. ৩/৪

পাঁচ. কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ করা। যেমন- শুধু শাস্তির আয়াত নিয়ে গবেষণা করা আর সুসংবাদ ও শান্তির আয়াতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। অথবা সুসংবাদ ও শান্তির আয়াতগুলো মন মতো ব্যাখ্যা করা। অনুরূপ অমুসলিমদের ক্ষেত্রে নাযিল হওয়া আয়াতসমূহ মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা। যেমন- সে যুগের খারিজীদের ক্ষেত্রে সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রযিয়াল্লাহু 'আন্‌হু) বলেছিলেন, "তারা কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হওয়া আয়াতগুলো মু'মিনদের ব্যাপারে প্রয়োগ করে"।[১]

ছয়. ইসলামী পরিভাষাগুলো নিজেদের মনগড়া চিন্তা-চেতনার আলোকে ব্যবহার করা। যেমন "জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ" নাম দিয়ে সন্ত্রাসী কাজ করা, "গণিমত বা ফাই" নাম দিয়ে সম্পদ লুণ্ঠন করা, "অন্যায়ের প্রতিবাদ" নাম দিয়ে বিদ্রোহ করা ইত্যাদি। এগুলো বেশিরভাগই ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের কারণেই হয়ে থাকে। অতএব এ ক্ষেত্রে সঠিক ইসলামী 'আক্বীদাহ্ না থাকাই সমস্যার কারণ।

সাত. ইসলামী বিধান কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিকভাবে না বুঝে প্রবৃত্তি ও ব্যক্তি চিন্তার আলোকে বুঝা। এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। খারিজী এবং সালাফী বা আহ্‌লে হাদীসদের মাঝে এটি একটি বড় ধরণের পার্থক্য। কারণ ইসলামের বিধানগুলো ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী বুঝতে চাইলে ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক; এজন্য খারিজী এবং যারা তাদের নীতিতে বিশ্বাসী তারা সকলে এ সমস্যায় নিমজ্জিত। পক্ষান্তরে সালাফী বা আহ্‌লে হাদীসদের নীতি হলো, ইসলামের বিধানগুলো কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ যেভাবে বুঝেছেন সেই বুঝটি গ্রহণ করা। যখন কেউ এভাবে বুঝার চেষ্টা করবে, তখন ইসলামী বিধানে বুঝের ভিন্নতা আসবে না, ফলে কোন সমস্যাও সৃষ্টি হবে না।

আশা করি বিজ্ঞ পাঠকের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। প্রকৃত বা খাঁটি মুসলিম কখনও ইসলামের নামে দেশে-বিদেশে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারে না। বিকৃত চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিই এমন কাজ করতে পারে। আর এর পিছনের বড় সমস্যা হলো 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের ত্রুটি।

---

১. সহীহ আল-বুখারী, আল-খাওয়ারীজ, পৃ. ২৭

অতএব এ সমস্য সমূলে ধ্বংস করতে হলে ইসলামের নামে ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসীদের সংশোধন করতে হবে, নচেৎ একদিকে বন্ধ করলেও অপরদিকে নতুনভাবে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এজন্য প্রয়োজন নতুন প্রজন্মকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক ইসলামী শিক্ষা দেয়া, জ্ঞান দেয়া এবং সঠিক ইসলামী 'আক্বীদায় গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ 'আলেমদেরও বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের কর্তব্য সাধারণ মুসলমানদের মাঝে ইসলামের সঠিক রূপ তুলে ধরা, সঠিক 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসের প্রচার-প্রসার ঘটানো এবং বক্তব্য ও লেখনিতে ভুল-ভ্রান্তি গুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক বিষয়টি উপস্থাপন করা। যাতে মানুষ ভুল থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং ইসলাম কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামকে গ্রহণ করতে পারে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে দেশের কল্যাণে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন –আমীন।

ইসলামী চিন্তাধারায় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ

الإرهاب والترويع من أضواء الفكر الإسلامي

ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক

ভূমিকা

সম্প্রতি বাংলাদেশসহ বিশ্বের কতিপয় দেশে জঙ্গিবাদ একটি বার্নিং ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কারণেই এই নব্য জঙ্গিবাদের উত্থান। এতে কলঙ্কিত হচ্ছে সত্যিকার ইসলামপন্থি ও ইসলাম প্রচারকগণ। ব্যহত হচ্ছে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম। তাদেরকে দিয়ে জঙ্গিবাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে, এ সকল মুসলিম বুঝে হোক না বুঝে হোক তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে। অথচ এদের অনুধাবন করা উচিত ছিল ইসলাম কখনো বোমাবাজি, হত্যা, গুপ্তহত্যা, আত্মঘাতী হামলাসহ কোন ধরনের অরাজকতা সমর্থন করে না।

জঙ্গিবাদের সংজ্ঞা

জঙ্গি, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদী শব্দগুলোর মূল হল জঙ্গ। এটি (جنگ- ج ن گ) ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দ। পাকিস্তানের বহুল প্রচারিত ও প্রসিদ্ধ একটি পত্রিকার নাম দৈনিক জঙ্গ। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, তুমুল কলহ, লড়াই, প্রচণ্ড ঝগড়া।[১] জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা। সেভাবে জঙ্গিবাদ অর্থ জঙ্গিদের মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ড। ইংরেজীতে বলা হয় Militant, Militancy কিংবা Military activities.[2] জঙ্গিবাদ যেহেতু নতুন শব্দ তাই এর আরবী প্রতিশব্দ আরবী অভিধানসমূহে পরিলক্ষিত হয় না। তবে এর কাছাকাছি যে শব্দটির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই তা হল (الإرهاب) অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা, ভীতি প্রদর্শন করা।[৩] পারিভাষিক অর্থে ধর্মীয় কারণে রাজনৈতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে চোরা গোপ্তা হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, হত্যা করা, আত্মঘাতী হামলা কিংবা কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে জঙ্গিবাদ বলে।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ ত্রাস শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ হল ভয়, ভীতি, শঙ্কা।[৪] সন্ত্রাস হল আতঙ্কগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।[৫] আর সন্ত্রাসবাদ

---

১. আহমদ শরীফ সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২১৬
২. মোহাম্মদ আলী ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা-ইংরেজী অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২১৬
৩. আল-কামূসুল আসরী, ইলিয়াস আনতুন ইলিয়াস, দারুল জাইল, বৈরূত, পৃ. ২৬৫
৪. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃ. ২৬৬
৫. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ২২তম মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ. ৬৬১

হল, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান নীতি।[১] যার ইংরেজী হল Terrorism এর অর্থ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে:

"The systematic use of violance to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective."[২]

অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কোন জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রণালীবদ্ধ সহিংসতার মাধ্যমে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা যে জিনিসটি উপলব্ধি করেছি তা হল সাধারণত অন্যায়ভাবে যে কোন ভীতি প্রদর্শন, ক্ষতি-সাধন, হুমকি সৃষ্টি ইত্যাদি অপরাধমূলক আচরণকে সন্ত্রাস বলে, এটা ধর্মীয় কারণে হতে পারে অথবা অন্য কোন কারণে হতে পারে। অন্যদিকে শুধু ধর্মীয় কারণে ন্যায় হোক অন্যায় হোক উপরোল্লিখিত কর্মকাণ্ডকে জঙ্গিবাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদের উত্থান

সিফফিনের যুদ্ধের পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অনুসারীদের একদল লোক তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে মানুষের বিচার মানতে অস্বীকার করে। ইতিহাসে এ দল 'খারিজী' নামে পরিচিত। তারা আওয়াজ তোলে ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ "আল্লাহর আইন ছাড়া অন্য আইন নেই"।[৩] তারা আরো দাবী করে যে, একমাত্র আল্লাহর আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু চলবে না। তারা বলে, আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। প্রথমে তারা মাদায়েন শহর অবরোধের চেষ্টা করে। এ চেষ্টা ব্যর্থ হলে তারা নাহরাওয়ান নামক স্থানে সমবেত হয় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যুদ্ধ করতে। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০০০। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে বুঝালেন অস্ত্র সংবরণ করতে। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায় ১৮০০ খারিজী কিছুতেই আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অস্ত্র সংবরণ করতে রাজী হলো না। ৬৫৯ খৃস্টাব্দে তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়। যাকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধ বলা হয়। কিন্তু তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

---

১. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃ. ৫৪১
২. The New Encyclopaedia Britannica, USA-2002, Vol. II, p. 650
৩. সূরা ইউসুফ: ৪০ ও ৬৭

নাহরাওয়ান যুদ্ধের পর খারিজীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিজেদের মতবাদ প্রচার করতে থাকে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিরুদ্ধে তারা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। এই খারিজীরা পরবর্তিতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মসজিদে হত্যার পরিকল্পনা করে। শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু সেদিন মসজিদে আসেন নি, তাই তাঁর জীবন রক্ষা পেল। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বেঁচে যান, তবে তিনি সামান্য আঘাত পান। অন্যদিকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে নামায পড়তে যাওয়ার সময় আততায়ী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম খারিজীর তরবারির আঘাতে ১৭ই রমাদান ৪০ হিজরী তারিখে শাহাদাত বরণ করেন। এদের পথ ধরে জঙ্গিবাদ, ইসলামের নামে গুপ্ত হত্যা শুরু হয়। এই খারিজীদের সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা হলো, এদের প্রায় সকলেই ছিলো যুবক, অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান, সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় করতো। সারাদিন যিকর ও কুরআন পাঠে রত থাকতো। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে শুধু কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজই শুনা যেত। কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা আল্লাহর ভয়ে ও আবেগে কাঁদতে কাঁদতে বেহুশ হয়ে যেত। এজন্য তাদেরকে কুররা বা কুরআন পাঠকারী দল বলে অভিহিত করা হতো। পাশাপাশি এরা অত্যন্ত হিংস্র ও সন্ত্রাসী ছিল। অনেক নিরপরাধ মুসলিম তাদের হাতে প্রাণ হারায়।[১] এরা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। এমন ব্যক্তিদেরকে গুপ্ত হত্যা করা বৈধ। শুধু তাই নয় যারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাফির মনে করতো না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা, পুরুষ, নারী ও শিশুদেরও এরা হত্যা করত। ইসলামের ইতিহাসে আরেকটি সংগঠনের অস্তিত্ব দেখা যায় যারা খারিজী ফিরকার মত ভিন্নমতালম্বীদের গুপ্ত হত্যা করত, ভয়-ভীতি প্রদর্শন করত, নিজেদেরকে সত্যিকার মুসলিম মনে করত, এদেরকে 'বাতেনী হাশাশীন'[২] নামে অভিহিত করা হত।

---

১. ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, আস্ সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ, আগস্ট, ২০০৬, পৃ. ১৭২-১৭৩

২. এরা হলো ইসমাঈলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম মুনতাসির বিল্লাহ-এর জেষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলিফা হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানীর অনুসারী। এরা প্রচার করে যে, মানবীয় জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেক দিয়ে আল-কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। আল-কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে ইমামের মতামতের উপরই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুকায়িত আছেন। তার প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে হতে একদল আত্মঘাতী ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দেশটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে বিশ্বে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। ধর্মপ্রীতি এদেশের ঐতিহ্য। আমাদের সমাজ কাঠামোর ভেতর কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য এদেশে কোন ব্যবস্থা নিতে হয় না। কিন্তু একটি কুচক্রিমহল বাংলাদেশের এ ঐতিহ্যকে মোটেই সহ্য করতে পারছে না। তাই তারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ধারা বিনষ্ট করে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাস কবলিত মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপের অজুহাত সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। শুধু তাই নয় এ সকল জঘন্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ইসলামের নাম ব্যবহার করে তারা ইসলামের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালায়। মূলতঃ তখন থেকেই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান হয়। যদিও এসকল বোমা হামলা ও বোমা বিস্ফোরণ ইসলামের নাম ব্যবহার করে কিছু বিপথগামী মুসলিম ঘটিয়েছে, কিন্তু এসবের পিছনে কয়েকটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার হাত রয়েছে।

জঙ্গিবাদ বিড়ম্বনা ও জঙ্গিফোবিয়া

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে জঙ্গিবাদ একটি যন্ত্রণাদায়ক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসের ন্যায় জঙ্গিবাদের সর্বসম্মত সংজ্ঞা এখনো নিরূপিত হয়নি। যত তাড়াতাড়ি এই শব্দদ্বয়ের সংজ্ঞা নিরূপণ করা যাবে বিশ্বের জন্য ততই মঙ্গল হবে। কোনটি জঙ্গিবাদ আর কোনটি জঙ্গিবাদ নয় এ নিয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখা যায় কেউ অস্ত্রধারণ করে নিজেকে রক্ষার জন্য, স্বাধিকার আদায়ের জন্য, কারো কাছে এটি জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ, আবার কারো কাছে এটি দাবী আদায়ের পন্থা কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রাম। বর্তমানে ইসলাম বিরোধী শক্তি বিশেষ করে পশ্চিমারা ইসলামকে জঙ্গিবাদের সমর্থক হিসেবে প্রচার করে চলেছে।[২] অনুরূপভাবে দেশীয় মুসলিম বিদ্বেষী গোষ্ঠী পশ্চিমাদের ন্যায় জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে ইসলাম ও মুসলিমদের

নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহননসহ যে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত থাকত। ইমাম যাকেই শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। হাসানের মৃত্যুর পরও এরা তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখে, তৎকালীন মুসলিম শাসকগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ.) হালাকু খাঁর বাহিনী এদেরকে নির্মূল করে। (ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ. ২৮)।

১. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ১১.৪.০৯, পৃ. ১৬

স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা নিজেদের ব্যর্থতা আর বিদেশী প্রভুদের স্বার্থ হাসিলের গভীর চক্রান্ত আড়াল করতে জাতিকে জঙ্গিবাদের জুজুর ভয় দেখাচ্ছে। তারা দেশের ভিতরে গৃহযুদ্ধের পাঁয়তারা করছে। জঙ্গি জঙ্গি করে মানুষের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। বিদেশীরা এ জঙ্গিবাদের জিগির তুলে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দিতে চায়। তারা এদেশকে আফগানিস্তান বা ইরাক কিংবা পাকিস্তানের মত অস্থির দেশে পরিণত করতে চায়। সেই উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের দেশের মিডিয়াগুলো পশ্চিমা মিডিয়াগুলোর অন্ধানুকরণে ইসলাম ও জঙ্গিবাদকে একাকার করে ফেলেছে। মাদ্‌রাসাগুলোকে জঙ্গি উৎপাদনের কেন্দ্র বলা হচ্ছে। অথচ সন্ত্রাস বোমাবাজি ও খুনখারাবির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকলেও তাকে জঙ্গিবাদ বলা হচ্ছে না। যদি মাদ্‌রাসা, ইয়াতিমখানায় অস্ত্র পাওয়া গেলে জঙ্গিপনা হয় তাহলে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের মত সাধারণ ও উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্ত্র-সস্ত্র পাওয়া গেলে তা জঙ্গিপনা হবে না কেন? এসব বিষয়ে জাতি আজ বিভ্রান্তিতে রয়েছে। এগুলোর সমাধান হওয়া উচিত।

জঙ্গিবাদ বনাম জিহাদ

মুসলিম জঙ্গিবাদী বিপথগামীরা সাধারণত তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামের পবিত্র পরিভাষা জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তারা জিহাদের নামেই তাদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে কিতালের প্রসঙ্গ তুলে ধরছে। অথচ এই জিহাদ ও কিতাল বৈধ কোন কর্তৃপক্ষ ছাড়া অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সরকার ছাড়া কেউ ঘোষণা দিতে পারে না। এ বিষয় আলোচনা করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে জিহাদ ও কিতালের তাৎপর্য বুঝতে হবে।

জিহাদের মূল শব্দ হলো (جُهْدٌ) জুহদুন। যার শাব্দিক অর্থ চেষ্টা করা, প্রচেষ্টা চালানো।[১] পারিভাষিক অর্থ হলো চূড়ান্ত বা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। আর ইসলামীক পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্‌হে জিহাদ বলতে মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়।[২] জিহাদ একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। আল-কুরআন ও আল-হাদীসে জিহাদকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ তুলে ধরা হলো। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

---

১. জুবরান মাসউদ, আর-রায়িদ, দারুল ইলমি লিলমালায়ীন, বৈরূত, লেবানন, ৩য় প্রকাশ, ১৯৭৮, খ. ১, পৃ. ৫৩১

২. ড. খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, পৃ. ৩৪

﴿وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্যে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত।"[১]

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : এখানে "হাক্কা জিহাদিহি" অর্থ হল- "জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় কর এবং তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত কর না"। যাহ্‌কাক ও মুকাতিল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : "আল্লাহর জন্য কাজ কর যেমন করা উচিত। এবং আল্লাহর ইবাদাত কর যেমন করা উচিত"। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন : "এখানে জিহাদ বলতে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে কাজ করাকে বুঝানো হয়েছে"।[২]

জিহাদের আরেকটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে قِتَالٌ (কিতাল)। কিতাল অর্থ পরস্পর যুদ্ধ করা, লড়াই করা।[৩] আল-কুরআন ও আল-হাদীসে বিভিন্ন জায়গায় কিতালের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৪]

অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾

"আর তোমরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে।"[৫]

উপরোক্ত আলোচনায় জিহাদ শব্দটি যে ব্যাপক অর্থবোধক তা আমাদের সামনে স্পষ্ট। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে এটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

১. সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮

২. ড. মোঃ ময়নুল হক, সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদ ও এর প্রতিকার : ইসলামী দৃষ্টিকোণ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা; জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৩

৩. জুবরান মাসউদ, আর-রায়িদ, খ. ১, পৃ. ১১৩৫

৪. সূরা আল-বাকারাহ্: ১৯০

৫. সূরা আত-তাওবাহ: ৩৬

বস্তুতঃ জিহাদের কাজ শুরু হয় মানুষের ব্যক্তি জীবনের আত্মশুদ্ধির প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তারপর নিজের আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোর মাধ্যমে। এটি একটি নিয়মতান্ত্রিক অব্যাহত প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়া। সর্বশেষ প্রয়োজনে যুদ্ধের মাধ্যমে জিহাদের অর্থ প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর সেটি হবে সামনা সামনি যুদ্ধ যা কিতাল এবং তা হবে রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের আদেশে এবং তাঁর নেতৃত্বে। সেজন্য ইসলাম জিহাদ ও কিতালের ক্ষেত্রে অনেক শর্ত আরোপ করেছে। যার অন্যতম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। রাষ্ট্রের প্রধান বা নেতাই জিহাদের বা কিতালের ঘোষণা দিতে পারেন।

রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালিত যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কোথাও কোন নিষ্ঠাবান মুসলিম ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে কাউকে গুপ্ত হত্যা করেছে, আত্মহত্যার মাধ্যমে মানুষ হত্যা করেছে, কারো বাড়িতে অগ্নি সংযোগ করেছে, কোন জনপদে বোমাবাজি ও অরাজকতা করে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, ইত্যাদির কোন নজির দেখা যায় না। সুতরাং জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডকে জিহাদের নামে চালিয়ে দেয়া মোটেও বৈধ নয়। আল-কুরআনে জিহাদ ও তৎসম্পর্কিত শব্দ ৩৬ বার এসেছে এবং প্রতিবারই ন্যায়নীতির সংগ্রামের কথা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে জঙ্গিবাদ হলো অন্যায়ভাবে মানুষদেরকে আক্রমণ করা, তাদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করা এবং নিরীহ লোকজনকে হত্যা করা ইত্যাদি।

ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ

বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে জঙ্গিবাদের যে উত্থান ও তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়, তার সাথে শুধু গুটিকয়েক মুসলিম জড়িত। বিশ্বের সকল বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ এবং মূলধারার সকল ইসলামী সঙ্গান ও সংস্থা এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, এ ধরনের ব্যক্তিরা বিভ্রান্ত, বিপথগামী। এরা ইসলামের শত্রুদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। ইসলামের শত্রুরা এদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। ওরা এদেরকে ইসলামের ভাব-মর্যাদা ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করছে। এসকল ব্যক্তি কোনভাবেই ইসলামের জন্য কল্যাণকর হতে পারেনা। তারা ইসলামকে বিশ্ববাসীর সামনে বিকৃত ও কুৎসিতভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চায়। জঙ্গিবাদীরা সাধারণত সে সকল জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- (ক) বোমাবাজি করে অরাজকতা সৃষ্টি করা, (খ) মানুষ হত্যা ও (গ) আত্মঘাতী হামলা।

বোমাবাজি ও অরাজকতা সৃষ্টি করা

জঙ্গিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বিভিন্ন ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে থাকে, তার মধ্যে একটি হল বোমাবাজি করে অরাজকতা সৃষ্টি করা, সমাজে

বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ করা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা। পবিত্র কুরআনে এগুলোকে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' শব্দদ্বয় দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। ফিতনা-ফাসাদ মহান আল্লাহর কাছে অতীব ঘৃণিত একটি মহাপাপ, কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সমস্ত কাজকে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলোর জন্যে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

"পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না"।[১]

﴿وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ তথা দাঙ্গা হাঙ্গামা করে বেড়িও না"।[২]

﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়িও না"।[৩]

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

"তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ, বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না"।[৪]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারী, দুষ্কর্মীদের কর্ম সার্থক করেন না"।[৫]

মহান আল্লাহ ফিতনা সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

---

১. সূরা আল-আ'রাফ: ৫৬, ৮৫

২. সূরা আল-বাকারাহ্: ৬০, সূরা হুদ: ৮৫, সূরা আশ-শু'আরা: ১৮৩, সূরা আল--'আনকাবুত: ৩৬

৩. সূরা আল-আ'রাফ: ৭৪

৪. সূরা আল্-কাসাস: ৭৭

৫. সূরা ইউনুস: ৮১

"আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা মানব হত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ"।[১]

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾

"আর ফিতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ"।[২]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে ফিতনা-ফাসাদ তথা অরাজকতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বিশৃঙ্খলা, বোমাবাজি করে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ফিতনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা জঙ্গীবাদকে হত্যার চেয়েও কঠিন ও গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের অপরাধ হত্যার সমতুল্য।

অন্যায়ভাবে হত্যাকাণ্ড

জঙ্গিবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আরেকটি জঘন্য অপরাধ করে থাকে তা হলো মানব হত্যা। এটা বিভিন্নভাবে করে থাকে, গুপ্তভাবে, পিছন থেকে, বোমা মেরে কিংবা বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র দিয়ে। অথচ মানবজীবন মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র। সেজন্য মহান আল্লাহ একজন মানবের জীবন সংহারকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হত্যার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছেন। মানবজীবনের নিরাপত্তার প্রতি ইসলাম যতটা গুরুত্ব দিয়েছে অন্য কোন ধর্মে বা মতাদর্শে এর নযির নেই। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا﴾

"এ কারণে আমি বনী ইসরাইলকে এরূপ লিখে দিয়ে ছিলাম যে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করা ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করলো আর যে ব্যক্তি কোন একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করলো"।[৩]

যে ব্যক্তি সঙ্গত কারণ ছাড়া একজন মানুষকে হত্যা করে সে কেবল একজন মানুষকেই হত্যা করে না, বরং সে সমগ্র মানবতাকে হত্যা করে। মহান আল্লাহ ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া মানব হত্যা নিষিদ্ধ সম্পর্কে আরো ঘোষণা করেন :

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্: ২১৭
২. সূরা আল-বাকারাহ্: ১৯১
৩. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيْمًا﴾

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানেই সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তার উপর অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন"।[১]

নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো, যা সুস্পষ্টভাবে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া মানব হত্যাকে সম্পূর্ণ নিষেধ করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষণা করেন :

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"হে লোক সকল! তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর উপর তোমাদের হস্তক্ষেপ হারাম করা হলো, তোমাদের আজকের এই দিন, এই (যিলহজ্জ) মাস এবং এই (মক্কা) নগরী যেমন পবিত্র ও সম্মানিত, অনুরূপভাবে উপরোক্ত জিনিসগুলোও সম্মানিত ও পবিত্র।"[২৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

"তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাক। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী কী? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়াতের বিধিবর্হিভূত কোন অবৈধ হত্যাকাণ্ড ঘটানো, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানো এবং সরলমতি সতী মু'মিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।"[৩]

---

১. সূরা আন্-নিসা: ৯৩
২. সহীহ মুসলিম: ৩০০৯
৩. সহীহ মুসলিম: ২৭২

তিনি আরোও বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا

"যার হাতে আমার জীবন, তাঁর কসম করে বলছি : আল্লাহর নিকট (বিনা অপরাধে) কোন মু'মিনের হত্যাকাণ্ড সমগ্র পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ঘটনা।"[১]

জঙ্গিবাদ দমনে করণীয়

আমরা মনে করি জঙ্গিবাদ কোন বড় ধরনের সমস্যা নয়। গুটি কয়েক ব্যক্তি এর সাথে জড়িত। এরা অসংগঠিত ও অপরিকল্পিত। যদি সদিচ্ছার সাথে কিছু সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেয়া যায় তাহলে এ সমস্যাটি সহজে দূর করা যাবে বলে বিশ্বাস করি, নিম্নে এ লক্ষ্যে কিছু প্রস্তাব পেশ করা হলো।

১. যে সকল মুসলিম দেশে জঙ্গিবাদ সমস্যা দেখা দিয়েছে তাদের শাসকদের বুঝতে হবে এবং জঙ্গিবাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করতে হবে।

২. পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, এই জঙ্গিবাদের সাথে গুটি কয়েক বিভ্রান্ত মুসলিম জড়িত। এদেরকে হিদায়াতের জন্য আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের সম্পৃক্ত করতে হবে। অর্থাৎ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে যে, জঙ্গিবাদ কোনক্রমেই ইসলামের পথ নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে জাহান্নামের পথ।

৩. যেহেতু জঙ্গিবাদের সাথে সত্যিকার ইসলামপন্থিরা জড়িত নয়, তাই জঙ্গিবাদ দমনের জন্য মূলধারার ইসলামী শক্তি, ইসলামী দলগুলোর সহযোগিতা নিতে হবে, এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

৪. দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের ইমাম খতিবদের সহযোগিতা নিতে হবে, তারা যেন জুমার খুতবায় ও অন্যান্য সময়ে মসজিদগুলোতে জঙ্গিবাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদেরকে অবহিত করতে পারেন।

৫. মূলধারার ইসলামী শক্তি ও দলগুলোকে রাজনৈতিকভাবে কোনঠাসা করার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শ, মাদ্‌রাসা-মক্তবকে ঢালাওভাবে জঙ্গি আখড়া, জঙ্গি প্রজনন কেন্দ্র, তালেবান দুর্গ, মৌলবাদী অভয়ারণ্য বলার মত উসকানিমূলক বক্তব্য বন্ধ করতে হবে।

---

১. সুনান নাসাঈ: ৩৯৯৭

৬. জনগণকে সাথে নিয়ে এই জঙ্গিবাদ দমন করতে হবে। তাই জনগণের বিশ্বাস, ধর্ম-বিশ্বাস, তাদের লালিত মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে সম্মান করতে হবে। এ সবের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসকদেরকে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কোনক্রমে ইয়াহুদীবাদ, খৃস্টবাদ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। সে লক্ষ্যে এদের পরিবর্তে মুসলিম বিশ্ব ও সত্যিকার ইসলামপন্থিদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

৮. ব্যক্তিগতভাবে আলিম-ওলামা, পীর-মাশায়েখরা জঙ্গীবাদ দমনে এগিয়ে আসতে পারেন। তাঁরা আলাপ-আলোচনা, ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে এর ক্ষতিকর ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সর্ব সাধারণকে সতর্ক করতে পারেন।

৯. তদরূপ বিভিন্ন ইসলামী ও অ-ইসলামী দল সংস্থা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে এর ভয়াবহতা ও অনিষ্টকর দিকগুলো সম্পর্কে জন-সাধারণকে অভিহিত করতে পারেন।

উপসংহার

আমরা সকলে জানি, ইসলাম অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা ও মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন মানবকুলের শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও উন্নতির জন্য মনোনিত করেছেন ইসলাম ধর্মকে। অতএব একজন মুসলিম অপর মুসলিমের অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে না। তাইতো একজন আরেক জনের সাথে দেখা হতেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সম্বোধন করে। যার অর্থ 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' তাহলে কিভাবে সে অন্যকে অশান্তিতে ফেলে দেবে? অন্যের নিরাপত্তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে? সুতরাং ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই। বিশ্বের এমনকি বাংলাদেশেরও কোন প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত ইসলামী দল বা প্রতিষ্ঠান কোন ধরনের জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নেই। শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় হাজার বছর অপেক্ষা করতে হলেও তা করা উচিত। জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতা দিয়ে একে তো দ্রুত ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, আর করা গেলেও তার কোন শুভ ফল আশা করা যায় না। এ কথা সর্বমহলে স্বীকৃত যে, ইসলাম তার অন্তর্নিহিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তরবারি, জঙ্গিবাদ কিংবা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়। তবে নতুন গজিয়ে ওঠা কিছু গ্রুপ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন দিচ্ছে। তারা জিহাদের নামে

ইসলামের নামে বিভিন্ন অরাজকতামূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত করছে। অথচ এগুলোর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, যা আমরা ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝতে পেরেছি। ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণ হারাম। বোমাবাজি, মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও আত্মঘাতী তৎপরতা ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা এগুলো করছে তারা বিভ্রান্ত, ইসলাম বিরোধীদের ক্রীড়নক। এদের চিহ্নিত করে প্রতিহত করা প্রয়োজন।

(এ প্রবন্ধটি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার-এর সেমিনার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "সেমিনার প্রবন্ধ সংকলন ২০০৯"-এর অন্তর্ভুক্ত "ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত, সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত।)

জিহাদ বনাম সন্ত্রাসঃ একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ

الجهاد والإرهاب وجها بوجه : دراسة تحقيقية

ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

অনুবাদক, রাজকীয় সাউদী দূতাবাস, ঢাকা ও

সাবেক বিভাগীয় প্রধান

দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

ভূমিকা

সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সাম্প্রতিকালে শুধুমাত্র বৈশ্বিক সমস্যাই নয়; বরং তা বর্তমান শতাব্দীর সর্বাধিক আলোচিত ইস্যু। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও উন্নয়নের এ মহা উৎকর্ষকে পিছনে ফেলে সন্ত্রাস ইস্যুটি বর্তমানে হটকেকের ন্যায় বিশ্বব্যাপী খবরের মূল শিরোনাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। চলছে সন্ত্রাস কেন্দ্রিক পরস্পরের প্রতি অভিযোগের তীর নিক্ষেপ। যেমন চলছে সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করার প্রতিযোগিতা। সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীরা আজ মানবতাকে অক্টোপাসের মত চারদিক থেকে জাপটে ধরেছে।

জঙ্গিবাদের উত্থানের কারণ

ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এ নব্য জঙ্গিবাদের উত্থান। ইসলামের বিশ্বব্যাপী উত্থানকে ব্যহত করতে ও ইসলামের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট, কলঙ্কিত এবং বিতর্কিত করতে জঙ্গিবাদকে উস্কে দিচ্ছে। যেমন: ইসলামী দেশগুলোর আর্থসামাজিক উন্নতির পথ রোধ করতে এবং এসব মুসলিম দেশে তাদের সামরিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে তারা কিছু বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাবর্জিত কতিপয় মুসলিম যুবককে বেছে নিয়েছে। যাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন জঙ্গি কর্মকাণ্ড ঘটানো হচ্ছে। তারা বুঝে না বুঝে তাদের পাতানো ফাঁদে পা দিচ্ছে। অথচ এদের অনুধাবন করা উচিত ছিল যে, ইসলাম কখনও বোমাবাজি, হত্যা, গুপ্তহত্যা এবং আত্মঘাতী হামলা সহ কোন ধরনের অরাজকতা সমর্থন করেনা।

ইসলাম ও মুসলমানগণ বর্তমান বিশ্বে বিধর্মীদের পক্ষ থেকে তিন ধরনের হামলার শিকার হচ্ছে। প্রথমটি হচ্ছে যে, তারা সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হচ্ছে। তাদের বিভিন্ন জনপদগুলোর উপর বিমান আক্রমণ ও বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস ও তছনছ করে দেওয়া হচ্ছে। অসংখ্য জান ও মালের ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে তাদের প্রতি পরিকল্পিতভাবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক আক্রমণ যার মাধ্যমে তারা ইসলামের অসারতা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, এবং ইসলামের উপর বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে যাচ্ছে যেমন ইসলাম সেকেলে একটি ধর্ম এখানে প্রগ্রেসিভ বলতে কিছু নেই, ইসলাম সন্ত্রাসের ধর্ম এবং সেটা তরবারীর সাহায্যে বিস্তৃত হয়েছে। ইসলাম নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। ইসলামে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। মূলতঃ উক্ত সকল ধরনের আক্রমনে প্রতিহত করাই জিহাদ।

জিহাদের অর্থ

জিহাদ শব্দ যে ধাতু থেকে এসেছে তার অর্থ চেষ্টা, সাধনা, সংগ্রাম ও লড়াই এবং শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর পথে সমস্ত সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টাকে নিবেদিত করা এবং প্রয়োজনে আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত রাখার মহান লক্ষ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লড়াই করা।

জিহাদের হুকুম ও শর্ত

আল্লাহ তা'আলা ২য় হিজরীতে নিম্নে বর্ণিত আয়াতের মাধ্যমে মানবজাতির উপর জিহাদ ফরয করেন :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾

"তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো যদিও তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়"।[১]

তবে উক্ত ফরয ফরযে কিফায়াহ। অর্থাৎ সমস্ত মুসলিম মিল্লাতের উপর জিহাদ ফরয তবে কিছু সংখ্যক লোক তা পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ উক্ত ফরয আদায় না করে তবে গোটা উম্মাত গুনাহগার হবে। তবে নিম্নে বর্ণিত তিনটি অবস্থার সময় জিহাদ ফরযে আইন অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর জিহাদ ফরয হয়ে যায়।

১. কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত থাকে তবে তার প্রতি জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন যোদ্ধা-বাহিনীরূপে কাফিরদের সম্মুখীন হও, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না"।[২]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার"।[৩]

---

১. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২১৬

২. সূরা আল-আনফাল: ১৫

২. যখন শত্রু পক্ষ মুসলিমদের কোন শহরে ঢুকে পড়বে তখন উক্ত শহরবাসীর সকলের প্রতি জিহাদ ওয়াজিব বা ফরয হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

"হে মু'মিনগণ! যে সব কাফির তোমাদের নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, যাতে তারা তোমাদের মধ্যে দৃঢ়তা দেখতে পায়, আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন"।[২]

৩. যখন বাদশাহ অথবা সেনাপতি নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি জিহাদের ময়দানে তলব করবেন তখন উক্ত ব্যক্তির উপর জিহাদে অংশ গ্রহণ ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহতা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের হয়েছে কী যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয় তখন তোমরা আরো জোরে মাটি কামড়ে ধর। তোমরা কি আখিরাতের স্থলে দুনিয়ার জীবনকেই বেশি পছন্দ কর? আখিরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী তো অতি সামান্য"।[৩]

তবে মুজাহিদকে অবশ্যই মুসলিম, বিবেক সম্পন্ন, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শারীরিক সক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।

জিহাদের স্তর সমূহ

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন : জিহাদের স্তর ৪টি ঃ

১. নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।
২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

---

১. সূরা আল-আনফাল: ৪৫
২. সূরা আত-তাওবাহ: ১২৩
৩. সূরা আত-তাওবাহ: ৩৮

৩. কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। (কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চারটি স্তর রয়েছে); ১। অন্তর দ্বারা ২। কথা দ্বারা ৩। অর্থ (মাল) দ্বারা এবং ৪। জীবন দ্বারা
৪. অত্যাচারী শাসক, ব্যক্তি, বিদ'আত ও ইসলাম বিরোধী কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।[১]

জিহাদের পদ্ধতি

একটি রাষ্ট্রের পুরো ভূখণ্ডে শুধুমাত্র রাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্বে অথবা তার সম্মতিতেই জিহাদ সংগঠিত হতে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে তাঁর আদেশ বা তাঁর সম্মতি ছাড়া কোন একটি যুদ্ধও সংগঠিত হয়নি। কোন একজন সাহাবী বিক্ষিপ্তভাবে জিহাদ করেছেন তার কোন প্রমাণ নাই। যুদ্ধ শুরুর আগে অবশ্যই প্রতিপক্ষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। যুদ্ধকালীন সময় কেউ যদি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দান করে তা নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। কোন বৃদ্ধ, নারী ও শিশুকে হত্যা করা যাবে না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের কর্মকাণ্ড

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পৃথিবীর যে কোন ভূখ অবৈধ ও গর্হিত কাজ। কিন্তু বাংলাদেশের মত ভূখণ্ড যেটা একটা মহা বিস্ময়কর। কেননা এখানে জিহাদ বা যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে? মুসলিম হয়ে মুসলিমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ? তাদের ঈমান, আক্বীদা ও আমলে কিছু ত্রুটি থাকতেই পারে সে জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের বিধান রাখা হয়েছে। যার মাধ্যমে তাদেরকে সীরাতে মুস্তাকীমের পথে আহ্বান করতে হবে। হিদায়াত প্রাপ্ত হলে আলহামদুলিল্লাহ। নইলে আপনার দায়িত্ব শেষ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

"রাসূলের উপর তো কেবল স্পষ্টভাবে পৌঁছানোর দায়িত্ব।"[২]

কাবীরা গোনাহ হত্যাযোগ্য অপরাধ নয়। এ ব্যাপারে তাওবার দরজা খোলা রয়েছে। কাজেই কাবীরা গোনাহের জন্য যারা মানুষ হত্যা বৈধ মনে করেন তারা কি এই আয়াতটি পড়েননি ?

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯-১০
২. সূরা আন-নূরঃ ৫৪

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম। যাতে স্থায়ীভাবে থাকবে, তার উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অভিসম্পাত। আল্লাহতার জন্য মহাশাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন"।[১]

আপনি হয়ত বলবেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোককে কাফির বলেছেন যারা ইসলামী শরীয়াত মুতাবেক বিচার কার্য করেনা। কিন্তু আল্লাহ তো আরও দু'টি আয়াতে তাদেরকে জালিম ও ফাসিকও বলেছেন। সুতরাং পার্থক্য বুঝতে হবে। আর তা হলো যারা অন্তর দিয়ে ইসলামকে ও ইসলামী আইনকে ঘৃণা করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য জানে ও করে আল্লাহ তাদেরকে কাফির বলেছেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশের বিচারপতিগণ ইসলামের প্রতি এ ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করেন না। আর তারা তো মূলতঃ বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার ব্যাপারে শপথ গ্রহণ করেছেন। এবং বাংলাদেশের সংবিধানের বাইরে যাওয়ার তাদের কোন সুযোগ নেই। সন্ত্রাস মুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে ইসলাম ন্যায়বিচারের উপর সবচাইতে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ তথা সাদাকালো, ধনী-দরিদ্রদের ভেদাভেদ স্বীকার করে না বরং সর্বক্ষেত্রে আইনের স্বীকৃতি দিয়েছে ও বিচার ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায়ের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে আল্লাহর পথে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাক, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটা উত্তেজিত না করে যে তোমরা ইনসাফ করা ত্যাগ করবে, সুবিচার কর, এটা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল"।[২]

---

১. সূরা আন-নিসা: ৯৩

২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৮

সন্ত্রাস দমনে কুর'আনের ভূমিকা

যে বিষয়টি নিয়ে বিশ্বমানবতা ভীত-সন্ত্রস্ত, গোটা বিশ্ব শঙ্কিত সেটা হচ্ছে সন্ত্রাস, সন্ত্রাস মানে ভয়, শঙ্কা, ভীতি ও হয়রানি ইত্যাদি। নানা রকম অত্যাচার অবিচার, হত্যা, ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাখার নামই সন্ত্রাস। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে।

সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব বিনির্মাণে ইসলামের অবদান বিশ্বে সর্বাধিক। নিচে তার কিছু নমুনা পেশ করা হল :

১। ইসলাম বিশ্ব মানবতার ধর্ম, মানবতা বিরোধী সন্ত্রাসকে ইসলাম কঠোরভাবে না বলেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

"দুনিয়ার শান্তি স্থাপনের পর তাতে বিপর্যয় ঘটাবেনা"।[১]

২। পৃথিবীর বুকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিহার ও উদ্ধতভাবে চলাফেরা হতে যারা নিজেদেরকে বিরত রেখেছে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

"এই হচ্ছে আখিরাতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা যমীনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য"।[২]

৩। দেশ ও সমাজে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ পরোপকারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বুকে বিপর্যয় (সন্ত্রাস) সৃষ্টি না করার জন্য বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

"(মানুষের) কল্যাণ সাধন কর, যেমন আল্লাহ তোমার কল্যাণ করেছেন, দেশে বিপর্যয় সৃষ্টির কামনা কর না, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না"।[৩]

---

১. সূরা আল-আ'রাফ: ৫৬
২. সূরা আল-কাসাস: ৮৩
৩. সূরা আল-কাসাস: ৭৭

ইসলাম ধর্ম গ্রহণে কোন জবরদস্তি নেই

কাউকে জোর পূর্বক মুসলিম বানানোর অনুমতি ইসলামে নেই। অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ও সহঅবস্থান সম্পর্কে আল কুর'আন:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ"।[১]

সুতরাং জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোন তুলনাই হতে পারেনা। যেমনভাবে তুলনা হতে পারেনা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদের সাথে। অথবা বিবাহ ও ব্যভিচারের সাথে। যারা জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে দেখাতে চান তারা হয় জ্ঞানপাপী অথবা ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও মুসলিমরা আজ ভয়াবহ তথ্য সন্ত্রাসের শিকার। বিশ্বের যে কোন স্থানে কোন ধরনের হামলা হলেই মুসলিমদের প্রতি আঙুল তোলা হয় এবং কিছু মিডিয়ায় মুসলিমদের বিশেষ করে মাদরাসা ছাত্রদের অভিযুক্ত করে প্রতিবেদন প্রচার করে। তাছাড়া কোথাও কোন মাদরাসা শিক্ষিত কেউ কোন অপরাধ বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে ধরা পড়লে সমস্ত মাদরাসা পড়ুয়াদের দায়ী করে ঢালাও বক্তব্য দেয়া হয়। অথচ এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে মাদরাসা ছাত্ররা জড়িত বলে যে অভিযোগ তোলা হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই সত্য বলে প্রমাণ হয় না। বরং সম্প্রতি গুলশান হামলায় অংশগ্রহণকারীরা প্রায় সবাই-ই ইংলিশ মিডিয়াম বা সাধারণ মাধ্যমে পড়াশুনা করা তরুণ। মূলত কোন মাধ্যমের পড়াশুনাই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে বলে না। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা তাতে জড়িত হয়। তাই মাদরাসা শিক্ষায় বা ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে ঢালাওভাবে জঙ্গি আখ্যায়িত করা বন্ধ করা উচিত। পূর্বে অনেকেই মাদরাসাকে জঙ্গিবাদের জন্মস্থান বলে তথ্যসন্ত্রাস চালাতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো তাদের ধারণা পাল্টে দিয়েছে।

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্: ২৫৬

সন্ত্রাস বন্ধে কিছু প্রস্তাবনা

বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দাবি রাখে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের অংশ হিসেবে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, বিশ্বের প্রবল শক্তিধর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বহুবিদ পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও কেন সন্ত্রাস রোধ করা যাচ্ছেনা তা নিয়ে ভাববার সময় এসে গেছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলতে হয় যে,

১। সন্ত্রাস নির্মূলে ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক বা একনিষ্ঠ হতে হবে।

২। সন্ত্রাস দিয়ে সন্ত্রাস নির্মূল হবেনা।

৩। নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী হিসেবে গণ্য করার হীন প্রয়াসে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান কষ্মিনকালেও সফল হবেনা।

৪। ইসলামের এ মহা অগ্রযাত্রা ও মহাজাগরণকে ব্যহত করার লক্ষ্যে ইসলামের ললাটে সন্ত্রাসের কালিমা লেপনের হীন লক্ষ্যে পরিচালিত সন্ত্রাস বিরোধি অভিযান কখনই সফলতার মুখ দেখবেনা।

৫। মুসলমানদের তেলের খনি তথা সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

৬। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর ও রোহিঙ্গা মুসলিমসহ মুসলমানদের যাবতীয় ইস্যু ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষতার সাথে সমাধান করতে হবে।

৭। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে ও বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের দমন-পীড়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান সফল হবেনা।

৮। রাষ্ট্রীয়ভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং যুবসমাজকে হতাশা থেকে রক্ষা করতে হবে।

৯। গণতন্ত্রকে সুসংহত ও শক্তিশালী করতে হবে।

১০। ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে সমর্থন করেনা- এ তথ্যটি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে এবং বুঝাতে হবে যে, সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ ও উগ্রতা এগুলো ইসলামী কর্মপদ্ধতি নয়।

১১। জিহাদ বিষয়ক অপপ্রচার ও সকল ধরনের তথ্যসন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

১২। প্রকৃত জঙ্গিদের শনাক্ত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে জঙ্গিবাদ দমনের নামে নিরীহ কোন মানুষকে হয়রানি করা যাবেনা।

১৩। সন্ত্রাসীরা কেন সন্ত্রাসী জীবন বেছে নিচ্ছে তার কারণ নির্ণয় ও তা প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবেই আশা করা যায় যে, বিশ্বব্যাপী আন্তঃধর্ম সম্প্রীতি বজায় হবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে চাই যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। আর এ শান্তি শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এবং সকল সৃষ্টি জগতের জন্য। সুতরাং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অপ্রপ্রচার বন্ধ করতে হবে। কেননা ইসলামই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম যা আপামর জনসাধারণকে উপহার দিতে পারে একটি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, জাতি ও বিশ্ব।

সন্ত্রাস দমনে সহযোগিতা করার দায়িত্ব গোটা জাতির

توحيد صفوف الأمة واجب لمكافحة الإرهاب

হাফেজ মাহমুদুল হাসান মাদানী

উপাধ্যক্ষ

জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, নরসিংদী

পৃথিবীর সকল মানুষের মূল পিতা মাতা হচ্ছে আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালাম। এ জন্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: "মানুষেরা আকৃতির দিক দিয়ে পরস্পর সামঞ্জস্যশীল, তাদের পিতা আদম আলাইহিস সালাম আর মাতা হাওয়া আলাইহিস সালাম। এদিক থেকে তারা এক ও অভিন্ন।" ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভৌগলিক অবস্থান, সামাজিক পার্থক্য, অর্থনৈতিক ভেদাভেদ থাকলেও সার্বজনীন মানবতা তাদেরকে একই সুতোয় গেঁথে রেখেছে। যে মহান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সৃষ্টিকূলের সর্বশ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছেন, তাঁর বিধান অনুযায়ী এবং প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে তাদের উচিৎ ছিল এ পৃথিবীতে তারা যতদিন বেঁচে থাকবে একে অন্যের প্রতি দয়া-মায়া স্নেহ, ভালোবাসা, উদারতা, নম্রতা, ভদ্রতা, করুণা প্রদর্শন করবে।

কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় এই যে, মানবতার চিরশত্রু শয়তানের প্ররোচণা, কুমন্ত্রনা, স্বীয়-প্রবৃত্তির অনুসরণ তাদেরকে আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, একে অন্যের প্রতি অবিচার, যুলুম, নির্যাতন, হত্যা, খুন-খারাবী, যোর যবরদস্তি, লুণ্ঠন, অরাজকতা, নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা, অন্যায়ভাবে ক্ষমতা লাভের অদম্য লালসা, অধিকার হরণ, নৈতিকতার দিক থেকে মিথ্যা, ধোকাবাজী, প্রতারণা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, ব্যভিচারসহ নানারকম জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়ে তারা এ পৃথিবীকে নরকতূল্য বানিয়ে ফেলেছে। ধর্মের নামে সহিংসতা, সাম্রাজ্য দখলের নামে অবলিলায় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাওয়া, সামান্য অযুহাতে ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও এর মত নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা আজ সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী সাধারণ একটি মামুলী কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অজ্ঞতা, মূর্খতা, নাস্তিকতা, ধর্মান্ধতা, ইসলামী অনুশাসন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা, স্বীয় মতকে অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতাই এর মূল কারণ। বিশ্বব্যাপী এ করুন দুর্দশার দাবানল থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও রক্ষা পায়নি। সম্প্রতি-গুলশান, কিশোরগঞ্জ সহ আরো কয়েকটি যায়গায় তথাকথিত জঙ্গীদের নিষ্ঠুর সন্ত্রাসী হামলা, অপরদিকে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে নিয়োজিত জোয়ানদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলশ্রুতিতে কতিপয় জঙ্গী-সন্ত্রাসীর ধরা পড়া একথা প্রমাণ করে। আজ-সময় এসেছে এ সন্ত্রাসকে সমূলে উৎপাটনের লক্ষ্যে গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। একজন মুসলিম ও দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে, স্বীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি থেকে এ বিষয়ে কিছু কথা তুলে ধরছি।

পৃথিবীতে প্রচলিত বিদ্যমান কোন ধর্মই নৃসংশতা, অরাজকতা বা সন্ত্রাসকে সমর্থন করেনি। মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য মনোনিত একমাত্র ধর্ম ইসলামে এর বিন্দুমাত্র স্থান নেই। মহাগ্রন্থ আল-কোরআন, প্রিয় নবীর অমিয়বাণী আল-হাদীস এবং প্রতিথযশা বিদগ্ধ মনীষীদের অমূল্যবাণী সমূহে তা চিরভাস্বর হয়ে আছে।

ধর্মের নামে, ইসলামের নামে, দাওয়াতের নামে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে বেছে নেয়, প্রকৃত ও পবিত্র ইসলাম এ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থিত। ইসলাম হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা ও ভলবাসার ধর্ম। সন্ত্রাসীরা যে দিকে আহ্বান করছে, ইসলামের বাণী ও কুরআনের দাওয়াতের সাথে তা পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক। সুতরাং এ সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মোকাবিলা করা এবং অঙ্কুরেই সমূলে একে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার কোন বিকল্প নেই। যাতে করে এরা শক্তি সঞ্চার করে জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে হুমকি হয়ে উঠতে না পারে।

আল্লাহর দিকে লোকদেরকে আহ্বানের ক্ষেত্রে তাদেরকে যথোপযুক্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি তথা প্রজ্ঞা, সুন্দর উপদেশ এবং কোমল কণ্ঠে সম্বোধনের লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন যে সুদৃঢ় কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে, প্রিয়নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র সুন্নাত অর্থাৎ তাঁর কথা, কাজ, সমর্থন এবং গুণাবলী সে কর্মপন্থার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বাস্তবায়নে সমৃদ্ধ হয়ে আছে। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ীকে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ "দ্বীন হচ্ছে সহজ"।[১]

ইসলাম সর্বদাই কঠোরতা ও সন্ত্রাসকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করে শান্তি, উদারতা এবং উত্তম উপদেশের দিকে আহ্বান করে। সুতরাং সন্ত্রাসী সংগঠনসমূহ ভিত্তিহীন দাবীর ছত্রছায়ায় ইসলামের নামে যেসকল ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, এতে করে তারা ইসলামের যে বদান্যতা, শান্তির প্রতি তার যে সুমহান আহ্বান, তা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। সত্যনিষ্ঠ এ দ্বীনের মধ্যে গোটা মানব কল্যাণ নিহিত আছে। এতে যে চরিত্র, বিধি-বিধান, নিয়মনীতি, আচার-আচরণ, মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক অথবা অমুসলিমদের সাথে তাদের সম্পর্কের মূলনীতির বিষয় বলা আছে, তা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রিয় নবীকে নির্দেশিত সঠিক কর্মপন্থার উপরই প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন :

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"হে নবী! আপনি আপনার মালিকের পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন। কখনো তর্কে যেতে হলে আপনি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তি তর্ক করুন, যা সবচাইতে উত্তম পন্থা। আপনার মালিক ভাল করেই জানেন কে তার পথ থেকে বিপদগামী হয়ে গেছে। আবার যে ব্যক্তি হেদায়েতের পথে রয়েছে তিনি তার সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত আছেন"।[২]

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৩৯
২. সূরা আন-নাহ্ল: ১২৫

বিভিন্ন কারণে দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ী সৃষ্টি হয় :

১) দ্বীনের ব্যাপারে না জেনে অতিরঞ্জিত করণ।

২) ইসলামের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অভাব।

৩) শরীয়তের মূল বক্তব্য এবং এর মহান উদ্দেশ্যগুলোকে যথাযথ অনুধাবন করতে না পারা। ফলে মূল বক্তব্যকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। কখনো এমন হয় যে, একটি বক্তব্য যে অর্থ প্রদান করে, সেটি বাকী বক্তব্য গুলোকে একত্রিত করার পর আর গ্রহণ করার সুযোগ থাকে না।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ইসলাম কখনো বাড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেয় না। প্রিয়নবীর জীবনে আমরা তার উজ্জ্বল নমুনা দেখতে পাই। যারা তার দাওয়াতকে প্রত্যাখান করেছে, তাঁর সাথে নির্মম আচরণ করেছে। তায়েফের ময়দানে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে, দুষ্ট নিষ্ঠুর কতিপয় বখাটে যুবককে তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে, তাঁর পবিত্র রক্তে সেদিন তায়েফের মাটি ভিজেছে। এতদসত্বেও তায়েফবাসীর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব অবতীর্ণ হবার বিষয়ে তিনি রাজি হননি বরং এ আশা পোষণ করেছেন যে, এরা ঈমান না আনলেও এদের ভবিষ্যত বংশধরেরা ঈমান আনবে।

প্রিয়নবীর এ মহানুভবতা, উন্নত চরিত্র, ক্ষমার এ বিরল দৃষ্ঠান্ত একথাই প্রমাণ করে যে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, শান্তি প্রিয় মানুষদেরকে হুমকি প্রদান, তাদের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা, ইসলামী মুল্যবোধ ও তার উদারতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম এমন এক ধর্ম, যে ধর্ম সীমালঙ্ঘন মূলক যুদ্ধ, সাম্রাজ্য বিস্তার, সম্পদ হরণ, কোন জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করণ, কোন মানুষকে অপমানিত করা এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ভীতি প্রদানের লক্ষ্যে অস্ত্রধারণকে বৈধ মনে করে না। বরং সে অবৈধভাবে জান-মালের ওপর হস্তক্ষেপকে হারাম মনে করে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, তা ক্ষমা উদারতা, মহানুভবতা, রহমত, দয়া, কোমলতা, ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতার গুণে গুণান্বিত। এজন্যে মহান প্রভু প্রিয়নবীকে সম্বোধন করে বলেন–

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

"এটি আল্লাহর এক অসীম দয়া, যে আপনি এদের জন্যে কোমল প্রকৃতির মানুষ হয়েছেন। এর বিপরিতে আপনি যদি নিষ্ঠুর ও পাষাণ হৃদয়ের হতেন, তাহলে এসব লোক আপনার আশপাশ থেকে সরে যেত, অতএব আপনি এদের মাফ করে দিন, এদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, এবং কাজ কর্মের ব্যাপারে এদের সাথে পরামর্শ করুন।"[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান: ১৫৯

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান আল্লাহ এসকল গুণে গুণান্বিত করায় শত্রুর পক্ষ থেকে যত বেশী তাঁকে কষ্ট দেয়া হতো, তিনি তত বেশী তাদের ক্ষমার জন্যে দোয়া করতেন, এ বলে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ

"হে আল্লাহ আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করে দিন, কেননা তারা জানে না"।[১]

যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবাদেরকে তাদের মাতৃভূমি মক্কা থেকে বের করে দিল, দীর্ঘ আট বছর পর তিনি যখন বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, কাবা ঘর থেকে মূর্তি গুলো অপসারণ করার পর সেখানকার অধিবাসীরা প্রিয়নবীর চতুর্পাশ্বে সমবেত হলো। যাদের মধ্যে ঐ সকল লোকেরাও ছিল, যারা একদিন রাসূলকে হত্যার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। রহমতের নবী তাদেরকে বললেন: তোমরা কী ধারণা কর, আমি তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করব? তারা বললো: সম্মানিত ভাইয়ের সন্তান, সম্মানিত ভাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ যাও, তোমরা মুক্ত (তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে)।[২]

এ হচ্ছে উদারতার মূর্তপ্রতীক মহান ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য, যে মন্দের মোকাবিলা মন্দ দিয়ে করে না, বরং উত্তম পন্থায় তার মোকাবিলা করে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾

"হে নবী! আপনি ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করুন, তাহলেই দেখতে পাবেন যে, যার সাথে আপনার শত্রুতা ছিল, তার মাঝে আর আপনার মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে যে, সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু বনে যাবে"।[৩]

ইসলাম কখনো সন্ত্রাসকে স্বীকৃতি দেয় না। বরং সর্বদা শান্তি, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক ভালোবাসার দিকে আহ্বান করে। প্রকৃত মুসলিম তো সে, যার হাত এবং মুখের অনিষ্টতা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর"।[৪]

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৭৪৭৮

২. আস-সুনান আল-কুবরা লিল-বাইহাকী: ১৮৭৩৯

৩. সূরা ফুস্‌সিলাত: ৩৪

৪. সূরা আল-বাকারাহ্: ২০৮

অমুসলিম যারা মুসলিমদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয় না তাদের ব্যাপারেও আল কুরআন বলেছে:

﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

“যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং কখনো তোমাদের নিজেদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে এবং তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তা'আলা কখনো তোমাদের নিষেধ করেন না। অবশ্যই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন”।[১]

অন্যায়ভাবে ইচ্ছাকৃত কোন মুসলিমকে হত্যার অপরাধ যে কত জঘন্য, আল-কুরআনের ভাষায় এভাবে বলা হয়েছে,

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার শাস্তি হলো জাহান্নাম, সেখানে সে অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকবে, আল্লাহর গযব তার ওপর। তাকে তিনি লা'নত দেন, তিনি তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন”।[২]

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

“যারা আমাদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার উত্তোলন করবে, তারা আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়”।[৩]

ওপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম কখনো সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয়নি, সমর্থন করেনি। সুতরাং আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাস করছে, তারা মুসলিম নয়, ইসলামের সাথে তাদের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। ঠিক তেমনি অন্যান্য যারা এ জঘন্য অন্যায়ের সাথে জড়িত, তারাও সমান অপরাধী। অর্থ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, গোলা বারুদ দিয়ে, সমর্থন দিয়ে যারা এদেরকে সহযোগিতা করছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে জনসম্মুখে

---

১. সূরা আল-মুমতাহিনা: ৮
২. সূরা আন-নিসা: ৯৩
৩. মুসনাদে আহমাদ : ৪৬৪৯

তাদের এ নির্লজ্জ সীমালঙ্ঘনকে উন্মোচিত করা আজ সময়ের দাবী। গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর মোকাবিলায় নামতে হবে। মনে রাখতে হবে, অন্যায় যেই করুক না কেন, তা অন্যায়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যার দ্বারাই সংঘটিত হোক না কেন, সেই সন্ত্রাসী।

বিশ্বব্যাপী এ সন্ত্রাসের ঘনঘটা চলছে। মনোবল হারালে চলবে না। বিপদ যত কঠিনই হোকনা কেন, সমস্যা যতই প্রকট আকার ধারণ করুক। সর্বোচ্চ ধৈর্য প্রজ্ঞা, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে। আলোচনার শেষের দিকে এসে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে এ সমস্যার সমাধান এবং এ থেকে উত্তরণের কতিপয় দৃষ্টি ভঙ্গি ও পরামর্শ সম্মানিত পাঠক বৃন্ধের সামনে তুলে ধরছি।

মানুষ হত্যা, অরাজকতা সৃষ্টি, ভয় ভীতি প্রদর্শন, জান-মালের ক্ষতি সাধন ইসলাম কখনো বরদাশত করে না। সুতরাং যারা এসমস্ত অপরাধের সাথে জড়িত, তাদেরকে শায়েস্তা করা, সমূলে নিশ্চিহ্ন করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করাকে ইসলাম অনুমতি দেয়। তবে এক্ষেত্রে ইসলাম শুধু মাত্র সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে নিশ্চিহ্নকরণ পদ্ধতিই অবলম্বন করেনা। বরং তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিশুদ্ধীও সংশোধনী মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। যেমন:

* শিক্ষামূলক আত্মিক চিকিৎসা :

আত্মিক চিকিৎসাই হচ্ছে মূল চিকিৎসা, কেননা মানুষের কর্মের ভাল-মন্দ তার চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জ্ঞান থেকেই উৎসারিত হয়। আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের অনুভুতি হৃদয়ে সৃষ্টি করে দিয়ে ইসলাম সবধরণের মানবীয় অবিচারের চিকিৎসা করে। অন্তর যখন ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করে, তখনই যাবতীয় ভালকাজ করা, আর মন্দ কাজ ছাড়া সহজ হয়ে যায়। এরপর আসে ইবাদাতের কথা, যেমন সালাত, যা সকল প্রকারের অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর আল্লাহর স্মরণই হচ্ছে সর্বোত্তম। এভাবে অন্তর প্রস্তুত হয়ে গেলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে এক কদমও বাড়াবেনা। লড়াই করবে তো শুধু আল্লাহর কালেমাকে সমোন্নত রাখার জন্যেই, সম্পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধ ও অনুশাসনের গণ্ডির ভেতর থেকেই। অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন, মিথ্যা, প্রতারণা, ধোকা, প্রবৃত্তির অনুসরণ, নফসের জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ, ইত্যাদি থেকে সে সর্বদাই নিজেকে দূরে রাখবে।

একজন মানুষের অন্তর যখন এভাবে হেদায়েতের আলোকে ভরে যায়, তখন শুধু কল্যাণ আর কল্যাণই সে উপহার দেয়। নিজের জন্যে, মানবতার জন্যে। আমরা বারবার বলেছি যে, ইসলাম কখনো কঠোরতা চায়না। ইসলামে জিহাদ বিধিবদ্ধ থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত অস্ত্রধারণের প্রয়োজন না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত তা ব্যবহারে

নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। বরং সর্বোত প্রচেষ্ঠা থাকবে রক্তহীন সমঝোতা এবং ভালোবাসা দিয়ে বুঝানো।

ইমাম বুখারী সাহ্‌ল বিন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রিয়নবীর হাদীস বর্ণনা করেন: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার-এর দিন বললেন: আগামীকাল আমি এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব, আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন, সে আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসে, আল্লাহ এবং তার রাসূল ও তাকে ভালোবাসেন। সাহাবারা শুধু এ চিন্তা করেই রাত শেষ করেছেন, যে তাদের কাকে এ পতাকা দেয়া হবে, তারা প্রত্যেকেই পতাকা পাবার আশায় ভোরে ভোরে রাসূলের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কোথায়? বলা হলো যে, তিনি চোখ উঠা রোগে ভুগছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চক্ষুদ্বয়ে একটু থুথু মেখে দিয়ে সুস্থতার জন্য দোয়া করলেন, তিনি তখন এমন ভাবে সুস্থ্য হয়ে গেলেন, যেন এতে কোন ব্যাথাই ছিলনা। এরপর তিনি তার হাতে পতাকা তুলে দিলেন। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আমাদের সমতূল্য হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়ব। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

"ধীর স্থীরে তাদের আঙ্গিনায় অবতরণ করবে, অতপর তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং তাদের ওপর যা কর্তব্য সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে। আল্লাহর নামের শপথ, আল্লাহ তোমার মাধ্যমে যদি একজন লোককে হেদায়াত দান করেন তাহলে তা তোমার জন্যে লাল রংয়ের উৎকৃষ্ট উটের চেয়ে ও উত্তম"।[১]

আল কুরআনে এসেছে:

﴿وَإِن جَنَحُوا۟ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ﴾

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝোকে তাহলে আপনিও সেদিকে ঝুকবেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন"।[২]

এ কারণে আমরা দেখতে পাই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার সময় সন্ধিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, যাকে মহান আল্লাহ স্পষ্ট বিজয় বলে আখ্যায়িত

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ২৯৪২

২. সূরা আল-আনফাল: ৬১

করেছেন। একজন মানুষ যখন ইসলামের এসব উদারতা আর মহানুভবতার কথা শিখবে, জানবে, তখনি সে আর সন্ত্রাসের পথে পা বাড়াবেনা।

* সমন্বিত সাংগঠনিক সংশোধন :

জিহাদ হচ্ছে দলগত সম্মিলিত একটি মহান কাজ। ব্যক্তিগত, বিক্ষিপ্ত, একাকী কারো কাজ নয়। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তি শুরার মাধ্যমে শরীয়তের স্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে কল্যাণ-অকল্যাণের সর্বদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। যারা আজ মুষ্ঠিমেয় কতিপয় বিভ্রান্ত স্বার্থান্বেষীলোকের পাল্লায় পড়ে জিহাদের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, ইসলামে এ জাতীয় স্বেচ্ছাচারিতার কোন সুযোগ নেই।

* দমননীতি অবলম্বনের মাধ্যমে চিকিৎসা :

সীমালজ্ঘনকারী সন্ত্রাসীদেরকে তাদের সন্ত্রাস বন্ধে বাধ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত দমননীতি গ্রহণ করা। "দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালন" নীতি অবলম্বন করা ছাড়া অনেক সময় ফল পাওয়া যায়না। বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে যখনি কোন সন্ত্রাসীদল মাথা ছাড়া দিয়ে উঠে, তখন রাষ্ট্রের হাতগুটিয়ে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। প্রিয়নবী বলেছেন:

انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

"তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক"।[১]

আর তা হবে আল কুরআনের বর্ণিত পদ্ধতিতে:

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾

"যদি মুমিনদের দুটিদল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের উভয়ের মাঝে ইসলাহ করে দাও। এরপরও যদি একদল আরেকদলের ওপর সীমালজ্ঘন করে, তাহলে সীমালজ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যতক্ষণনা তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে"।[২]

যেহেতু সকলের ক্ষেত্রে একই ধরনের পদ্ধতি-প্রচেষ্ঠাফলপ্রসু হয়না, কাজেই ওয়াজনসীহত কাজে না আসলে, ইসলামী মুল্যবোধের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করার পরও যদি বাড়াবাড়ি করে, তাহলে সংশোধনের এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

---

১. সুনান তিরমিযী: ২২৫৫; মুসনাদে আহমদ: ১১৯৪৯

২. সূরা আল-হুজুরাত: ৯

* ইসলাহী চিকিৎসা :

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সন্ত্রাসীকর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তির সামনে আশার দ্বার উন্মুক্ত করা, স্বেচ্ছায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চাইলে তাকে নিরাশ না করা। একাজটি দু'ভাবে করতে হবে;

১. তার শাস্তি ইন্‌সাফপূর্ণ হতে হবে, সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। নতুবা শাস্তিই আবার যুলুম হয়ে যাবে।

২. শাস্তি যেন শেষ চিকিৎসা না হয় বরং পরবর্তীতে সংশোধন এবং সমঝোতার সুযোগ রাখতে হবে।

অপরাধীকে সংশোধন এবং ফিরে আসার সুযোগ না দিলে সে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অথবা বের হওয়ার কোন পথ না পেয়ে সীমালঙ্ঘনের ওপরই জমে থাকতে চাইবে। এ কারণে মহান আল্লাহ তাআলা এ দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন। এমনকি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের জন্যেও তা খোলা রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"তবে তারা ছাড়া, যারা তোমাদের আয়ত্বে আসার আগে তাওবা করবে। সুতরাং জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[১]

উপসংহার :

মানুষ মানুষের জন্যে। ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীতে আমরা যে যা করব পরকালে আল্লাহর নিকট এর বিনিময় পাব। সেদিন কেউ কারো সহযোগিতা করবে না। সন্ত্রাস, রাহাজানী, অরাজকতা, যুলুম, নির্যাতন, অবিচার, এসবই ক্ষতি এবং ধ্বংসের কারণ। ইসলাম এ সবকিছুর সম্পূর্ণ বিরোধী। দেশপ্রেম একজন মানুষের সহজাত ধর্ম। এদেশ হুমকীর মুখে পতিত হোক কোন দেশপ্রেমিক তা চায়না। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রিয় মাতৃভূমিকে সন্ত্রাস মুক্ত রাখতে সর্বস্তরের জনগনকে সহযোগিতার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে হিফাজত করুন। আমাদের এদেশকে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচান। আমীন।

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৪

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ইসলাম : আমাদের করণীয়

الإسلام لمكافحة الإرهاب والفساد وواجبنا

ড. মোঃ নূরুল্লাহ

প্রশিক্ষক, বিএমটিটিআই, গাজীপুর ও

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

সউদী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সমিতি বাংলাদেশ

ভূমিকা:

সন্ত্রাস এর সূচনা আদম আলাইহিস সালাম এর যুগেই। কাবিল অন্যায়ভাবে তার ভাই হাবিলকে হত্যা করে। খুব বেশী বিশ্লেষণ না করেই বলা যায় যে, কাবিলের কাজটি ছিলো একটি সন্ত্রাসী কাজ। এ ধরনের সন্ত্রাস যুগে যুগে দেশে দেশে হয়ে আসছে। কখনও কম আবার কখনও বেশী। কোথাও কম আর কোথাও বেশী। কোথাও সহনীয় পর্যায়ের আবার কখনও অসহনীয়। সন্ত্রাস যুগে যুগে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে। পরিবেশ বিনষ্ট করেছে। বিষিয়ে তুলেছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে। এই সন্ত্রাসের ভিন্ন একটি রূপ হলো জঙ্গীবাদ। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যখন ধর্মের নামে করা হয় তখন তাকে বলে জঙ্গীবাদ। বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় ইসলামের নামে, জিহাদের নামে বেশ কতিপয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, কোথাও কোথাও এখনও হচ্ছে যা জঙ্গীবাদ হিসেবে পরিচিত। ইসলামে সন্ত্রাসের স্থান নেই এ কথা সবাই জানে। সকলে এ বিষয়ে অবহিত । কিন্তু জিহাদের নাম ব্যবহার করে প্রকৃত অর্থে যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয় অর্থাৎ জঙ্গী কাজ করা হয় তকে কী ইসলাম সমর্থন করে? যদি না করে থাকে তা কেন এবং কোন কারণে? আজকের বাংলাদেশে জিহাদ/ইসলামের নামে যেসব দল বা গোষ্ঠী সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে যাচ্ছে তা প্রতিরোধে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিই বা কী এবং এসব সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে আমরা কী করতে পারি তা তুলে ধরার জন্য বক্ষ্যমাণ এ নিবন্ধ।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ এর পরিচয়:

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে:

"Terrorism: the systematic use of violence to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective..

("সন্ত্রাস: নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশৃঙ্খলভাবে সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠির মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা"।)[১]

মার্কিন সরকারের ফেডারেল বুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফ. বি. আই): Terrorism বা সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় বলেছে:

"the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment there of, in furtherance of political or social objectives

---

১. https://www.britannica.com/search?query=Terrorism

"কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা"।[১]

সংজ্ঞা দুটো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এফবিআই এর প্রদত্ত সংজ্ঞাটি তুলনামূলকভাবে অগ্রাধিকারযোগ্য। কারণ, এ সংজ্ঞাটিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বেআইনী সহিংসতাকে সন্ত্রাস বলা হয়েছে, যা এনসাইক্লোপেডিয়ার সংজ্ঞা থেকে কিছুটা ব্যপক অর্থ বহন করে। আমি মনে করি এফবিআই-এর সংজ্ঞার সাথে "ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য" কথাটি যুক্ত করলে এর ব্যাপকতা ও পরিধি বাড়তে পারে। এভাবে বলা যেতে পারে,

"the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social or personal objectives."

"কোনো সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা"।

মোট কথা, ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য হত্যা, আক্রমণ ইত্যাদির মাধ্যমে বেসামরিক/অযোদ্ধা মানুষের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করার নাম সন্ত্রাস। আর এই সন্ত্রাসই যখন ধর্মের নাম ব্যবহার করা হয় তা হলো জঙ্গীবাদ। প্রকৃত অর্থে এ দুয়ের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। দুটোই বেআইনী এবং দুটোই সন্ত্রাস।

জঙ্গিবাদ কবে থেকে শুরু হয়েছে তা তেমন জানা না গেলেও ইসলামের নামে সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদ এর সূচনা সম্পর্কে বলা যায় যে, ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শুরু খারিজী সম্প্রদায়ের মাধ্যমে। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ.) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান উসমান ইবনু আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিদ্রোহীদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের বা রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার মত কেউ ছিল না। তাঁরা রাজধানী মদীনার সাহাবীগণকে এ বিষয়ে চাপ দিতে থাকে। একপর্যায়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি

---

১. http://www.nij.gov/topics/crime/terrorism/pages/welcome.aspx

জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি ঘোলাটে হয়ে গৃহযুদ্ধে রূপান্তারিত হয়। সিফ্ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিসী মজলিস গঠন করেন। এই পর্যায়ে আলীর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলীর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' বা দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় ও সারাদিন যিক্র ও কুরআন পাঠে রত থাকার কারণে এরা 'কুররা' বা 'কুরআন পাঠকারী দল' বলে সুপরিচিত ছিলেন। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর বিধান, অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। কারণ আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾

"মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে"।[১]

এখানে আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, সীমালঙ্ঘনকারী দলের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। মু'আবিয়ার দল সীমালঙ্ঘনকারী, কাজেই তাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এ বিষয়ে মানুষকে সালিস করার ক্ষমতা প্রদান অবৈধ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

"কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই" বা "বিধান শুধু আল্লাহরই"।[২]

---

১. সূরা আল-হুজুরাতঃ ৯

২. সূরা আল-আন'আমঃ ৫৭

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কুরআন কারীমে আরো এরশাদ করা হয়েছে:

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিচার ফয়সালা করে না তারাই কাফির"।[১]

আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তার অনুগামীগণ যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে, সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁদের অনুসারীগণ সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তারা তাদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তারা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন। তারা সাহাবীদেরকে দালাল, আপোষকামী, অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি মনে করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

সালিসি ব্যবস্থা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মধ্যকার বিবাদ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হওয়াতে তাদের দাবি ও প্রচারণা আরো জোরদার হয়। তারা আবেগী যুবকদেরকে বুঝাতে থাকে যে, আপোসকামিতার মধ্য দিয়ে কখনো হক প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের নির্দেশ অনুসারে জিহাদ চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে ইসলাম রক্ষা কিংবা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে খারিজী সম্প্রদায় অনেক ইসলামপন্থিকে কাফির বলে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। এমনকি গুপ্ত হত্যাসহ বিভিন্ন প্রকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। যা মূলত সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ছিলো বলে হাজার হাজার সাহাবীসহ পৃথিবীর বড় বড় সকল ইসলামিক স্কলারগণ মত দিয়েছেন।

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ/উগ্রতা প্রতিরোধে ইসলাম:

১. ইসলামে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ বা উগ্রতার কোনো স্থান নেই। ইসলামে জিহাদ আছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ আছে, কিন্তু সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নেই। ইসলামের নাম ব্যবহার করে দেখতে শুনতে কোনো পাক্কা হুজুরও যদি সন্ত্রাস করে রাসূলের ভাষায় সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ এবং আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের গণ্ডি থেকে খারিজ। আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের সালাতের পাশে তোমাদের সালাত তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের সিয়ামের পাশে তোমাদের সিয়াম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের নেককর্মের পাশে তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, তেমনিভাবে তারা দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে"।[১]

২. যুগে যুগে ইসলামের নামে বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মুসলিমদের একটা অংশকে কাফির ও মুরতাদ মনে করবে। তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে। নিরিহ সেসব মানুষদের তারা হত্যা করবে। যেমনটি আমরা বাংলাদেশের সিনেমা হলে কিংবা রমনা বটমূলে কিংবা বিচারকদের মত নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করার মত ঘটনা অবলোকন করেছি। দেশের ৬৩ জেলায় বোমা ফাটিয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কগ্রস্থ করতে দেখেছি। এসবই ইসলামের নামে হলেও তা জিহাদ নয় সন্ত্রাস ও জঙ্গী কর্মকাণ্ড। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের বিষয়ে বলেছেন:

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৩৩৫৬

"শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা ও বোকামিতে পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। তারা সর্বোত্তম মানুষের কথা বলবে। তারা সত্য-ন্যায়ের কথা বলবে। কিন্তু তারা সত্য, ন্যায় ও ইসলাম থেকে তেমনিভাবে ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে; কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে।"[১] ও [২]

৩. কেউ যদি কোন মানুষকে (সে মুসলিম হোক কি অমুসলিম হোক) অন্যায়ভাবে হত্যা করে সে যেন গোটা মানব জাতিকে হত্যা করে বলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

"এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে"।[৩]

আল্লাহ এখানে নাফস শব্দ বলেছেন। মুসলিম শব্দ বলেন নি। নফস বলতে যে কোন ব্যক্তিকে বুঝায়। সে নারী হোক কি পুরুষ। সে মুসলিম হোক কি অমুসলিম।

৪. ইসলামের দৃষ্টিতে যুদ্ধের ময়দানেও বেসামরিক নারী পুরুষ, মুসলিম কিংবা অমুসলিম এমনকি শত্রুপক্ষের সাধারণ নাগরিককে হত্যা করা জায়েজ নেই। তখন

---

১. সুনান আবূ দাউদ: ৪৭৬৭

২. এখানে ঐসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ আইন হাতে তুলে নিবে। ইসলামের মূলনীতি হলো আইন হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ নেই। বিচার-ফায়সালার মাধ্যমে কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদেরই কেবল হত্যা করা যায়। এ বিষয়েও রাষ্ট্রই অবস্থার প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিবে। কোন ব্যক্তি নয়।

৩. সূরা আল-মায়িদাহ: ৩২

সেটি হবে সন্ত্রাসী কাজ। সুতরাং সাধারণ অবস্থায়, শান্তি অবস্থায় এবং কোন মানুষ হোটেলে খেতে গেলে তাকে হত্যা করা কি গ্রহণযোগ্য? অবশ্যই নয়। সেটি হারাম, অবৈধ। সেটি সন্ত্রাসী কাজ। ইসলামের নামে করলে সেটি জঙ্গী কার্যক্রম, যা অবৈধ।

৫. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ করে বিপর্যয় সৃষ্টি করলে, মানুষকে হত্যা করলে, তার ভয়াবহ শাস্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছেন।

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি"।[১]

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে ফিতনা-ফাসাদ করা হরাম। সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড হলো হারাম কাজ। আল্লাহ তা'আলা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য সংগ্রাম ও লড়াই করতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়"।[২]

৭. ৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট এসে বলে:

إِنَّ النَّاسَ ضُيِّعُوا وَأَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي فَقَالَا أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّينُ لِلَّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِغَيْرِ اللَّهِ.

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৩

২ সূরা আল-আনফাল: ৩৯

"মানুষেরা ফিতনা-ফাসাদে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবী, আপনি কেন বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন না? তিনি বলেন, কারণ আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন। তারা বলে, আল্লাহ কি বলেন নি? 'এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে যাবৎ ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়'? তখন তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম এবং ফিতনা দূরীভূত হয়েছিলো এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। আর তোমরা চাচ্ছ যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যেন ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দীন আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হয়"।[১]

এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার বক্তব্যের মাধ্যমে দুটো বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

(১) তিনি এর মাধ্যমে জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন। ইসলামের মূলনীতি হলো, আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জনকে অগ্রাধিকার দেয়া। বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কাজটি কুরআন-হাদীসে বারবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে জিহাদের বারবার আদেশ করা হলেও তা করার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় জিহাদ পরিত্যাগের অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। কাজেই একটি কর্ম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না।

(২) তিনি 'জিহাদ-কিতাল' ও 'ফিতনা' বা সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সাহাবীগণ যে কিতাল/সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিলেন তা ছিল ফিতনা রোধ করার জন্য, আর খারিজীগণ যে কিতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ করছে তা ফিতনা দূর করার জন্যতো নয়ই বরং ফিতনা প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই তিনি এ যুদ্ধে অংশ নেননি।

এ থেকে বুঝা গেলে জিহাদ আর সন্ত্রাস এক নয়। ইসলামের নাম ব্যবহার করে কোন যুদ্ধ করলেই তা জিহাদ হবে না। ইসলাম নির্ধারিত সকল শর্তাদি পূরণ করলে হবে জিহাদ আর শর্তাদি পূরণ না হলে তা হবে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ, যা প্রতিরোধে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছে।

---

১. সহীহ আল-বুখারী : ৪৫১৩

উল্লিখিত কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের আমল প্রমাণ করে যে, ইসলাম সবসময় সন্ত্রাস ও জঙ্গীপনা নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। ইসলাম শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় জিহাদ ও আন্দোলনের অনুমোদন দিয়েছে কিন্তু সন্ত্রাসের কোনো স্থান ইসলামে নেই।

বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে ইসলামের নামে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে আন্দোলন ও সংগ্রাম ছিলো। কিন্তু ইসলামের নামে কিংবা জিহাদের নামে নিরিহ মানুষদের হত্যা ও ত্রাস সৃষ্টি করা, বোমা মেরে আতঙ্ক সৃষ্টি করা ঘোষণা দিয়ে ব্যাপকভাবে ২০০৫ সালে আরম্ভ হয়। দেশের সরকার, সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে এ দেশের আলিমগণ এই জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একযোগে জেগে ওঠে। তারা ঝাঁপিয়ে পরে এর বিরুদ্ধে। আলোচনা, ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ বিভিন্নভাবে জনমত তৈরি করে সমাজ থেকে, দেশ থেকে এই জঙ্গিবাদ প্রায় নির্মূলে সক্ষম হয়। কিন্তু পুরোপুরি নির্মুল না হওয়ায় ২০১৬ সালের ১লা জুলাই হলি আর্টিজেনের হত্যাকাণ্ডের মত হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে জঙ্গিবাদের নামে। আহত হয় গোটা বিশ্ব। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক হয় স্তম্ভিত। যার রেশ আমরা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

কোন কোন মহল এই জঘন্য ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে এককভাবে মাদ্‌রাসা শিক্ষার ফল বলে প্রচারে নামেন। মানুষকে মাদ্‌রাসা শিক্ষার বিষয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের সেই বিভ্রান্তিতে জনগণ সাড়া দেননি। আজ প্রমাণিত যে, বাংলাদেশের মাদ্‌রাসা শিক্ষা (আলিয়া কিংবা কওমী) সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় না। তারা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা প্রদান করে। এটি বিশেষ মতাদর্শ। এই মতাদর্শের সাথে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতগণ যতটা সম্পৃক্ত হচ্ছেন তার চেয়ে মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সরকার যদি কখনও এর পরিসংখ্যান তৈরি করেন তবে তা আমাদের কাছে অনেক বেশী স্পষ্ট হবে।

আমি মনে করি, যাদের মধ্যে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ তৈরি হয়েছে কিন্তু ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান নেই কেবল তারাই এই জঙ্গীপনায় জড়িয়ে থাকবে কিংবা সমর্থন করে থাকেন। সত্যিকারের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি এর সাথে জড়িত নেই এবং হতে পারে না।

আমাদের করণীয় :

সমাজ থেকে, দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রুখতে আমি একজন নাগরিক হিসেবে কী করা উচিৎ তা বিশদ আলোচনার দাবী রাখে। আমি মোটা দাগেস কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই।

১. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। শুধু কথায় নয় কাজে তার প্রমাণ দিতে হবে। এই প্রমাণ দিতে হবে ক্ষমতায় যে দল যখনই থাকুন না কেন। প্রমাণ দিতে হবে পুলিশকে, তদন্ত কর্মকর্তাকে এবং বিচারককে। আইনের মাধ্যমে দলমত নির্বিশেষে সকল সন্ত্রাসী ও জঙ্গীকে শাস্তির মুখোমুখী করতে হবে। দলীয় পরিচয়ের কারণে কোনো সন্ত্রাসী কিংবা জঙ্গী যদি মুক্তি পেয়ে যায় তবে সে সমাজ থেকে কখনও সন্ত্রাস দূর হবে না।

২. গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। দেশের জন্য হুমকি নয় এমন প্রত্যেক আদর্শের নাগরিককে তার মত, চিন্তা ও আদর্শকে প্রচারের ব্যাপরে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। জনগণের সামনে লেখনির মাধ্যমে, বক্তৃতা ও বিবৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন মতাদর্শ প্রচারের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। জণগণকে স্বাধীনভাবে ভোট প্রয়োগের সুযোগ দিতে হবে। যে দল বা মতাদর্শকে এ দেশের জনগণ সমর্থন করবে তারাই দেশ শাসনের সুযোগ পাবে। এই মানসিকতা পরিহার করতে হবে যে, অমুক দলকে কিংবা অমুক আদর্শবাদীদের কথা প্রচার করতে দেয়া হবে। এটি করা হলে তখন তারা সন্ত্রাস কিংবা জঙ্গীপনার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে মরিয়া হয়ে উঠবে।

৩. জঙ্গীবাদী ধ্যান-ধারণায় আমাদের সন্তান বা পোষ্যরা যাতে জড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে একদিকে সতর্ক থাকতে হবে অন্যদিকে তাদেরকে ইসলামী বিধি-বিধান পড়াশুনার সুযোগ করে দিতে হবে। ইসলামের যথাযথ জ্ঞান থাকলে কেউ জঙ্গিবাদের জড়াতে পারে না। কিন্তু এর চিকিৎসায় যদি তাদেরকে ইসলামী বইপত্র থেকে দূরে রাখা হয়, ইসলামী বই পুস্তক ও নামায-রোযা থেকে সরিয়ে রাখা হয় তবে মানুষের স্বভাবজাত নিয়মানুযায়ী নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি তাদের ঝোঁক বেড়ে যাবে। ফলে সে আরো অতি মাত্রায় জঙ্গী মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

৪. দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি সেক্টরে (স্কুল ও মাদ্‌রাসায়) জিহাদ ও সন্ত্রাস এর পার্থক্য তুলে ধরে পড়াশুনার সুযোগ চালু করতে হবে। জঙ্গিবাদের বিষয় সামনে

এনে জিহাদকে জানার সুযোগ না দেয়া হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। জিহাদের কথা আল-কুরআনে আছে। মুসলিম দেশে কুরআন নিষিদ্ধ করার সুযোগ যেহেতু নেই সুতরাং জিহাদ ও জঙ্গীপনাকে এক করে না দেখে মানুষের মাঝে এর পার্থক্য পরিষ্কার করতে হবে।

৫. যারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িয়ে গেছেন কিংবা জড়িয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে একদিকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে অন্যদিকে যারা ফিরে আসতে আগ্রহী তাদের সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। বর্তমান সরকার এ কাজটি গুরুত্বের সাথে করছেন বলে আমার ধারণা।

সর্বোপরি, ইসলাম মানুষের কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নাযিলকৃত জীবন ব্যবস্থা। দুনিয়ায় শান্তি আর আখিরাতে কল্যাণের পথ বাতলে দেয়া এ ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ ধর্মে সন্ত্রাসের স্থান নেই এ কথা আমরা সকলেই জানি। নেই জঙ্গিবাদের স্থানও, যা আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করলাম। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের ছোবল থেকে দেশ এবং জাতিকে মুক্ত থাকার তাওফিক দিন। আমীন!

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস ও চরমপন্থা

الإرهاب والتطرف من منظور إسلامي

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

আজ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বছর আগে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিল এমন এক পরিবেশে যখন মানুষের সার্বিক আচার-আচরণ পাশবিক আচরণকে অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সে যুগটি আখ্যায়িত হয়েছিল জাহিলী যুগ হিসেবে। মানবাধিকারের বদলে জোর-জুমুল ছিল যে সমাজের মূলমন্ত্র। অমানবিক ও পাশবিক যাবতীয় কাজ তৎকালীন সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব ও কৌলিন্যের বিষয় ছিল। সে সময়ের অনাকাঙ্খিত কার্যকলাপের কথা মনে হলে গা শিউরে ওঠে। এমন একটি সমাজকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নৈতিক আদর্শ, মহানুভবতা, সহনশীলতা, ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। গড়ে তোলেন সর্বোত্তম একটি মানবীয় সমাজ।

চরমপন্থা শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Extremism, যার অর্থ হলো Holding extreme views বা চরম মনোভাব পোষণকারী বা উগ্রপন্থী। সন্ত্রাস শব্দের অর্থ হলো অতিশয় ত্রাস, ভয়ের পরিবেশ। আর সন্ত্রাসবাদ হলো রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন। সন্ত্রাস শব্দটিকে নানা জন নানা অর্থে ব্যবহার করে থাকেন সে অর্থে স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রতিপক্ষ চরমপন্থা ও সন্ত্রাস হিসেবে যেমন আখ্যায়িত করে থাকেন ঠিক তেমনি স্বাধীনতাকামীরা আবার তাদের প্রতিপক্ষকে চরমপন্থা অবলম্বনকারী, সন্ত্রাস বিস্তারকারী অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। ১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে সন্ত্রাসের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেয়া হয়। তাতে বলা হয়, সন্ত্রাস হলো ব্যক্তি বা সামষ্টিক অপরাধের মনোবৃত্তি হতে সংঘটিত নিষ্ঠুর কাজ বা কাজের হুমকি, তা যে লক্ষ্যেই হোক না কেন। তা দ্বারা মানুষের মনে ভয়ভীতি সঞ্চার করা হয় বা তাদেরকে কষ্টে ফেলার হুমকি দেয়া হয়, বা তাদের জীবন, স্বাধীনতা বা নিরাপত্তাকে ধ্বংসের মুখে ফেলা হয় বা পরিবেশকে ক্ষতির মুখে ফেলে দেয়া হয় বা সাধারণ জনগণের বা সরকারি সম্পত্তি ছিনতাই, জবর দখল, নষ্ট করা হয়।

সন্ত্রাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

"যখন সে শাসকের আসনে বসে, তখন পৃথিবীতে ফাসাদ ছড়িয়ে দিতে ব্যাপৃত হয় এবং ফসল ও প্রাণিকুলকে ধ্বংস করে দিতে প্রবৃত্ত হয় অথচ আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না"।[১]

---

১. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২০৫

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন :

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾

"আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর যারা তা ভেঙ্গে দেয় এবং আল্লাহ সেসব সম্পর্ক দৃঢ় করার আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে ফাসাদ ব্যাপৃত করে তাদের ওপরই আল্লাহর অভিশাপ, তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা"।[1]

ফরাসী বিপ্লবের সময় (১৭৪৯-১৭৯৯) কতিপয় বিপ্লবী তাদের প্রতিপক্ষের বিষয়ে হিংসাত্মক বা চরমপন্থার আশ্রয় নিত। এ কালকে সন্ত্রাসের সময় বা Region of terror বলা হয়। প্রথম দিকে সংঘটিত চরমপন্থী সন্ত্রাস ঘটনার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংঘটিত সন্ত্রাসের কথা উল্লেখ করার মত। ১৮৬৫ সালে গৃহযুদ্ধের পর পুনরায় উনিশ শতকে কুক্ল্যাক্স ক্ল্যান নামক একটি শেতাঙ্গ গ্রুপ কৃষ্ণাঙ্গ ও তাদের প্রতি সহানভূতিশীলদের ওপর বর্ণবাদী সন্ত্রাস চালায়। মধ্যযুগে খ্রিস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে সন্ত্রাসের অগণিত ঘটনা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে। বিশেষত ধর্মীয় সংস্কার পাল্টা সংস্কারের যুগে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টানদের মধ্যে অগণিত যুদ্ধ হত্যাকাণ্ড এমনকি যুদ্ধবহির্ভূত অসংখ্য সন্ত্রাস ও চরমপন্থী তৎপরতায় দেখা যায়। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও রাজনৈতিক কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকারী হাজার হাজার লোককে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জার্মানিতে হিটলার, ইতালিতে মুসোলিনি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে জোসেফ স্ট্যালিন বিরোধী পক্ষকে দমনের নামে অবর্ণনীয় নারকীয় ও নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। ইহুদিরা পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম সন্ত্রাস পরিচালনা করে ফিলিস্তিনে। পরাশক্তিসমূহের প্রত্যক্ষ মদদে সংঘটিত তাদের সন্ত্রাস পৃথিবীতে নজির সৃষ্টি করে রেখেছে। এ সন্ত্রাসের লক্ষ্য ছিল স্বীয়ভূমি থেকে তাদের বিতাড়িত করে, স্বীয় ভূখণ্ড রক্ষায় তারা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পৃথিবীর সকল মানদণ্ডে বিচার করলে ইসরাইলি কর্মকাণ্ড সন্ত্রাস হিসেবে এবং ফিলিস্তিনিদের তৎপরতায় মুক্তি সংগ্রাম হিসেবে বিবেচিত। অনুরূপভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্ভব ঘটে উত্তর আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি। একইভাবে সত্তরের দশকে ক্যারিবিয়ান সাগরের পোর্টোরিকোতে FALAN নামে স্বাধীনতা গ্রুপের উদ্ভব ঘটে আমেরিকান শাসনের বিরুদ্ধে। যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অসংখ্য বোমা হামলার ঘটনা ঘটায়।

---

১. সূরা আর-র'দ: ২৫

জিহাদের পরিচয়

জিহাদ আরবী শব্দ। যা জুহুদ ধাতু থেকে এসেছে। যার শাব্দিক অর্থ চেষ্টা সাধনা করা। আর ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার সংজ্ঞা পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি।

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

"তোমরা ততক্ষণ লড়াই করতে থাক, যতক্ষণ না জমিন থেকে ফিতনা দূর হয় এবং সর্বত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয় তবে জালিম ব্যতীত কারো প্রতি কঠোরতা আরোপ করা হয় না"।[১]

অর্থাৎ যারা জিহাদের কাজ থেকে বিরত থাকবে তারা জালিম এবং তাদের ওপর আল্লাহ কঠোরতা আরোপ করবেন। পবিত্র কুরআনে আলোচ্য আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বা জিহাদ করা মুসলমানদের ওপর অবশ্য কর্তব্য।

জিহাদ মানে আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ করার নানাবিধ প্রচেষ্টা। এটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ প্রচেষ্টা বক্তব্যের মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে, সেবামূলক কাজ, সমাজ সংস্কার, ধর্মীয় কাজ এমনকি চূড়ান্ত পর্যায়ে রাজনৈতিক তৎপরতা, সরকার পরিবর্তন ও যুদ্ধও হতে পারে। তবে এ যুদ্ধের কিছু নিয়মনীতি থাকবে। ইসলামে যেমন হঠকারিতার স্থান নেই, ঠিক তেমনি আল্লাহর নির্দেশ এড়িয়ে যাবার সুযোগও নেই। জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের ওপর থেকে মানুষের গোলামীকে উৎখাত করা সব ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অত্যাচার, অবিচার, অন্যায়, জুলুম, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের মূলোৎপাটন করা। এর মাধ্যমে এদের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অসংখ্য নির্যাতন হয়েছে কোথায়ও তিনি আগে আক্রমণ করেছেন এমন নজির নেই। যতটুকু ভূমিকা ছিল তা নিতান্তই আত্মরক্ষামূলক ছিল। জিহাদের সাথে কোন অবস্থায় সন্ত্রাসকে এক করে দেখার কোন সুযোগ নেই কেননা জিহাদ হলো প্রতিরক্ষার জন্য এবং সন্ত্রাস নির্মূল করে স্থায়ীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

---

১. সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৯৩

ইসলাম প্রতিটি মানুষের জান-মাল-ইজ্জত আবরুর নিরাপত্তা দানকে অপরিহার্য করেছে। ইসলামে মানুষের প্রাণ ও রক্ত পবিত্র এবং সম্মানার্হ। বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

"তোমাদের একের জীবন ও সম্পদ অপরের জন্য নিষিদ্ধ। জাহিলি যুগের সমস্ত খুনের বদলার দাবি রহিত করা হলো। সর্বপ্রথম আমি আমর বিন রবী'আর খুনের দাবি রহিত করলাম। ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আমার পরে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব পরিত্যাগ করে কাফিরসুলভ জীবন গ্রহণ করে একে অপরের গলা কাটতে শুরু করে দিও না"। কাউকে রাষ্ট্রীয়, জাতীয় বা সামরিক স্বার্থ ব্যতীত হত্যা করা পৈশাচিক ও ঘৃণ্য কাজ।

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক কেবল অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা যে নিষিদ্ধ তা নয় বরং নিজেকে বা আত্মহত্যা করাও নিষিদ্ধ। কোন অবস্থায় নিজেকে ধ্বংস করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মালকে জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন"।[১]

যেহেতু মুমিনের জান ও মালকে আল্লাহ কিনে নিয়েছেন অতএব তিনি এর মালিক। আল্লাহর মালিকানাধীন বস্তু বিনষ্টের অধিকার বান্দার থাকতে পারে না। আত্মহত্যা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য নিম্নরূপ পথ- পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না"।[২]

সূরা বাকারায় আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না"।[৩]

---

১. সূরা আত-তাওবা: ১১১

২. সূরা আন-নিসা : ২৯

৩. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৯৫

সূরা নিসায় আরো বলা হয়েছে,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর দয়ালু"।[১]

পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াত তিনটি থেকে আত্মহত্যা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যেখানে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস থেকে আত্মহত্যার নিষিদ্ধতার বিষয়টি আরো বেশি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এ ধরনের লোকেরা যে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে সে সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَتَقَحَّمُ فِيهَا يَتَقَحَّمُ فِي النَّارِ وَالَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ

"যে ব্যক্তি পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামেও সে অনবরত উচ্চ স্থান থেকে লাফিয়ে পড়তে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, জাহান্নামের মধ্যে বসেও অনন্তকাল বিষপান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন লোহার অস্ত্র দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে বসে অনন্তকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়ে নিজেকে কোপাতে থাকবে"।[২]

চরমপন্থীরা ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার পেছনে যে সব কারণগুলো রয়েছে তা নিম্নরূপ- ক. গোঁড়া মনোভাব, খ. ইসলামের জ্ঞানের বা ব্যাপক জ্ঞানের অভাব, গ. অহঙ্কার, ঘ. বক্র স্বভাব ও চিন্তা- এ ধরনের লোকেরা খুবই অপরিণামদর্শী হয়ে থাকে। তাদের বক্রচিন্তার কারণে তারা যেমন নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে ঠিক তেমনি ইসলামী জীবনব্যবস্থাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। এ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদেরকে একমাত্র আল্লাহর খাস বান্দা বলে মনে করে, যা তাদের অহঙ্কারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়, ফলে তারা তাদের মত যারা চলতে পারে না তাদেরকে কাফির বলে মনে করে এবং তাদেরকে হত্যা করা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করে। এ ধরনের অহঙ্কার ও একপেশে মানসিকতা পরিহারের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর ভাষায় তাগিদ দিয়েছেন। যখন কেউ বলবে যে, লোকজন ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সে ব্যক্তি নিজকেই ধ্বংস করলো।

---

১. সূরা আন-নিসা: ২৯

২. মুসনাদে আহমাদ: ৯৬১৮

মুসলিমকে কাফির বলা এক ধরনের ফিতনার সৃষ্টি করে যা সামাজিক অশান্তি ও বিপর্যয়ের কারণ। এর বিষময় ফল সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ততার দিকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। ফিতনা বা বিপর্যয়ের মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন মাজীদে বলেছেন,

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾

"ফিতনা বা বিপর্যয় হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ"।[১]

একই প্রসঙ্গে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيْهِ

"যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইকে কাফির বলে, তবে এ কথা তাদের দু'জনের ওপর বর্তাবে। যদি তার ভাই সত্যিকার কাফির হয় তবে তো ঠিক অন্যথায় কাফির আখ্যায়িতকারীর ওপরই কুফর প্রযোজ্য হবে"।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবন ছিল সহনশীলতা ও ক্ষমার এক অনুপম আদর্শ। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কখনো তিনি কাউকে আঘাত করেননি, কখনো কটু কথা বলেননি। কোন বিষয়ে তার অপছন্দ হলে বিভিন্ন সময়ে তাঁর মুখমণ্ডল লাল হয়ে যেত কিন্তু কখনো তাঁকে দেখা যেত না কাউকে কোন ধরনের কটু কথা বলতে। তিনি ছিলেন সত্যিই বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর রহমত ও দয়ার সাগর।

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের মানুষের সাথে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রার ঔদার্যের ও মহানুভবতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি ইসলামের একটি সর্বজনীন নীতি। তাই ক্ষমা ধর্মের প্রতিই ইসলামের সর্বাধিক অনুপ্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। যতক্ষণ না তদ্বারা অন্য কারো হক বিনষ্ট হয়, কিংবা বাতিল শক্তি পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টির কোন প্রকার আশ্রয় প্রশ্রয় লাভ করে। কিংবা এর অপব্যবহারের মাধ্যমে মানবতার ভয়াবহ সমূহ বিনাশ সাধনের কোন পরিস্থিতি পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, অবাধে অন্যায় অবিচার, অনাচার, পাপাচার, নৈরাজ্য ও ধ্বংস সাধনে লিপ্ত মানবরূপী হিংস্র পশুদের সাথে আপস করার মানসিকতাকে কোনভাবেই মহানুভবতা বলা যায় না, তা হচ্ছে নিছক কাপুরুষতা, ভীরুতা, আত্মগ্লানি ও সত্যের অবমাননা।

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্: ১৯১
২. সহীহ আল-বুখারী: ৬১০৩

মানবজাতির ইতিহাসে চরমপন্থী দলের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। প্রাচীন যুগ থেকে ইহুদি উগ্রবাদী ধার্মিকগণ, ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছেন। মানব ইতিহাসের প্রাচীন যুগের প্রসিদ্ধতম সন্ত্রাসী কর্ম ছিল উগ্রপন্থী ইহুদি জিলটদের সন্ত্রাস। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাসরত উগ্রপন্থী এ সকল ইহুদি নিজেদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপসহীন ছিল। সে সকল ইহুদি রোমান রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করত বা সহাবস্থানের চিন্তা করত এরা তাদেরকে গুপ্ত হত্যা করত। এ জন্য এরা 'ছুরিমানব' হিসেবে পরিচিত ছিল। এরা এতখানি চরমপন্থী ছিল যে, তারা প্রয়োজনে আত্মহত্যা করত কিন্তু প্রতিপক্ষের হাতে জীবিত ধরা দিত না। তাদের উওরসূরি এ ইহুদি জাতি কিভাবে ফিলিস্তিনিদের ভূখণ্ডকে অন্যায়ভাবে দখল করে কয়েক যুগব্যাপী পাখি শিকারের ন্যায় নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করছে তা বিশ্ব বিবেক দেখছে।

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম চরমপন্থী দল হিসেবে খারিজী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাহাদাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ দলের আগমন ঘটে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও মুয়াবিয়ার রাদিয়াল্লাহু আনহু মধ্যে সংঘটিত সিফ্ফিনের যুদ্ধে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটলে আলী সালিসির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তারই অনুসারীদের মধ্য থেকে চরমপন্থী একটি দল বেরিয় যায়। এদেরকে খারিজী বা দলত্যাগী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এরা ছিল ইসলামের দ্বিতীয় যুগের মানুষ। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর ইসলাম গ্রহণ করে। এদের প্রায় সকলেই ছিল যুবক।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইসলাম মানবতার ধর্ম, যার মূলভিত্তি সহনশীলতা, ভালোবাসা ও ক্ষমা। কোন ব্যক্তির বক্তব্য ইসলামের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে না। প্রাধান্য পাবে কেবল কুরআন ও হাদীস বিশেষত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কৃতকর্ম। এ থেকে আমরা দেখতে পাই ইসলামে চরমপন্থার কোনো স্থান নেই।

ইসলামিক স্কলারগণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও আস্থাহীনতা যুবসমাজের বিপথগামিতার অন্যতম কারণ

عدم الثقة والإحتمام بعلماء الأمة هو السبب المؤثر لضلالة الشباب المسلم

শাইখ আহমাদুল্লাহ

দা'ঈ ও ইসলামিক স্কলার

ইসলামিক দা'ওয়াহ্ সেন্টার, গারবুদ দাম্মাম, দাম্মাম, সাউদি আরব

যে কোন শাস্ত্র আয়ত্বে নিছক নিজের পড়াশুনার ওপর নির্ভর করা, বিভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। ইসলামের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এর ব্যতিক্রম নয়। কুরআন ও সুন্নাহ'র ধারক উলামায়ে কেরামকে পাশ কাটিয়ে সঠিক ইসলাম শেখা, বুঝা ও উপলব্ধি করার কোন উপায় নেই। কুরআনুল কারীমে[১] আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদেরকে আল্লাহর আনুগত্য এবং রাসূলের অনুকরণের পাশাপাশি 'উলুল আমর'-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। জগৎবিখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনে কাছীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "'উলুল আমর' বলতে একাধারে (মুসলিম) শাসক এবং উলামায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে"। কুরআন-সুন্নাহর ধারক, উলামায়ে কেরামের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং আস্থাহীনতা মানে ভ্রান্তির সূচনা।

ইসলামের দৃষ্টিতে উলামায়ে কেরাম মৌলিকভাবে অনুসরণীয় নন। তাঁরা কেবল ইলমে নববীর উত্তরাধিকারী তথা বাহক। কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞানের আলোকে, তাঁরা মানুষকে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও দীক্ষা দান করেন। ইয়াহুদীদের মতো উলামাদেরকে 'পালনকর্তার' আসনে আসীন করা যেমন ইসলামের দৃষ্টিতে ভ্রষ্টতা, তাঁদের তত্ত্বাবধান ছাড়া নিজে নিজে দীনের প্রকৃত বুঝ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও ভ্রান্তির কারণ। এ কারণেই ইসলাম মধ্যমপন্থাকে সমর্থন করে। ইমাম শাফি'য়ী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

"যে ব্যক্তি (ইসলামিক স্কলারগণের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি অগ্রাহ্য করে) কেবল বই-পুস্তক থেকে ফিক্‌হ্ অর্জনের চেষ্টা করবে সে ইসলামের বিধি-বিধান বুঝার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হতে পারে"।[২]

উলামায়ে কিরামের প্রতি আস্থাহীনতা থেকেই 'খারিজী' বা মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন উগ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এই শ্রেণীর বিভ্রান্ত লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উলামায়ে কেরামের প্রতি অবহেলা এবং তাঁদের ঢালাও সমালোচনা করে সমাজে তাঁদের ভাবমূর্তি নষ্ট করা ও অগ্রাহ্য করা। এই শ্রেণীর বিপথগামিতার আলামত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকেই পরিলক্ষিত হয়েছিল। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করছিলেন। যুলখুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর ওপর প্রশ্ন তুলে বলে উঠলো- 'হে

---

১. সূরা আন-নিসা: ৫৯
২. তাযকিরাতুস সামি'

আল্লাহর রাসূল, আপনি সঠিকভাবে বন্টন করুন'। জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি যদি ন্যায্য বন্টন না করি, তবে কে আর ন্যায্যভাবে বন্টন করবে? এরপর মুসলিমদের সাধারণ ধারা থেকে বিচ্যুত খারিজীরা সকল যুগে এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। খারিজীরা উলামায়ে সাহাবার প্রতি আস্থাহীনতা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতো এবং তাঁদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত আখ্যা দিয়ে তাঁদের খুন করা বৈধ মনে করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের প্রায় এক শত বছর পর মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। তারও সূচনা হয় বিশ্ববিখ্যাত হাদীস ও ফিক্‌হ বিশারদ হাসান বসরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহ সমকালীন হকপন্থী উলামায়ে কেরামের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাঁদেরকে বর্জনের মাধ্যমে। পরবর্তীতে প্রায় সকল যুগে ইসলাম থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত দল-উপদল সমূহের উৎপত্তিও একই উপায়ে হয়েছিল।

আজকের যুগেও মুসলিম নামধারী ভ্রান্ত চরমপন্থীদের গর্হিত কর্মকাণ্ডে বিশ্বের কোন দেশের মূলধারার উলামায়ে কেরাম বা ইসলামিক স্কলারদের সমর্থন নেই। বরং এসব বিপথগামীরা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী উলামায়ে কিরামকে উল্টো ইসলাম থেকে বিচ্যুত মনে করে এবং বিভিন্ন সময় তাঁদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকে। উলামায়ে ইসলামের স্বীকৃত নীতি অগ্রাহ্য করে করে মনগড়া কারণে মুসলিমদেরকে কাফির বলে আখ্যা দেয় এবং তাদের রক্ত হালাল মনে করে। শুধু তাই নয়, ইসলামের যে কোন বিষয়ে ইসলামিক স্কলারদের ব্যাখ্যা ও পদ্ধতিকে তারা বর্জন করে এবং নিজেদেরকে ইসলামের একমাত্র সঠিক অনুসারী মনে করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শ্রেণীর লোকদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন- "যে ব্যক্তি বলবে-সবাই বিপথগামী। সে লোকটি সবচেয়ে বেশি বিপথগামী"।[১]

অপর দিকে বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশের সকল মত ও পথের উলামায়ে কেরাম ইসলামের নামে চরমপন্থা ও উগ্রতার বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাদের বিপথগামিতার কথা বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং যুবসমাজকে বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে উলামায়ে কেরামের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং তাঁদের প্রতি বিশুদ্ধভাব জন্ম নেয় এমন প্রচার-প্রচারণা থেকে বিরত থাকতে হবে সব মহলকে। সর্বস্তরে ইসলামের সঠিক ধারণা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যুবক শ্রেণীসহ সমাজের সাধারণ

---

১. সহীহ মুসলিম

মানুষকে যে কোন বিষয়ে প্রান্তিকতা ও মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে উলামায়ে কেরামের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিবিড় পর্যবেক্ষণে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসলামের সঠিক পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তবেই দূর হবে বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতা, বন্ধ হবে চরমপন্থা ও উগ্রতা।

আমরা মনে করি, আলিমদের সাথে সম্পর্ক না রেখে ইসলামের নামে যারা মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং ইসলামের সামগ্রিক বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা ইসলামের মূলধারা থেকে ক্রমশ বের হতে থাকবে। তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এ কর্মনীতি মূলতঃ ইসলামের অনুসৃত সঠিক কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী। সুতরাং তারা মূলধারার উপর কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। বরং বিচ্যুত ও পদস্খলন তাদের সামনে অনিবার্য। তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের যুবসমাজসহ সকল ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে সচেতন হওয়া দরকার।

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদঃ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা

الإرهاب والترويع : دراسة على ضوء الإسلام

ড. আবু তাহের

চেয়ারম্যান

কিউসেট ইনস্টিটিউট, সিলেট

উপক্রমণিকা:

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ বহুল পরিচিত দুটি শব্দ। দৈনিক পত্রিকা হাতে নিলেই জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এর খবর থাকবেই। সমগ্র দেশ ও জাতি যেন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ এর অক্টোপাসে বন্দি। তথ্য সন্ত্রাসীরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। তাই জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ-এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক আছে কি না তা খতিয়ে দেখা আজকের সময়ের দাবি। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে জঙ্গিবাদের পরিচয়, সন্ত্রাসের পরিচয়, ইসলামে দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত আলোচনা করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদের পরিচয়:

জঙ্গিবাদ ফার্সি শব্দ। ফার্সি জংগ শব্দের অর্থ লড়াই, সংগ্রাম, যুদ্ধ প্রভৃতি। এর ইংরেজি হলো "মিলিট্যান্ট"। শাব্দিক বা রূপক ভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বুঝাতে এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[১]

শক্তিমত্ত বা উগ্র বুঝাতেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। Oxford Advanced Learner's Dictionary -তে বলা হয়েছে: mililtant, adj Favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim ….militant: n. militant person, esp in politics "মিলিট্যান্ট (জঙ্গি): যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে।[২]......... Merriam-webster's Collegiate Dictionary--তে বলা হয়েছে militant I: engaged in warfare or combat: fighting. 2: aggressively sctive (as in a cause) অর্থাৎ মিলিট্যান্ট (জঙ্গি): যুদ্ধ বা সম্মুখসমরে লিপ্ত ব্যক্তি, যুদ্ধরত। উগ্রভাবে সক্রিয়"।

আরো বিস্তৃতভাবে মাইক্রোসফট এনকার্টা অভিধানে মিলিট্যান্ট বা জঙ্গি শব্দের অর্থ বলা হয়েছে: (aggressive: extremely sctive in the defense or support of a cause, often to the point of extremism)

"আগ্রাসী, কোনো বিষয়ের পক্ষে বা সমর্থনে চরমভাবে সক্রিয়, যা প্রায়শ চরমপন্থা পর্যন্ত পৌঁছায়"।

উপরিউক্ত সকল অর্থে প্রচলিত সকল রাজনৈতিক, আদর্শিক, পেশাজীবি ও সামাজিক দলই "মিলিট্যান্ট" বা "জঙ্গি"। কারণ সকলেই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা

---

১. শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান, পৃ. ৪৬২

২. A.S Hornby, oxford advanced learner's dictionary, p738

প্রেসার প্রয়োগ পছন্দ করেন এবং সকলেই তাদের নিজেদের আদর্শ ও স্বার্থ রক্ষায় বা প্রতিষ্ঠায় "উগ্রভাবে সক্রিয়"। কিন্তু বর্তমানে ঢালাওভাবে জঙ্গিবাদকে ইসলামের নামে সম্পৃক্ত করার তথ্য ত্রাস চলছে। এ জন্যে পৃথক পৃথক পরিভাষা বানানো হচ্ছে। যারা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হন তাদেরকে "চরমপন্থী (extremist) বলা হয়। আর যারা প্রচলিত সাধারণ রাজনৈতিক দলের নামে বা কোনো দল, মতবাদ বা আদর্শের নাম না নিয়ে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য উগ্রতা অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত হয় তাদেরকে সন্ত্রাসী বলা হয়। আর যারা ইসলামের নামে বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত তাদেরকে বলা হয় "জঙ্গি"। এদের কার্যকলাপকে বলা হয় "জঙ্গিবাদ। এরূপ বিভাজন বা পার্থক্যের কোনো ভাষাগত বা তথ্যগত ভিত্তি আছে বলে জানা যায় না। বরং চরমপন্থী, উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী ও বর্তমান জঙ্গি একক সূতায় গাথা।

সন্ত্রাসের পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ: 'সন্ত্রাস' শব্দটি 'ত্রাস' থেকে উদ্ভূত। ত্রাস অর্থ হ'ল ভয়, ভীতি, শংকা।[১] আর সন্ত্রাস অর্থ হচ্ছে মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয়[৪] আতঙ্কগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা।[২] সন্ত্রাস শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হ'ল- terror, Extreme fear- যৎপরোনাস্তি আতঙ্ক, সন্ত্রাস ইত্যাদি। আর Terrorism হচ্ছে সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি, সন্ত্রাসবাদ। Terrorist অর্থ সন্ত্রাসী। Terrorize সন্ত্রাসিত করা, ভয় দেখিয়ে শাসন করা।[৩] সন্ত্রাসের আরবী প্রতিশব্দ আল-ইরহাব।[৪] আল-ইরহাব অর্থ কাউকে ভয় দেখানো বা সন্ত্রস্ত করে তোলা।[৫] পবিত্র কুরআন মাজীদে ভয় অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[৬]

---

১. বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১ম প্রকাশ ১৯৯২), পৃ. ২৬৬

২. শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২য় সংস্কারণ: ১৩৯৯/১৯৯২ ইং), পৃ. ১০২৪

৩. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২২তম মুদ্রণ, ১৯৯৮ খৃ), পৃ. ৬৬১ Bangla Academy Bengali-English Dictionary, (Dhaka: Bangla Academy, Ist Edi 1401/1994), p. 786; Samsad English Dictionary (Calcutta: Sahitya Samsad, 1980) p. 1168.

৪. আবু তাহের মেসবাহ সম্পাদিত আল-মানার বাংলা আরবী অভিধান (ঢাকা: মোহম্মাদী লাইব্রেরী, ১৯৯০ইং) পৃ. ১২৪২।

৫. আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব (দিল্লী: দারু লিইশাআতিল ইসলামিয়াহ, তাবি), পৃ. ৩৭৬।

৬. সূরা আল-বাক্বারাহ: ৪০; সূরা আল- আ'রাফ: ১৫৪; সূরা আল-আনফাল ৬০; সূরা আল-নাহল ৫১; সূরা আল-আম্বিয়া: ৯০

পারিভাষিক অর্থ: পারিভাষিক অর্থে সন্ত্রাস হ'ল যে কোন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য সংঘবদ্ধভাবে ভয় দেখিয়ে বশ মানানোর নীতি অবলম্বন করা।[১]

১. যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী বলেন,

'ইরহাব (সন্ত্রাস) একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ, যার অনেক অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে শামিল হচ্ছে-নিরপরাধ নির্দোষ মানুষকে ভয় দেখানো ও শঙ্কিত করা। কখনো নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে হত্যার সীমাহীন ভীতি প্রদর্শন, সুরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট বা লুট, সতী-সাধবী নারীর সম্ভ্রমহানি করা, মুসলিম জাতির ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করা বা একতা বিনষ্ট করা।[২]

২. 'রাবিত্বাতুল আলামিল ইসলামী' পরিচালিত 'ইসলামী ফিক্বহ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরীতে মক্কায় অনুষ্ঠিত ১৬তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, 'কোন ব্যক্তি, সঙ্গান বা রাষ্ট্র কোন মানুষের ধর্ম, বুদ্ধিমত্তা, সম্পদ ও সম্মানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে।'[৩]

৩. ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ স্বীকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে 'অসৎ ও অশুভ উদ্দেশ্য সংঘটিত প্রত্যেক অপরাধমূলক কাজ তা যেখানে যার দ্বারা সম্পন্ন হোক না কেন তা অবশ্যই নিন্দা, তিরস্কার ও ভর্ৎসনাযোগ্য।[৪]

৪. ১৯৮৯ সালে আরব দেশ সমূহের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ প্রদত্ত সংজ্ঞা হচ্ছে-'সহিংসতা সৃষ্টিকারী বা হুমকি-ধমকি প্রদানকারী এমন সব কাজ যা দ্বারা মানবমনে ভীতি-আতঙ্ক, ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি হয়। তা হত্যাকাণ্ড, ছিনতাই, অপহরণ, গুপ্তহত্যা, পণবন্দী, বিমান ও নৌজাহাজ ছিনতাই বা বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতির যে কোনটির মাধ্যমে হোক না কেন। এছাড়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংঘটিত যেসব কাজ ভীতিকর অবস্থা ও পরিবেশ, নৈরাজ্য বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে (তাও সন্ত্রাস)'।[৫]

৫. The New Encyclopaedia Britannica গ্রন্থে বলা হয়েছে, Terrorism, the systematic use of violence to create a general

---

১. সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, পৃ. ৬৬১; বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, পৃ. ৫৪১

২. যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী, আল-ইরহাব ওয়া আছারুহু আলাল আফরাদ ওয়াল উমাম (দাম্মাম: দারু সাবীলিল মুমিনীন, ১ম প্রকাশ, ১৪১৮ হি.), পৃ. ১০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৪. আল-ফুরক্বান ৪৮৬তম সংখ্যা, পৃ. ৪১

৫. আল-ফুরক্বান, এপ্রিল /০৮, ৪৮৬তম সংখ্যা, পৃ. ৪১

climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective.

"একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করার সুসংগঠিত পন্থাই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ"।[১]

৬. মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI -এর মতে terrorism is the unlawful use of force or violence against person of property to intimidate or coerce a government, the civilian population or any segment there of in furtherance of political or social objectives.

অর্থাৎ সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কোন সরকার, বেসরকারী জনগণ বা অন্য যে কোন অংশকে ভীতি প্রদর্শন বা দমনের জন্য ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের উপর অবৈধ শক্তি প্রয়োগ বা সহিংস ব্যবহারকে সন্ত্রাস বলা হয়।[২]

মোটকথা যে কর্মকাণ্ড জনগণের মধ্যে ভয়, ভীতি, ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং জানমালের বিনাশ সাধন করে, সেটাই সন্ত্রাস। যে বা যারা এসব কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত তারাই সন্ত্রাসী।

ইসলামে দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ:-

ইসলামে মানুষ হত্যা হারাম:

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী ও তাকে হত্যা করা কুফরী"।[৩]

সুতরাং সন্ত্রাসী ও জঙ্গিরা যে বর্বরোচিত ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চালিয়ে থাকে তা ইসলাম সমর্থন করে না।

ইসলামে মানুষকে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম:

মানুষকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করা ইসলামে জায়েয নয়। তেমনি তাকে হত্যার হুমকি দেয়াও ইসলামে নেহায়েত অন্যায়। এমনকি একজন মুসলমান অপর মুসলমানকে হাত ও মুখ দ্বারা কোনভাবে কষ্ট দিতে পারে না। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

---

১. The New Encycopaedin Britannica (USA:2002), vol. p.650

২. ফোরকান আলী, সন্ত্রাসবাদ: ক্ষমতার লড়াইয়ের হাতিয়ার, দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ জুন ২০০৭, পৃ. ১৪

৩. সহীহ আল-বুখারী, ৪৮১৪

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُمْ كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীগণ বলেছেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সফর করতেন। এক রাতে তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন সময়ে তাদের এক সঙ্গী রশির দিকে অগ্রসর হল, যা ঐ ঘুমন্ত লোকটির নিকট ছিল এবং এই লোক সে রশিখানা হাতে নিয়ে নিল। হঠাৎ ঘুমন্ত লোকটি ঘুম হতে উঠে রশিসহ ঐ লোকটিকে নিজের কাছে দেখে ভীষণভাবে ভয় পেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কোন মুসলমানের জন্য এটা জায়েয নয় যে, অন্য কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করবে'।[১]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে ভীতি প্রদর্শন করা হারাম। কাজেই বিভিন্ন স্থানে বোমা মারার হুমকি দিয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করা জায়েয নয়।

ইসলামে অস্ত্র উত্তোলন করা নিষিদ্ধ:

কোন মুসলমানকে হত্যা করা কুফরী এবং তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হারাম। তেমনি মুসলিম ব্যক্তির প্রতি অস্ত্র উত্তোলন করাও ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। এসম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[২]

ইসলামে আত্মঘাতী হামলা অবৈধ:

আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। দ্বীনের নামে আত্মহত্যাকারীরাও জাহান্নামী। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে জিহাদে অংশগ্রহকারী আত্মহত্যাকারী সাহাবীকেও জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

১. সুনান আবু দাউদ: ৫০০৪; হাদীছ সহীহ, মিশকাত: ৩৫৪৫

২. সহীহ আল-বুখারী: ৭০৭০; সহীহ মুসলিম: ৯৮

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না এবং কল্যাণকর কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণকারীদেরকে ভালোবাসেন"।[১]

আত্মহত্যা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, ছাবিত ইবনু যাহহাক রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করে জাহান্নামে তাকে লৌহাস্ত্র দ্বারা সর্বক্ষণ শাস্তি দেয়া হবে"।[২]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الَّذِى يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِى النَّارِ ، وَالَّذِى يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِى النَّارِ

"যে ব্যক্তি শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ করে আত্মহত্যা করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করবে সে জাহান্নামে সর্বক্ষণ অস্ত্রের আঘাতে আত্মহত্যা করতে থাকবে"।[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

"যে ব্যক্তি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে তাকেও জাহান্নামে অনুরূপভাবে আঘাত করা হবে"।[৪]

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি যা দ্বারা আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে সে বস্তু তার হাতে থাকবে এবং সে তথায়

---

১. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৯৫

২. সহীহ আল-বুখারী: ১ম খণ্ড, ১৮২

৩. সহীহ আল-বুখারী: ৩৪৫৪, 'কিছাছ' অধ্যায়

৪. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-জানাইয, অনুচ্ছেদ: মা জা'আ কাতিলিন নাফস, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৯

সর্বক্ষণ তা দ্বারা আত্মহত্যা করতে থাকবে। এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হবে চিরস্থায়ী বাসস্থান। দ্বীনের নামে কেউ আত্মহত্যা করলেও তার পরিণতি হবে অভিন্ন। সুতরাং দ্বীনের নামে এসব আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরাও জাহান্নামে একইভাবে আত্মহত্যা করতে থাকবে এবং তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে।

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করলেন, তখন তোফাইল ইবনু আমর দাওসীও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হিজরত করে আসলেন। তার সাথে তার স্বগোত্রীয় আরেক ব্যক্তি হিজরত করে এসেছিলেন। সে এক পর্যায়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থতার দরুণ লোকটি অস্থির হয়ে ছুরি দ্বারা তার হাতের গিরা কেটে ফেলল। ফলে এমনভাবে হাত হতে রক্তক্ষরণ হল যে এতেই তার মৃত্যু হল। পরে তোফাইল ইবনু আমর তাকে স্বপ্নে দেখলেন যে, তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থা এবং বেশভূষা খুবই সুন্দর কিন্তু তার হাত দু'খানা কাপড় দ্বারা ঢাকা। তখন তোফাইল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রব তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? লোকটি বলল, আল্লাহ আমাকে তাঁর নবীর নিকট হিজরত করার কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তোফাইল আবার জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার আমি তোমার হাত দু'খানা ঢাকা দেখছি কেন? সে বলল, আল্লাহর পক্ষ হতে আমাকে বলা হয়েছে, তুমি স্বেচ্ছায় যা নষ্ট করেছ, আমি তা কখনো ঠিক করব না। এ স্বপ্ন দেখার পর তোফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘটনার পূর্ণ বিবরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার হাত দু'খানাকেও মাফ করে দাও।[১]

এ হাদীস দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মহত্যা তো দূরের কথা কোন মানুষই তার নিজের শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কোন অঙ্গই নষ্ট করতে পারে না। কেননা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করা বা অকেজো করা হারাম। যদি কোন ব্যক্তি তার কোন অঙ্গ নষ্ট করে, তাহলে আল্লাহ তার সে নষ্ট অঙ্গকে পরকালে ঠিক করে দিবেন না। কাজেই আত্মঘাতী বোমাবাজরা ক্ষমা পাবে এ আশা করা যায় না।

---

১. সহীহ মুসলিম: ৩৪৫৬

জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত

১. সউদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের এক ফৎওয়ায় বলা হয়েছে,

'শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রমাণিত হয় যে কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং ব্যক্তিগত বা সরকারী সম্পত্তি যেমন বাসস্থান, মসজিদ, মাদ্রাসা, মেডিকেল, কারখানা, ব্রিজ-কালভার্ট, অস্ত্রাগার, পানি সংরক্ষণাগার, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়ের উৎস যেমন পেট্রোলের পাইপ, বিমান বিধ্বংস করা বা ছিনতাই করা ইত্যাদি নাশকতামূলক ও শান্তি বিঘ্নিতকারী কোন সন্ত্রাসী কাজ করেছে, তবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা।'[১]

২. সউদী আরবের সাবেক গ্র্যাণ্ড মুফতী শায়খ আবদুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনে বায রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

'আল্লাহ্র পথে দাওয়াত হতে হবে উত্তম পন্থায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও হাদীসে যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম এই যে, আল্লাহর পথে দাওয়াতের মাধ্যম হচ্ছে উপদেশ প্রদান, বক্তব্য উপস্থাপন, উৎসাহ দান এবং আল্লাহভীতি সৃষ্টি করা, যেভাবে মক্কায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীগণ তাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে করেছিলেন। তারা অস্ত্রের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে লোকদেরকে দাওয়াত দেননি। গুপ্তহত্যা অথবা মারধর করে দাওয়াতী কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ছাহাবীগণের তরীকা নয়।'[২]

৩. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেন,

'সাধারণ মানুষ মুসলমান ও যিম্মীদেরকে হত্যা করা, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত লোকদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা, মহিলাদেরকে বিধবা করা, শিশুদেরকে ইয়াতীম করা এবং স্থাপনা ধ্বংস করা কোন জ্ঞান ও দ্বীনের আলোকে জিহাদ হতে পারে?'[৩]

---

১. মুহাম্মদ বিন হুসাইন বিন সাঈদ আলে সুফরান আল-ক্বহতানী সংকলিত ও ড. ছালেহ বিন ফাওযান আল- ফাওযান সম্পাদিত, ফাতাওয়াল আইম্মাহ ফিন-নাওয়াযিল আল-মুদলাহাম্মাহ (রিয়াদ: ১৪২৪ হি), পৃ. ১৪

২. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমুউ ফাতাওয়া

৩. আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ, বিআইয় আক্বলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীরু ওয়াত তাদমীরু জিহাদান (রিয়াদ: দারুল মুগনী, ১৪২৪ হি/ ২০০৩ খৃ:), পৃ: ১৬)

৪. সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ এক ফৎওয়ায় বলেছে,

'ইসলাম এহেন ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে মুক্ত। আর কতক মুসলিম দেশে নিরপরাধ ব্যক্তিদের রক্তপাত, বাসস্থান ও গাড়ীতে বিস্ফোরণ ঘটানো, স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করা ইত্যাদি যা ঘটছে তা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড। আর ইসলাম এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সকল খাঁটি মুসলিম এথেকে মুক্ত। এগুলি তো কেবল ভ্রান্ত আক্বীদাহ ও বিকৃত চিন্তাধারার রোকদের কাজ। সুতরাং এসব কাজের পাপ ও দায়ভার তাদেরকেই বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে এসবের দায়ভার ইসলামের উপর কিংবা কিতাব ও সুন্নাহ্‌র সুদৃঢ় রশির ধারক-বাহক খাঁটি মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার কোনই সুযোগ নেই। এসবতো কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মক ও পাপ কাজ, যা শরী'আহ বহির্ভূত ও বিবেক বর্জিত।[১]

৫. সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য ড. ছালেহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান বলেন,

কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনা গুপ্তহত্যা জায়েয বা বৈধ হওয়ার দলীল নয়। কারণ কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশ যিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। কা'বের সাথে নিরাপত্তা চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু তার পক্ষ হতে নিরাপত্তা চুক্তি লঙ্ঘিত হওয়ার মুসলমানদেরকে তার অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তাকে হত্যা করা বৈধ হয়েছিল। তাকে হত্যার বিষয়টি রাষ্ট্রের পরিচালককে বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষ হতে ছিল না। যেমনটি বর্তমান যুগের গুপ্ত হত্যাগুলোর ক্ষেত্রে ঘটনা। ইসলাম ও মুসলমানদের ভাগ্যে অভাবনীয় ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকায় এরূপ তৎপরতাকে ইসলাম আদৌ সমর্থন করে না।[২]

উপসংহারঃ

কুরআন ও হাদীসের উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইসলামে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নেই। যারা ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের নামে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত, প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বোমা হামলা করে হত্যাযজ্ঞ করে তারা নিছক সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কাজ করছে। যারা এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারা ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন। ইসলাম জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মুক্ত।

---

১. সউদী আরবের ওযারাতুশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ ওয়াল- আওক্বাফ ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ কর্তৃক প্রকাশিত 'বায়ানু হায়আতি কিবারিল ওলমা হাওলা খুতূরাতিত তাসাররু' ফিত-তাকফীর ওয়াল কিয়াম বিত তাফজীর' (আরবী) শীর্ষক লিফলেট, পৃ: ৭

২. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমুউ ফাতাওয়া

ইসলাম প্রচারের শান্তিময় উপকরণ এবং সন্ত্রাস দমনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কর্মপন্থা

وسائل السلام لدعوة الإسلام والمنهج النبوى لمكافحة الإرهاب

মোখতার আহমাদ

সহযোগী অধ্যাপক

আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

১. ভূমিকা:

সন্ত্রাস বর্তমান সময়ের সর্বাধিক দুরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। মাসজিদ-এর পবিত্র অঙ্গন থেকে শুরু করে নিষ্পাপ শিশুদের শিক্ষাকানন এবং একান্ত সাধারণ পারিবারিক অনুষ্ঠানও আজ সন্ত্রাসের করাল থাবায় ক্ষত-বিক্ষত। কালের প্রবাহে এর রূপের ব্যাপক রূপান্তর হয়েছে, এর গতি-প্রকৃতির অভাবিত পরিবর্তন ঘটেছে, এবং এর পরিধি বিশালভাবে বিস্তৃত হয়েছে। লাশের মিছিল বাড়ছে প্রতিনিয়তই, স্বজন-সম্পদ-সম্ভ্রমহারাদের গগণবিদারী চিৎকারে ভারী এবং ভয়ংকর অপরিচিত হয়ে ওঠছে পরিচিত আবহ। মানবসভ্যতা চাপা পড়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসের নিত্যঘটিত ধ্বংসস্তুপে, ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে মানবতা। কখনও ধর্মের নামে, কখনো আবার ধর্মের বিরুদ্ধে চলছে এই সর্বগ্রাসী সন্ত্রাস। পৃথিবীর তাবৎ পরাশক্তি, সকল বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সিভিল সোসাইটি, সিকিউরিটি, এক্সপার্ট, ক্রিমিনোলজি স্পেশালিস্ট, সমাজবিদ, সমরবিদ, আইনবিদ ও ধর্মগুরুগণ একত্রিত হয়েও এর কোনো সুরাহা-সমাধান বের করতে পারেননি। সকল পথ্য-ফর্মুলাই এখানে ব্যর্থ, আর সন্ত্রাসের কালোছায়া অবিরাম বিস্তৃত হচ্ছে। আজকের বিষাদময় সমাজের চিত্র আমাদের বিশ্বাসকে আরো প্রগাঢ় করছে যে, প্রাচীন আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের সন্ত্রাসকবলিত সমাজকে যে ব্যবস্থা তুড়ির আঁচড়ে বিদূরিত করেছিলেন সেই সিস্টেমের পুনর্ব্যবহারই নব্য জাহেলী সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে পারবে।

২. সন্ত্রাসের পরিচিতি:

বর্তমান মহাবিরোধপূর্ণ বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে সন্ত্রাস-এর সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সংজ্ঞা নিরূপণ করা যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এর কোনো সমন্বিত সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রায় অসম্ভবই বটে। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হিসেবে Terrorism, আর আরবিতে 'ইরহাব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা FBI সন্ত্রাসকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে,

"..the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives".[১]

---

১. (28.C.F.R.Section 0.85)www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005

অর্থাৎ- সন্ত্রাস হলো...'সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যাবলী হাসিলের লক্ষ্যে কোন সরকার, বেসামরিক জনগণ, অথবা সমাজের অন্য যে কোন অংশকে ভীত বা বাধ্য করতে ব্যক্তিবর্গ বা সম্পদের উপর অন্যায় শক্তি ও সহিংসতার প্রয়োগ'।

১৯৯৯ সালে গৃহীত সন্ত্রাস বিষয়ক ও.আই.সি কনভেনশন "the Convention of the Organisation of the Islamic Conference on Combating International Terrorism" সন্ত্রাসকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে :

'মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা বা তাদের কোন ক্ষতি করার হুমকি বা তাদের জীবন, সম্মান, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা বা অধিকারকে বিপন্ন করা অথবা পরিবেশ বা কোনো সুবিধা বা ব্যক্তিগত সম্পদ ক্ষতির সম্মুখীন করা অথবা সেগুলো জবরদখল করা, অথবা কোনো জাতীয় সম্পদ, বা আন্তর্জাতিক সুবিধাবলী বিপন্ন করা, অথবা স্থিতিশীলতা, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা, রাজনৈতিক ঐক্য বা স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌমত্ব হুমকিগ্রস্থ করা-ইত্যাদি যে কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অপরাধমূলক পরিকল্পনায় পরিচালিত সকল সহিংসতা সৃষ্টিকারী বা হুমকি-ধমকি প্রদানকারী কাজকেই সন্ত্রাস বলা হয়'।

৩. সন্ত্রাস ও ইসলাম :

৩.১ প্র্যাক্টিক্যাল দিকসমূহ:

৩.১.১ আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনাচরণ ও সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সন্ত্রাস দমনে তার গৃহীত নীতিমালার দিকে তাকাই, তবে দেখবো তিনি তার রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম সুযোগেই সন্ত্রাস নির্মাণে সকল জাতি-গোষ্ঠী, শ্রেণী-পেশার লোকদের নিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী ঐক্য বিনির্মাণ ও সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন। মানবেতিহাসে প্রথম লিখিত (The First Written Constitution of the World) সংবিধান হিসেবে খ্যাত মদীনার সনদের (The Charter of Madinah) ৫৭টি ধারার প্রধানতম কয়েকটি ছিল সন্ত্রাস সম্পর্কিত। বাংলাদেশের বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা কে আলী তার A Study of Islamic History গ্রন্থের Provisions of the Charter পরিচ্ছেদে মদীনার সনদকে আটটি পয়েন্টে সারসংক্ষেপ করেছেন, তন্মধ্যে চারটিই সন্ত্রাসের কারণ ও দমনের সাথে সম্পর্কিত।

(৪) মদীনায় বসবাসরত মুসলিম, ইয়াহূদী, ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মমত প্রচার ও প্র্যাকটিস করতে পারবে, এতে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

(৫) কোনো অমুসলিম কর্তৃক সংঘটিত কোনো তুচ্ছ অপরাধকে সেভাবেই দেখতে হবে, এবং কোনো অবস্থায়ই অপরাধী ব্যক্তির জাতি বা পরিবার তার জন্য দায়ী হবে না।

(৬) মজলুমকে সম্মিলিতভাবে রক্ষা করতে হবে।

(৭) এখন থেকে মদীনায় সকল রক্তপাত, খুনাখুনি, এবং সন্ত্রাস নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হলো...

মদীনার সনদে সন্ত্রাসকে এত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখানোয় আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সাথীরাই তৎকালীন সমাজে অপরিমেয় সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিলেন। ফলে প্রথম সুযোগেই সন্ত্রাসের কারণ নিরূপণ করে সাংবিধানিকভাবে তার প্রকাশের দ্বার রুদ্ধ করে দেন এবং প্রতিকারের সকল উপকরণ উদ্ভাবন করেন।

৩.১.২ রশীদ রেজা তার তাফসীর আল-মানার গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে আল-কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৬তম আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলেন, মদীনার আনসার সাহাবায়ে কিরামের একদল যারা পূর্বে ইয়াহূদী অথবা খৃষ্টান ছিলেন তারা ইসলাম গ্রহণের পর অথবা সন্ত্রাসের কারণে মদীনার ইয়াহূদী গোত্র বনু নাদীরকে মদীনা থেকে বহিস্কারের সময় আনসার সাহাবীদের মধ্যে যাদের আত্মীয়-স্বজন বনু নাদীর গোত্রে ছিল তারা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন, যাতে তারা তাদের অমুসলিম অথবা ইয়াহূদী আত্মীয়দের জোরপূর্বক ইসলামে দীক্ষিত করতে পারেন। তাৎক্ষণিকভাবে কুরআনের আয়াত নাযিল হয় :

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"ধর্মে জবরদস্তি নেই, নিঃসন্দেহে সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট করা হয়ে গেছে। অতএব যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্তে ঈমান আনে সেই তবে ধরেছে একটি শক্ত হাতল, তা কখনো ভাঙ্গবার নয়। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা"।[১]

৩.১.৩ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় সর্ববৃহৎ সমাবেশ বিদায় হজ্জের আবেগঘন পরিবেশে, তার জীবনের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে সন্ত্রাসের মূলে কুঠারাঘাত করলেন, যাতে মানবসমাজ থেকে সন্ত্রাস চিরতরে নির্বাসিত হয়। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন :

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্ : ১৫৬

يا أيها الناس هل تدرون فى أي شهر أنتم وفي أي يوم أنتم وفي أي بلد أنتم ؟ فقالوا فى يوم حرام وبلد حرام وشهر حرام , قال : فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا وفى بلدكم هذا الى يوم تلقونه , ثم قال: اسمعوا ألا لاتظلموا, ألا لاتظلموا ، إنه لايحل مال امرئ مسلم إلابطيب نفس منه ، ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة

"লোক সকল! তোমরা কি জান কোন মাস, কোন দিন এবং কোন শহরে আছ তোমরা ? জবাবে লোকেরা বলল, সম্মানিত দিনে, সম্মানিত শহরে এবং সম্মানিত মাসে আমরা আছি। তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের সম্মান, সম্মানিত যেমন সম্মানিত আজকের এই দিন, এই মাস ও এই শহর। অতঃপর বললেন, আমার কথা শোন যাতে তোমরা সহীহ-শুদ্ধ জীবন যাপন করতে পার। সাবধান! তোমরা জুলুম করবে না। সাবধান! তোমরা জুলুম করবে না। খবরদার! তোমরা জুলুম করবে না। আর কোন মুসলমানের ধন-সম্পত্তি থেকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। সর্বপ্রকার রক্ত, সব ধরনের ধন-সম্পদ, যা জাহিলী যুগ থেকে চলে আসছে- তা কিয়ামত পর্যন্ত বাতিল ঘোষিত হল।"

আরাফাতের বিস্তীর্ণ ময়দানে সমবেত জনতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই আহ্বানকে বক্ষে ধারণ করে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েন, এবং অচিরেই তৎকালীন পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকজুড়ে সন্ত্রাসমুক্ত শান্ত-প্রশান্ত সমাজ-সভ্যতা বিনির্মাণ করেন, যা সহস্রাধিক বছরের বেশী সময় ধরে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধিতে বসুন্ধরাকে সজীব করে রেখেছিল।

৩.২ থিওরেটিক্যাল দিকসমূহ:

৩.২.১ আল-কুরআনে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ :

আল-কুরআনে ইরহাব শব্দটি ব্যবহৃত হলেও প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাস বলতে যা বুঝায় এই শব্দটি সেই অর্থে আসেনি। তবে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বুঝাতে কুরআনে 'ফিতনাহ' এবং 'ফাসাদ' শব্দদ্বয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। আল-কুরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ফিতনাহ-ফাসাদ সংঘটকদের পার্থিব-অপার্থিব শাস্তির কথাও উল্লেখ করেছেন।

আল-কুরআনে 'ফিতনা' শব্দটিও বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে যেসব আয়াতে 'ফিতনা' শব্দটি সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের এর কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ হলো-

১। দুর্বলের উপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর-বাড়ি জবরদখল করা এবং তাদের বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়াও ফিতনার আওতাভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

"যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতঃপর জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এসবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[১]

২। অসত্যের প্রতিষ্ঠা, অসৎ ও অবৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুদ্ধ, হত্যা ও রক্তপাত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾

"যদি বিভিন্ন দিক হতে তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের প্রবেশ ঘটত, অতঃপর তাদেরকে বিদ্রোহের জন্য প্ররোচিত করা হতো, তবে তারা অবশ্য তাই করত, তারা এতে কালবিলম্ব করত না"।[২]

অনুরূপভাবে আল-কুরআনে 'ফাসাদ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে সব আয়াতে 'ফাসাদ' শব্দটি সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থ প্রদান করছে তার কয়েকটি উদাহরণ হলো :

১। অন্যায় শাসন ও হত্যাকাণ্ড, দুর্বলদের প্রতি অবিচার ও সম্পদ লুটপাট করা। আল-কুরআনে আল্লাহ ফির'আউনকে 'ফাসাদ' সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ সে তার প্রজাদের মাঝে শ্রেণী ও বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতো এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাতো, দুর্বলদের ও বিরোধীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতো এবং তাদের সম্পদ লুট করতো।

কুরআনে এসেছে:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

---

১. সূরা আন-নাহ্ল : ১১০
২. সূরা আল-আহযাব : ১৪

"ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী"।[১]

২। অন্যায়ভাবে বা পৃথিবীতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করা সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾

"মানব হত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করার কারণ ব্যতীত কেউ কাউকেও হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল"।[২]

৭। পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের শাস্তি ও পরিণতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় এটা তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ হতে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি"।[৩]

৩.২.২ আল-হাদীসে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ :

আল-হাদীসে সন্ত্রাস শব্দটির সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হয়েছে, যা সরাসরি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃত। এবং হাদীসে এসব কার্যকলাপের পার্থিব ও অপার্থিব শাস্তির কথাও উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া আল-হাদীসে সন্ত্রাসের কয়েকটি পরিভাষার ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন, আল-কত্‌লু বা হত্যা, আয-যুলম বা অত্যাচার, আত-তারভী বা ভয় প্রদর্শন, হামলুছ

---

১. সূরা আল-কসাস্ : ৪
২. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২
৩. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩৩

ছিলাহ বা অস্ত্র বহন করা, আল-ইশারাতু বিছ-ছিলাহ বা অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা ইত্যাদি। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো।

১। পারস্পরিক অত্যাচার, যুলম নির্যাতন করা নিষিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا

"হে আমার বান্দাহ্গণ! আমি আমার জন্য যুলুম হারাম করেছি এবং তা তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর যুলুমে লিপ্ত হয়ো না"।[১]

২। অন্যায়ভাবে কারো রক্তপাত, সম্পদ ও সম্মানহানী করা নিষিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য ঐরূপ হারাম যে রূপ হারাম তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই দিন"।[২]

৩। মুসলিমদের আতঙ্কিত করা অবৈধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

"কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়"।[৩]

৪। মুসলিম ব্যক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণকারী ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর সদস্য নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।[৪]

---

১. সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ: তাহরীমুয যুলুম, বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৯৯৪

২. সহীহ্ মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ: তাহরীমুয যুলুম, বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৯৯৪

৩. সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ: মাই ইয়াখুযুশ শাইআ 'আলাল মিযাহি, বৈরূত: দারুল কিতাব আল-আরাবিয়্যা, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ৪৫৮

৪. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আদ-দিয়াত, অনুচ্ছেদ: কওলুল্লাহি তা'আলা ওয়া মান আহইয়াহা/আল-মায়িদাহ- ৩২, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫২০

৫। কোন মুসলিমকে অস্ত্র দ্বারা হুমকি দেয়া হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ

"তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা হুমকি না দেয়। কেননা হতে পারে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও শয়তান তার হস্তদ্বয় আঘাত হানার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটবে; অতঃপর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"।[১]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

"কোন ব্যক্তি যদি লোহা দ্বারা তার ভাইকে হুমকি দেয় তবে তা থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত ফিরিশতাগণ তার প্রতি অভিশাপ করতে থাকেন যদিও হুমকি প্রদানকৃত ব্যক্তি তার সহোদর ভাই হয়"।[২]

৬। আত্মঘাতী হামলা করা এবং এর মাধ্যমে আত্মহত্যাও হারাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজেকে কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে"।[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন:

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ

"যে ব্যক্তি নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করবে তাকে জাহান্নামে অনুরূপভাবে শাস্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে আত্মহত্যা করবে তাকেও জাহান্নামে অনুরূপভাবে আঘাত করা হবে"।[৪]

---

১. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-ফিতান, অনুচ্ছেদ: কওলুন্নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মান হামালা আলান্নাস সিলাহা ফা লাইসা মিন্না, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫৯২

২. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: আল- বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদব অনুচ্ছেদ: আন-নাহইউ আনিল ইশারাতি বিসসিল্লাহি ইলা মুসলিমিন, প্রাগুক্ত, তা.বি, খ. ৪, পৃ. ২০২০

৩. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-আদাব, অনুচ্ছেদ: মা ইউনহা 'আনিস সিবাবি ওয়াল লা'নি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২২৪৭

৪. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-জানাইয, অনুচ্ছেদ: মা জা'আ কাতিলিন নাফস, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪৫৯

৭। শুধু মুসলিম ব্যক্তি নয়, কোন চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমে হত্যা করাও নিষিদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا

"যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদে বসবাসকারী চুক্তিবদ্ধ কোন অমুসলিমকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব হতেও তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে"।[১]

৪। ইচ্ছাকৃত কোন মু'মিনকে হত্যা করা বড় গুনাহসমূহের অন্যতম যার গুনাহ আল্লাহ মা'ফ করবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا

"আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপনকারী ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যার গুনাহ ব্যতীত অন্য যে কোন গুনাহ্‌কে আল্লাহ হয়তো ক্ষমা করে দিবেন"।[২]

৯। অন্যায়ভাবে কোনো মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যাকারীর কোন ইবাদত কবুল করা হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আল্লাহ্ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবুল করবেন না"।[৩]

১০। নিষিদ্ধ পন্থায় অন্যের রক্তপাত ঘটানো মু'মিনকে উচ্চ মর্যাদা থেকে পদস্খলিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقًا صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

"মু'মিন ব্যক্তি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন জীবন-যাপন করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হারাম পন্থায় অন্যের রক্তপাত না ঘটাবে"।[৪]

---

১. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায়: আল-জিযইয়া ওয়াল মাওয়াদিআতি, অনুচ্ছেদ: ইছমু মান কাতালা মু'আহিদা বিগাইরি জুরম, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১১৫৫

২. সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়: আল ফিতান, অনুচ্ছেদ: ফী তা'যীমি কতলিল মু'মিনি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭

৩. সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়: আলফিতান, অনুচ্ছেদ: ফী ত'যীমি কতলিল মু'মিন, প্রাগুক্ত, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৬৭

৪. সুনান আবু দাউদ, অধ্যায়: আলফিতান, অনুচ্ছেদ: ফী তা'মীমি কাতলিল মু'মিন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৬৭

৪.০ সন্ত্রাস ও ইসলাম প্রচার :

৪.১ ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচার :

ইসলাম শব্দের অর্থ যেমন শান্তি, এর মিশন-ভিশনও হলো মানবজীবনের দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, তেমনি এর প্রচার-প্রসারের সকল আয়োজন উপকরণও শান্তিময়। সর্বশেষ আসমানী ধর্ম হওয়া স্বত্ত্বেও পৃথিবীজুড়ে এর অনুসারীর সংখ্যা সর্বাধিক এবং সবচেয়ে বেশী দেশ-মহাদেশ-অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এর অধিবাসীদের অবস্থান।

পৃথিবীজুড়ে ইসলামের এই ব্যাপকতা কোনরূপ শক্তি বা ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ঘটেনি, যেমনি অন্যান্য ধর্মের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। একান্তই ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্যে এবং মুসলিম দাঈ'দের মানবতা ও চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। ঐতিহাসিক ডি কে ও ল্যারি অকপটেই তা স্বীকার করেছেন :

"History makes it clear however, that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated."

ইতিহাস স্পষ্ট করেই বলে দিচ্ছে যে, উগ্র মুসলিমদের কর্তৃক পৃথিবীজুড়ে বিজয় এবং বিজিত জাতির উপর তলোয়ারের মুখে ইসলাম চাপিয়ে দেয়ার যে কল্পকাহিনী ইতিহাসবিদরা যুগযুগ ঘরে প্রচার করে আসছেন তা চূড়ান্ত হাস্যকর মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪.২ ঐতিহাসিক দলীল :

ইন্দোনেশিয়া হলো সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ, অধিকাংশ মালয়রা মুসলিম, অথচ কোনো মুসলিম সেনাপতি এ দেশে গমন করেননি। ইসলামের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে এরা মুসলিম হয়েছেন। অন্যদিকে, পৃথিবীর বহু দেশ থেকে ইসলামী শাসনের বিলুপ্তি ঘটলেও সেখানকার মূল অধিবাসীদের অনেকেই মুসলিম থেকে যান, এবং অন্যদের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে বিভিন্ন যুলম নির্যাতনের শিকারও হন। সিরিয়া, জর্ডান, মিশর, ইরাক, উত্তর আফ্রিকা, এশিয়া, বলকান অঞ্চল ও স্পেন একিই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম তলোয়ার নয় বরং শান্তি, মানবতা, ও নৈতিকতার জোরেই এর বিস্তৃতি ঘটেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদীরা যেখানেই গিয়েছে সেখানকার অধিবাসীরা আজও তাদের প্রতি কৃত যুলম, নির্যাতন, সন্ত্রাস ও লাঞ্ছনার ইতিহাস ভুলতে পারেন নি।

অন্যদিকে মুসলিমরা স্পেন ৮শত বছর, ভারত প্রায় হাজার বছর, এবং আফ্রিকা ১৩শত বছরেরও বেশী সময় ধরে শাসন করলেও সেখানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ও জোরপূর্বক ইসলাম প্রচারের কোনো অভিযোগ কেই কখনোই আনেন নি, এবং মুসলিমদের শাসনের বিলুপ্তির পর দেখা যায় এসকল অঞ্চলে অধিবাসীরা শতভাগ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার ফলে অধিবাসীদের বিশাল অংশ অমুসলিমই থেকে গিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যসহ আরবের সকল দেশেই (যেমন মিশর, মরক্কো, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, ফিলিস্তিন) এখনো ব্যাপক পরিমাণ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানের বসবাস রয়েছে।

মুসলিম শাসকদের মাধ্যমে এক সহস্রাব্দ শাসিত ভারতের কিংবদন্তী নেতা মহাত্মা গান্ধী স্বগোক্তিতে স্বীকার করেছেন :

"I wanted to know the best of the life of one who holds today an undisputed sway over the hearts of millions of mankind... I became more than ever convinced that it was not the sword that won a place for Islam in those days in the scheme of life. It was the rigid simplicity, the utter self-effacement of the Prophet the scrupulous regard for pledges, his intense devotion to his friends and followers, his intrepidity, his fearlessness, his absolute trust in God and in his own mission. These and not the sword carried everything before them and surmounted every obstacle. When I closed the second volume (of the Prophets biography), I was sorry there was not more for me to read of that great life;"

আমি জীবনগুলোর মধ্যে সেরা একজনের জীবন সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম যিনি আজ লক্ষ-কোটি মানুষের হৃদয়ে অবিতর্কিতভাবে স্থান নিয়ে আছেন। যে কোন সময়ের চেয়ে আমি বেশী নিশ্চিত যে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে সেইসব দিনগুলোতে মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতিতে স্থান করে নেয়নি। ইসলামের প্রসারের কারণ হিসেবে কাজ করেছে নবীর দৃঢ় সরলতা, নিজেকে মূল্যহীন প্রতিভাত করা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে সতর্ক ভাবনা, বন্ধু ও অনুসারীদের জন্য নিজেকে চরমভাবে উৎসর্গ করা, তাঁর অটল সাহস, ভয়হীনতা, ঈশ্বর এবং তাঁর (নবীর) ওপর অর্পিত দায়িত্বে অসীম বিশ্বাস। এ সব-ই মুসলমানদেরকে সকল বাঁধা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। যখন আমি মুহাম্মাদের জীবনীর ২য় খণ্ড বন্ধ করলাম তখন আমি খুব দুঃখিত ছিলাম যে, এই মহান মানুষটি সম্পর্কে আমার পড়ার আর কিছু বাকি থাকলো না।"

সেই ধারাবাহিকতায়, ইসলাম আজও পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্ম। Reader's Digest 'Almanac', এর Yearbook ১৯৮৬ এ ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এই অর্ধ শতকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের প্রসারের একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়, যাতে দেখা যায় যে এই সময়ের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম ৪৭%, আর ইসলাম ২৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, এই অর্ধ শতকে কোথায়ও কোনো 'Islamic conquest' বা মুসলিম বিজয় সংঘটিত হয়নি, অথচ ইসলাম প্রসারের মাত্রা ছিল অভাবনীয়ভাবে প্রবল। এই প্রবন্ধটি The Plain Truth নামক ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়েছিল।[১]

৫. সন্ত্রাস ও আলেম সমাজ :

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেখে যাওয়া আদর্শের ধারাবাহিকতায় আলেম সমাজও শান্তিপূর্ণভাবে দ্বীন প্রচার এবং সমাজে থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে যুগে যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে ফকির আন্দোলন, হাজী শরীয়াতুল্লাহ, হাজী তিতুমীর, সাইয়্যেদ আহমাদ শহীদ-এর আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনের মুখ্য ও প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন আলেম সমাজ। অধুনা বাংলাদেশ ঘটে যাওয়া সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মসজিদ-মীনার, মাদ্‌রাসা-মকতব, ঈদগাহ, ওয়াজ মাহফিল, বক্তব্য-বিবৃতি, আলোচনা-বক্তৃতা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশনের আলোচনা-টকশো ইত্যাদিতে উলামায়ে কিরাম বিরতিহীনভাবে, স্পষ্টভাষায়, দলীল-যুক্তির আলোকে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন। ফলশ্রুতিতে, সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে প্রশাসনকে অনেকটাই সহযোগিতা করেছেন এবং করছেন শ্রদ্ধাভাজন আলেম সমাজ।

সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, দেশের অপরাধ প্রবণতার সাথে আলেম সমাজের সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। দেশের কারাগারগুলোতে যেসব সন্ত্রাসীরা রয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ রয়েছে তাদের প্রায় সকলের আলেম সমাজের কেউ নন। ফলে এটি প্রমাণিত যে, আলেম সমাজ একদিকে যেমন নিজেরা সন্ত্রাসের সাথে লিপ্ত নন, তেমনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান সমাজের অন্যসব শ্রেণীপেশার মানুষের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী।

---

১. http://www.islamreligion.com/articles/677/was-islam-spread-by-sword/

৬. সন্ত্রাসের প্রতিকার :

পাড়ায় মহল্লায় গণসচেতনতা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি তৈরি: আরবের কলহ-বিবাদপূর্ণ সমাজে হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাজানি, যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধবিগ্রহ, অন্যায়, অত্যাচার ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নেতৃস্থানীয় অংশগ্রহণে এবং আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র জুবাইরের প্রস্তাবে, মক্কার আব্দুল্লাহ ইবনে জাদ'আনের বাসভবনে বনী হাশিম, বনী যুহরা, বনী তাঈম, বনী মুত্তালিব, বনী আসাদ গোত্রের সকলে ঐকমত্যে উপনীত হন 'হিলফুল ফুযুল' নামে সংঘ গঠন করেন। এর সারমর্ম হলো:

১। আমরা দেশের অশান্তি দূর করার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ২। বিদেশী লোকদের ধন-প্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব। ৩। দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সহায়তা করতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হবো না। ৪। অত্যাচারী ও তার অত্যাচারকে দমাতে ও ব্যাহত করতে এবং দুর্বল দেশবাসীদেরকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব।[১]

৭. উপসংহার :

ইসলাম আজকের বিশ্বে সর্বাধিক ভুল বুঝাবুঝির শিকার। মুসলিমদের একাংশ এবং অমুসলিমদের বৃহদাংশ ইসলামকে ভুলভাবে জানছে। একদিকে রয়েছে ইসলামবিদ্বেষীদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডা, যা পাশ্চাত্যে 'ইসলামফোবিয়া (Islamophobia) নামে খ্যাত, আর অন্যদিকে তথাকথিত মুসলিম নামধারী কিছু বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ ইসলামের নাম ও প্রতীক ব্যবহার করে বিভিন্ন স্থানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে ভুল ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে একাকার করে ফেলার ভয়ানক প্রবণতা বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজকে সন্ত্রাসের সাথে গুলিয়ে ফেলায় ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে উঠছে এবং বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে ইসলাম প্রচার-প্রসারে বিঘ্ন তৈরি করছে। অথচ মানবসভ্যতার শুরুতেই সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে। অতীতের মত ধরাধামে পূর্ণ শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন, অগ্রগতি অব্যাহত ও গতিশীল করতে হলে ইসলামকেই জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

---

১. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মোস্তফা-চরিত, কাকলী প্রকাশনী, নবম মুদ্রণ, ২০১০, পৃ. ১৮৮

জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসের কারণ ও প্রতিরোধের উপায় : একটি পর্যালোচনা

أسباب الإرهاب والترويع وكيفية معالجته

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসেন

সহকারী অধ্যাপক (আরবী), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ও

খতীব, উত্তরা ১১ নং সেক্টর বায়তুন নুর জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা।

ভূমিকা

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ শান্তি শুধু মুসলিমের জন্য নয়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এবং সকল সৃষ্টিজগতের জন্য। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিড়ালকে অভুক্ত বেঁধে রাখার জন্য কঠিনতম তিরস্কার জানিয়েছেন অথচ তাঁর উম্মাত অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করতে পারে এটি কল্পনাও করা যায় না। জঙ্গিবাদ একটি ভয়ঙ্কর সামাজিক ব্যাধি। বাংলাদেশের মত সুশৃঙ্খল সমাজে জঙ্গিবাদের উত্থান অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিষয়। এর সঠিক কারণ নির্ণয় করে তা প্রতিরোধ করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

জঙ্গিবাদ কী?

জঙ্গি ও জঙ্গিবাদ শব্দদ্বয় ইংরেজি Militant, Militancy শব্দদ্বয়ের অনুবাদ। এ শব্দগুলো বর্তমানে বহুল পরিচিত। শাব্দিক বা রূপকভাবে যোদ্ধা, সৈনিক বা যুদ্ধে ব্যবহৃত বস্তু বুঝাতে এ শব্দগুলি ব্যবহৃত হতো। বৃটিশ ইন্ডিয়ার কমান্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হতো।[১] শক্তিমত্ত বা উগ্র বুঝাতেও এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। অভিধানে বলা হয়েছে : Militant, adj: favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim. .... militant : n. militant person, esp. in politics. "মিলিট্যান্ট (জঙ্গি) : যে ব্যক্তি তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শক্তি বা জোরালো প্রভাব ব্যবহার করা সমর্থন করে"।[২]

জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসের কারণসমূহ

জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ নিম্নরূপ:

ক. পছন্দ অনুযায়ী দলীল গ্রহণ করা :

খারিজীগণ (৩৭ হিজরীতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে) ও জামাআতুল মুসলিমীন (মিসরে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে) প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে যে আয়াত বা

---

১. শ্রী শৈলেন্দ বিশ্বাস, সংসদ বাংলা-ইংরেজি অভিধান (কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯) পৃ. ৪৬২

২. A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford University Press, 5th edition, 1995) p.738

হাদীসকে নিজেদের পক্ষে বলে মনে করত সেগুলিকে গ্রহণ করত। আর যেগুলি তাদের মতের বিপক্ষে সেগুলোকে মানসূখ (রহিত) বলে অথবা ব্যাখ্যা করে বাতিল করত। কুরআনের কোনো বিধান, বাক্য, অক্ষর বা অর্থকে রহিত দাবি করতে হলে ঠিক অনুরূপ মুতাওয়াতির কোনো নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হতে হবে।[১]

মুসলিম মূলত কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সুন্নাতে সাহাবার রাদিয়াল্লাহু আনহু আলোকে বুঝার চেষ্টা করবেন। পরবর্তী ইমাম, ফকীহ ও আলিমদের বক্তব্য ও মতামতের সহযোগিতা নিবেন। কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় পছন্দ নির্ভরতা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের একটি কারণ।

খ. জিহাদ বিষয়ক অপপ্রচার :

কেউ কেউ জিহাদ বলতে Holy War বা পবিত্র যুদ্ধ বা Religious War বা ধর্মযুদ্ধ বা Crusade (ক্রুসেড) বলে অভিহিত করেন। অথচ এগুলো সব খ্রিস্টান চার্চ ও যাজকদের আবিস্কৃত পরিভাষা। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ শব্দটি 'রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ' অর্থে ব্যবহার করা হয়। মুসলিম রাষ্ট্রের শত্রুদের বিরূদ্ধে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকে ইসলামে জিহাদ বলা হয়। দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হলো দাওয়াত। দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দ্বীন প্রচারের নাম ব্যবহার করে অন্যায়ভাবে হত্যা, জিহাদ বা যুদ্ধ তো দূরের কথা কোনোরূপ শক্তি প্রয়োগও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"দ্বীনে কোনো জবরদস্তি নেই। ভ্রান্তি থেকে সত্য সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অবিশ্বাস করবে এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়"।[২]

গ. জামাআত ও বাইআতের ভুল ব্যাখ্যা :

বিশ্বের সকল মুসলিমকে কাফির গণ্য করার মূলতত্ত্ব ছিল 'জামাআত' ও 'বাইআত' তত্ত্ব। কাউকে মুমিন বা 'দ্বীনি ভাই' বলে চিনতে পারার একমাত্র মাধ্যম হলো

---

১. মুহাম্মদ সুরূর বিন নাইফ, আল-হুকমু বিগাইরি মা আনযালাল্লাহু ওয়া আহলুল গুলু, (ব্রিটেন : বার্মিংহাম, দারুল আরকাম, ২য় প্রকাশ), পৃ. ১২৩

২. সূরা আল-বাকারাহ্: ২৫৬

বাইআত। এ দাবির পক্ষে কেউ কেউ কুরআন ও হাদীসের বাইয়াত ও জামায়াত বিষয়ক নির্দেশগুলিকে দলীল হিসেবে পেশ করে। মূলত তারা এ পরিভাষাদ্বয়ের সঠিক অর্থ বুঝতে পারে নি। জামাআত শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ঐক্য' বা ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী। জামাআতের বিপরীত হলো ফিরকা অর্থাৎ দল বা গ্রুপ। কুরআন-হাদীসে জামাআত বলতে জামাআতুল মুসলিমীন বা সকল মুসলিমের বা অধিকাংশ মুসলিমের ঐক্য বুঝানো হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের প্রতীক বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ। যে সকল হাদীসে বাই'আতের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, সেখানে মুমিনদেরকে বিদ্রোহ, হানাহানি বা ক্ষমতা দখলের অবৈধ প্রক্রিয়া ও প্রতিযোগিতা বন্ধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[১]

ঘ. দ্বীনের বিজয়ের ভুল ব্যাখ্যা :

আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনুল কারীমে দ্বীনকে প্রকাশ বা বিজয় দান করার কথা অনেক আয়াতে বলেছেন। এ দ্বীন বিজয়ের ভুল ব্যাখ্যার কারণেও জঙ্গিবাদের উৎপত্তি হয়। দ্বীনের বিজয় ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। তবে এ বিজয়ের অর্থ ও পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীগণের মাধ্যমে জানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

"তিনিই প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে সঠিক পথের নির্দেশনা ও সত্য দ্বীন-সহ; যেন তিনি তাকে প্রকাশ করেন সকল দ্বীনের উপর; যদিও মুশরিকগণ তা অপছন্দ করে"।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সকল ধর্মের সকল তথ্য প্রকাশ করবেন বা জানিয়ে দিবেন; যদিও ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা তাদের এ সকল বিষয় প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করতো"। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য মুফাসসিরদের মতে : "শেষ যুগে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পুনরাগমণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ এ দ্বীনকে চূড়ান্ত বিজয় ও প্রকাশ দান করবেন। সে সময়ে বিশ্বের সকল মানুষ এ দ্বীন গ্রহণ করবে এবং দ্বীন একমাত্র আল্লাহরই হবে"।[৩]

---

১. আহমদ ইবনু আলী ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী শারহু সাহীহিল বুখারী (বৈরূত : দারুল ফিক্র) খ.১৩, পৃ.৭; মুহাম্মাদ ইবনু আলী শাওকানী, নাইলুল আউতার (বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৩) খ.৭, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

২. সূরা আত-তাওবাহ : ৩৩

৩. আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনু জারীর তাবারী, জামিউল বায়ান (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪০৫ হি.) খ.১৪, পৃ. ২১৫-২১৬

জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায়সমূহ:

বাংলাদেশের জনগণ প্রকৃতিগতভাবে শান্তিপ্রিয়। এদেশে কখনো ধর্মীয় সংঘাত ও জঙ্গিবাদ দেখা দেয় নি। ইদানিং আমাদের দেশেও ধর্মীয় উগ্রতার উন্মেষ লক্ষ্য করছি। এ জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে আমাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ক. আসমানী কারণ নির্ণয় করা :

পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, কিছু কিছু অপরাধ সমাজে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ তা'আলা সে সমাজে সামাজিক অবক্ষয় ও অশান্তি ছড়িয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾

"আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেথায় আসত সবদিক থেকে প্রচুর জীবনোপকরণ, অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, ফলে তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের আস্বাদ গ্রহণ করালেন"।[১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

"যারা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তাদের জন্য পৃথিবীতে এবং আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর আল্লাহ তা'আলা জানেন, তোমরা জান না"।[২]

অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে অশ্লীলতা, ভেজাল, মাপ বা পরিমাপে কম প্রদান, প্রতারণা, জুলুম, হত্যাকাণ্ড, ন্যায়বিচারের দুস্প্রাপ্যতা প্রভৃতি কারণে সমাজে আল্লাহর শাস্তি ও গযব আসবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকা প্রয়োজন।

---

১. সূরা আন-নাহ্‌ল : ১১২
২. সূরা আন-নূর : ১৯

খ. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা দূরীকরণ :

জ্ঞানহীন আবেগ চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদের জন্ম দেয়। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত বেকার যুবককে যদি বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, সহিংসতার মাধ্যমে তোমার বেকারত্ব ও সকল সমস্যা দূরীভূত হবে। এ যুবক সহজে তাদের প্রলোভনে পড়ে যেতে পারে।

গ. জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ত করা :

যেহেতু জঙ্গিবাদের সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত, ফলে এর প্রতিরোধে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। ইসলামের যে বিষয়গুলোর ভুল ব্যাখ্যার কারণে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হয়, সেগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য বিজ্ঞ আলিমদের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। মসজিদের ইমাম ও খতীবগণ জুমু'আর বয়ানে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারলে জঙ্গিবাদ সমাজে স্থান করতে পারবে না।

উপসংহার

সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, উগ্রতা এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্মপদ্ধতি নয়। তাই আমাদেরকে জঙ্গিবাদের সঠিক কারণ নির্ণয় করে তার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কখনো ইসলামের কল্যাণ করেনি, যুগে যুগে দেশ ও জাতির ক্ষতিই করেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দেশ ও জাতিকে জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাস থেকে মুক্ত রাখুন।

সন্ত্রাস ও এর থেকে মুক্তির উপায়

الإرهاب وطرق التخلص منه

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, উত্তরা, ঢাকা।

সন্ত্রাস হচ্ছে কোন ব্যক্তি বা দল বা রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের উপর বা তার দ্বীনের উপর অথবা তার জান, মাল ও ইজ্জতের উপর আক্রমণ চালানো। মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, কষ্ট দেওয়া, আতঙ্ক সৃষ্টি, খুন করা, যুদ্ধ বাঁধানো, ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে এসব অপরাধ করা, চরমপন্থা অবলম্বন, ত্রাস সৃষ্টি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানো এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করা। এতদসঙ্গে সরকারি-বেসরকারি এবং জাতীয় ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি সাধন করা, মানুষের জীবনকে বিপদসংকুল করা। এগুলোকে বলা হয় সন্ত্রাস। সন্ত্রাসকে আরবীতে বলা হয় الإرهاب (ইরহাব)। মার্কিন সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা 'এফবিআই' কর্তৃক সন্ত্রাসের সংজ্ঞা হলো, কোন সরকার বা সাধারণ নাগরিকদেরকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ব্যক্তি বা সম্পদের বিরুদ্ধে ক্ষমতা বা সহিংসতার বেআইনি ব্যবহার করা"।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে কাজটি দেশে দেশে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা হলো মানুষ খুন করা। ইসলামে মানুষ খুন করাকে জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে গণ্য করে হারাম করা হয়েছে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"কোন মানুষ হত্যা বা ফাসাদ সৃষ্টির (সাজা প্রদান ছাড়া) যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করলো, সে যেন গোটা মানবজাতিকে হত্যা করল। আর (এমনিভাবে) যে ব্যক্তি একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করল সে যেন গোটা মানবজাতিকেই বাঁচিয়ে দিল"।[১]

সন্ত্রাসীদের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং (আল্লাহ্‌র) যমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে ,তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শুলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের জন্যে, (এতদসঙ্গে) পরকালে তাদের জন্য ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই"।[২]

---

১. সূরা আল-মায়িদা: ৩২

২. সূরা আল-মায়িদা: ৩৩

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করবে, (আখিরাতে) তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে অনন্তকাল ধরে পড়ে থাকবে। আল্লাহ তার উপর ভয়ানকভাবে রাগান্বিত থাকবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন"।[১]

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

"একজন মুসলিমকে হত্যা করা আল্লাহর কাছে সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়েও জঘন্য"।[২]

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلاَ يَفِي لِذِى عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ

"যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল, তাদের ভালো ও খারাপ সকলকে মারপিট করল, ঈমানদারদেরকে মারপিট করা থেকে ক্ষান্ত হলো না এবং প্রতিশ্রুত ব্যক্তিদের সাথে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করল না- সে আমার উম্মত নয় এবং আমিও তার সাথে নেই"।[৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"যে ব্যক্তি অঙ্গীকারপ্রাপ্ত (মুসলিম রাষ্ট্রে চুক্তিভিত্তিক বসবাসরত) কোন অমুসলিমকে হত্যা করল, সে ব্যক্তি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। যদিও চল্লিশ বছরের রাস্তার দূর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে"।[৪]

---

১. সূরা আন-নিসা: ৯৩
২. সুনান আত-তিরমিযী: ১৩৯৫
৩. সহীহ মুসলিম: ১৮৪৮
৪. সহীহ আল-বুখারী: ৬৫১৬

সন্ত্রাসবাদের কারণ

বেকারত্ব ও দরিদ্রতা, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা, কারো অধিকার হরণ, ইনসাফহীনতা ও অবিচারের শিকার, ইসলামের ন্যায় ভিত্তিক শাসনের অনুপস্থিতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও পদের লোভ, ক্ষমতায় টিকে থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রতিশোধপরায়ণ ও হিংস্র মনোবৃত্তি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়া, যথার্থ কারণ ছাড়া কাউকে কাফির ফতওয়া দেওয়া, জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দান, অনভিজ্ঞ আলিমদের উস্কানি, ইসলাম ও ইসলাম অনুসারীদের উপর নিপীড়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, ধর্মের প্রতি সঠিক জ্ঞানের ঘাটতি, উগ্রতার পথ বেছে নেওয়া ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাস জন্ম নেয়।

বিভিন্ন ইসলামী সমাজে সন্ত্রাসবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠার রাষ্ট্রীয় কারণও রয়েছে। যেমন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা, দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন, ইনসাফ না করা, দুর্বল জাতিসমূহের উপর থেকে যুলুম নির্যাতন পরিহার না করা, সীমাহীন অত্যাচার নিপীড়ন, অবরুদ্ধ করে রাখা, ধ্বংসযজ্ঞ চালানো, নিরিহ মানুষ হত্যা, এসব অন্যায়ের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহলের নীরব সম্মতি বা নীরব ভূমিকা। এসব কারণে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সন্ত্রাস দূরীকরণের উপায়

১. জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্ বাস্তবায়ন করা, কুরআনভিত্তিক ইলম প্রচার ও সন্ত্রাসীদের নৈতিক শিক্ষাদান করা।

২. সন্ত্রাস প্রতিরোধে পরিকল্পনা গ্রহণ করা, এ ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো এবং ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৩. দারিদ্র্য বিমোচন ও বেকার সমস্যা দূর করা। কেননা দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার কারণে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৪. সন্ত্রাসের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা এবং তা দূরীকরণের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫. সরকারি-বেসরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং এ ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করা।

৬. ইসলামী শরী'আর বিধান অনুযায়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করা এবং ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের বিচারের আওতায় আনা।

৭. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে আলিম-উলামা, ইমাম-খতীবদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেয়া। তাদের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে বিকৃত চিন্তাধারাগুলো হতে যুবসমাজকে সচেতন করা।

জিহাদ ও জঙ্গিবাদের বিভাজনরেখা

الخط الفاصل بين الإرهاب والجهاد

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

সহযোগী অধ্যাপক

আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমানে সারা দুনিয়ার এক নম্বর সমস্যা হল সন্ত্রাসবাদ। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোন রাষ্ট্র এ সমস্যা হতে মুক্ত নয়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এই যে, সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে মূখ্যত কতিপয় বিপথগামী মুসলিম তরুণকে ব্যবহার করা হচ্ছে, আবার ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শিকারও হচ্ছেন নিরীহ মুসলমানরা। পরিস্থিতি এতটাই ঘোলাটে যে, কে শিকারী আর কে শিকার - সেটিও অনেক সময় পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। আরো পরিতাপের বিষয় হল এই যে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যেমন, তেমনি তা দমনেও 'জিহাদ' পরিভাষাটি অত্যন্ত বিকৃত, খণ্ডিত ও নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়। তাই আমরা মনে করি জিহাদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা উপস্থাপন করা প্রয়োজন। আশা করা যায়, এ উপস্থাপনের মাধ্যমে জিহাদ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূরীভূত হবে এবং জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিভাজনরেখা সুস্পষ্ট হবে। বোধগম্যতার সুবিধার্থে তাত্ত্বিক আলোচনা যথাসম্ভব পরিহার করা হল।

জিহাদের আভিধানিক অর্থ হল প্রচেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম, ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র বিধান পালন ও প্রচারে শ্রম ও চেষ্টা করার অর্থে কুরআন ও হাদীসে জিহাদ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন, কাফির-মুনাফিকদেরকে দীনের পথে আহ্বান ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদকে 'জিহাদ' বলা হয়েছে। জালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলাকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ' বলা হয়েছে। হাজ্জ একটি শ্রমসাধ্য ইবাদাত; তাই হজ্জকেও 'জিহাদ' বলা হয়েছে। আবার ইসলামের বিধানের আলোকে আত্মশুদ্ধিমূলক যেকোনো প্রচেষ্টাকেও 'জিহাদ' বলা হয়েছে। এভাবে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রচলনে দেখতে পাই, ইবাদাত পালন ও দাওয়াত প্রদানে সর্বাত্মকভাবে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিনিয়োগ করাই জিহাদ। জিহাদের বিধান হল এই যে, এটি সাধারণভাবে ফরযে কিফায়াহ, কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে তা ফরযে আইন হয়ে যায়।

প্রচলিত অর্থে জিহাদকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। মানুষের পিছনে সর্বদা শয়তান সক্রিয় থাকার কারণে সর্বপ্রকারের ভাল কাজ করতে গিয়ে তাকে কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। যেমন, অতিপ্রত্যুষে সালাতুল ফাজর আদায়ে আরামপ্রিয় মন ও শরীর এবং ঘুমকাতুরে চোখের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়। তেমনিভাবে দান করার সময় লোভী অন্তরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। এমন বহু উদাহরণ দেয়া যায়। আমলে সালিহ করতে গিয়ে মনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াই জিহাদেরই অংশ। আমরা বাংলা ভাষার প্রচলনেও 'লড়াই-সংগ্রাম ও চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা'-এর অর্থে

'জিহাদ' শব্দটি ইতিবাচকভাবেই প্রয়োগ করি। যেমন বলা হয়, 'সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছে।' লড়াই-সংগ্রামের একটি চূড়ান্ত রূপ আছে, আর তা হল সশস্ত্র লড়াই বা যুদ্ধ। এটি হল জিহাদের চূড়ান্ত রূপ। তবে এই স্তরের জিহাদ পরিচালনার কিছু পূর্বশর্ত আছে, যা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব।

ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিভাষায় জিহাদের ব্যাপ্তি অনেক বিস্তীর্ণ; এর সূচনা হয় দাওয়াতের মাধ্যমে, আর এটির চূড়ান্ত রূপ হল যুদ্ধ বা 'কিতাল'। মনে রাখা দরকার 'কিতাল' শব্দের অর্থে পারস্পর্যতার দ্যোতনা বিদ্যমান, অর্থাৎ 'কিতাল' হবে মুখোমুখি যুদ্ধের ময়দানে; একপক্ষীয় হত্যাকাণ্ডকে 'কতল' বলে, 'কিতাল' নয়। জিহাদের চূড়ান্ত রূপ তথা 'কিতাল' যখন তখন করা যায় না। এর বৈধতার জন্য কতগুলো পূর্বশর্ত আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল, কিতাল হবে একটি বৈধ কর্তৃপক্ষের অধীনে, অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে। কোন ব্যক্তি বা দল বা গ্রুপ যদি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তা কিছুতেই জিহাদ বলে গণ্য হবে না; বরং তা হবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বা জঙ্গিপনা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করে পৃথক মুসলিম সমাজ গড়ার পূর্বে সশস্ত্র লড়াই করেননি এবং তার অনুমতিও দেননি। পক্ষান্তরে মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী বা সীমান্তরক্ষী বাহিনী সীমানা সুরক্ষার জন্য যে ন্যায্য লড়াই করে তা জিহাদ বলে গণ্য হবে। 'কিতাল' বৈধ হওয়ার অন্যান্য শর্তের মধ্যে রয়েছে, ১) কিতাল কেবল মুসলিম রাষ্ট্র বা নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য করা যাবে; ২) কিতাল বা যুদ্ধ শুরু করার আগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে; ৩) কেবল যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা যাবে, কোন নিরপরাধ ও নিরস্ত্রমানুষের ওপর হামলা করা যাবে না, ইত্যাদি।

জিহাদের উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও শর্তাবলীর আলোকে বিচার করলেই সহজেই বুঝা যাবে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড (হলি আর্টিজানসহ অন্যান্য স্থানে) ঘটানো হয়েছে তা কিছুতেই জিহাদ হতে পারে না; বরং এগুলো জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড। জঙ্গি শব্দটি ফার্সী শব্দ 'জঙ্গ' হতে উদ্ভূত। প্রাথমিকভাবে এই শব্দে নেতিবাচক দ্যোতনা ছিল না; আভিধানিকভাবে 'জঙ্গ' অর্থ যুদ্ধ, 'জঙ্গি' মানে 'সৈনিক' বা 'যোদ্ধা'। বৃটিশ ভারতের কমাণ্ডার ইন চিফকে 'জঙ্গিলাট' বলা হত। পাকিস্তানের একটি পত্রিকার নাম 'জঙ্গ'। তবে কালপরিক্রমায় 'জঙ্গি' শব্দটির প্রয়োগের পরিবর্তন ঘটেছে; বর্তমানে বেআইনি সহিংসতা ও খুনখারাবিকে জঙ্গি কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করা

হচ্ছে। সে হিসেবে এটি সন্ত্রাসের সমার্থক। কোন বিচ্ছিন্ন খুনখারাবিকে জঙ্গিপনা বলে অভিহিত করা যায়। তবে এর সাথে 'বাদ' প্রত্যয় যোগ করে তখনই 'জঙ্গিবাদ' বলা হয় যখন কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পদ্ধতিগতভাবে খুনখারাবি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। আমাদের দেশের প্রচলনে 'জঙ্গিবাদ'কে আরো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। বর্তমানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে বিভিন্ন সশস্ত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে জঙ্গিবাদ বলে অভিহিত করা হচ্ছে। বলাবাহুল্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় জিহাদ ও জঙ্গিবাদের বিভাজনরেখা পরিষ্কার করা হয়েছে। তবুও পরবর্তী আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে আমরা বলতে চাই, জিহাদ মুসলিমদের বিশ্বাস ও কর্মের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। এটির ব্যপ্তি অনেক বিস্তৃত; আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম-আহকাম পালন ও প্রচারে শ্রমসাধনা বিনিয়োগ ও প্রাণান্তকর চেষ্টা করাকে 'জিহাদ' বলে। এর চূড়ান্ত স্তর হল 'কিতাল' বা যুদ্ধ, কয়েকটি শর্তের আওতায় বিশেষ পরিস্থিতিতে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল কিতাল পরিচালিত হবে বৈধ কর্তৃপক্ষ তথা রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নেতৃত্বে গুপ্তহত্যা বা খুনখারাবি কিছুতেই 'কিতাল' বা 'জিহাদ' হতে পারে না। পক্ষান্তরে 'জঙ্গিবাদ' হল কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য পরিচালিত গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। মোদ্দাকথা 'জিহাদ' ও 'জঙ্গিবাদ' উৎস, প্রকৃতি ও পদ্ধতিগতভাবে ভিন্ন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল বর্তমানে 'জিহাদ' পরিভাষাটি খুবই বিকৃত ও কদর্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবং এটি করা হচ্ছে দুই দিক থেকেই। জঙ্গিবাদীরা তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ওপর ধর্মীয় রঙ ছড়ানোর জন্য এবং মুসলিমদের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য প্রায়শ 'জিহাদ' বর্মের কাছে আশ্রয় নেয়। অন্যায়ভাবে অমুসলিম হত্যার বৈধতা প্রমাণের জন্য তারা কুরআনের এমন আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করে যেগুলোতে কাফিরদের বিরুদ্ধে 'কিতাল'-এ অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দেয়া (যেমন সূরা আল-বাকারাহ্, ১৯১; সূরা আন-নিসা, ৯১)। মূলত এ আয়াতগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র হল যুদ্ধের ময়দান; অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় কাফির যোদ্ধাকে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ খুবই স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক; কারণ যুদ্ধের ময়দানে হাত-পা গুটিয়ে থাকলে নিজেকেই নিহত হতে হবে। এভাবে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো 'জিহাদ' ও 'কিতাল' সংক্রান্ত আয়াতগুলোকে প্রসঙ্গের বাইরে ব্যবহার করে ইসলামের অপরিহার্য অনুসঙ্গ জিহাদকে কলুষিত ও নিন্দিত পন্থায় উপস্থাপন করে।

অনুরূপভাবে মিডিয়াগুলোও 'জিহাদ'-কে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করতে শুরু করছে। এহেন গর্হিত প্রচারণার সূচনা করে পশ্চিমা মিডিয়া। আগেই বলা হয়েছে যে, মুসলিম নামধারী সন্ত্রাসীরা নিজেদের কর্মকাণ্ডের ওপর ধর্মীয় রঙ আরোপের জন্য 'জিহাদ' পরিভাষার অপব্যবহার করে। অপরদিকে পশ্চিমা মিডিয়াগুলো ইসলামকে কলুষিত করার জন্য অত্যন্ত সচেতনভাবে সন্ত্রাসকে জিহাদের সমার্থক বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। কোথাও মুসলিম নামধারী গোষ্ঠীগুলো কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটালে তারা এগুলোকে 'জিহাদিস্ট অ্যাকটিভিটি' বলে প্রচারণা চালাতে শুরু করে। পরিতাপের বিষয় হল, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশের মিডিয়াগুলো অন্ধভাবে পশ্চিমা মিডিয়ার অনুকরণ করছে। এহেন অপপ্রচারের একটি দিক হল জঙ্গি আস্তানায় প্রাপ্ত বইগুলোকে 'জিহাদী বই' হিসেবে প্রচার করা। অপপ্রচারের এই দিকটি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার।

কোন জঙ্গি আস্তানায় পুলিশি অভিযানের পর ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যতিক্রমহীনভাবে এমন শিরোনাম প্রায়শ দেখা যায়: "জঙ্গি আস্তানা হতে বিপুল পরিমাণ 'জিহাদী বই' উদ্ধার করা হয়"। আমাদের বিশ্বাস, জিহাদ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাবে মিডিয়াকর্মীরা এমনতর ভুল করে থাকেন। অন্যথায় মুসলিম দেশের মিডিয়া কর্মীগণ ইসলামের অন্যতম ফরয 'জিহাদ'-কে জেনেশুনে বিকৃত করবেন, এমনটি ভাবা যায় না। 'জিহাদী বই' বলে যেগুলোকে অভিধা দেয়া হয় আমরা সাধারণত সে বইগুলোর নাম বা ছবি মিডিয়ায় দেখতে পাই না। বিভ্রান্তি সৃষ্টির এটিও অন্যতম কারণ। মাঝে মাঝে পুলিশের তরফে জানানো হয়, উদ্ধারকৃত কিছু বইয়ে গুপ্তহত্যা, ও অস্ত্র ব্যবহার ও মানুষ খুনের বিভিন্ন কলাকৌশলের বিবরণ পাওয়া যায়। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর এই বক্তব্য যদি সত্য হয়, এই বইগুলোকে 'জিহাদী বই' নামে অভিহিত করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কারণ মানুষ খুনের কলাকৌশল ও জিহাদ এক নয়, কিছুতেই এক হতে পারে না। এ প্রবন্ধের শুরুতে জিহাদ ও জঙ্গিবাদের যে বিভাজনরেখা চিত্রিত হয়েছে সে আলোকে এগুলোকে 'সন্ত্রাসবাদী বা জঙ্গিবাদী বই' বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

কখনোবা মিডিয়ায় তথাকথিত 'জিহাদী বই'য়ের কিছু ছবি প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, যে বইগুলোকে 'জিহাদী বই' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর মাঝে কুরআন, হাদীস ও সাহাবাচরিতের ন্যায় অবশ্যপাঠ্য ইসলামী বই রয়েছে। অত্যন্ত নেতিবাচকভাবে এসব বইকে 'জিহাদী বই' বলা হয়। এহেন অভিধা প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

কারণ কুরআন-হাদীসে কেবল জিহাদের প্রসঙ্গ নয়, মুসলিমের দুনিয়া-আখিরাতের প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশনা রয়েছে। তাই এগুলোকে কেবল 'জিহাদী বই' বলা যায় না। জিহাদের প্রসঙ্গ থাকলেও এসব বইকে জিহাদী বই বলা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কারণ পরিভাষাটি নেতিবাচকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। একজন মুসলিম জেনেশুনে একাজ করতে পারে না। আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হল 'জঙ্গিবাদী বই' ও 'ধর্মীয় গ্রন্থে'র মাঝে বিভাজনের সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা হোক। জঙ্গি আস্তানা হতে যখনই বই উদ্ধার করা হবে তখনই সেগুলোর তালিকা প্রকাশ করা হোক। যেসব বইয়ে মানুষ খুনের প্রণোদনা ও কলাকৌশল পাওয়া যায় সেগুলোকে 'জঙ্গিবাদী বই' হিসেবে চিহ্নিত করা হোক, জিহাদী বই হিসেবে নয়। জঙ্গি আস্তানায় কুরআন-হাদীসের গ্রন্থও পাওয়া যেতে পারে, যেমন চোরের বাড়িতে জায়নামায পাওয়া যায়। তাই বলে কুরআন-হাদীসকে কিছুতেই জঙ্গিবাদী বই বলে অভিহিত করা যাবে না। এমনটি করা হলে সম্মানার্হ ধর্মীয় চিহ্নের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে। মুসলমানদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য 'জিহাদ'-কে নেতিবাচক প্রচারণা হতে মুক্ত করার লক্ষ্যে 'জিহাদী বই' অভিধাটি আমাদেরকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

আমাদের বিশ্বাস, ৯০% মুসলিমের দেশ বাংলাদেশের শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও মিডিয়াকর্মীসহ সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ নাগরিকবৃন্দ তাদের ধর্ম ইসলাম ও পবিত্র গ্রন্থ কুরআনকে গভীরভাবে ভালোবাসেন, আমরা আরো বিশ্বাস করি তারা ইসলাম ও ইসলামী পরিভাষাগুলোকে হেয় ও অবজ্ঞা করার সকল অপচেষ্টাকে প্রতিহত করবেন। তাই আসুন! সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ প্রতিহত করার মাধ্যমে এবং ধর্মীয় পরিভাষাগুলোকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের প্রবণতা পরিহার করে আমরা নিজ ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করি।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ : প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ

مكافحة الإرهاب و الترويع بحاجة إلى المبادرة الجماعية

ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফিজুর রহমান

চেয়ারম্যান

অ্যারাবিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।

বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাস অন্যতম সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা। এই সমস্যাটি কখনো কখনো রাষ্ট্রীয় সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে অনেকটা তা-ই হয়েছে। সন্ত্রাসের যে সংজ্ঞা বিশেষজ্ঞগণ প্রদান করেছেন সেগুলো পর্যালোচনা করলে সন্ত্রাসের যেসকল উপাদান পাওয়া যায় তার একটিরও অনুমোদন ইসলামে নেই। তারপরও সর্বত্র সন্ত্রাসের জন্য ইসলামকে দায়ী ও অভিযুক্ত করা হচ্ছে। কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যার যথেষ্ট জ্ঞান রয়েছে তার কাছে এ কথা অস্পষ্ট নয় যে ইসলামের কোন নির্দেশনায় সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। উপরন্তু সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। আল-কুরআনের একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে সমগ্র মানবজাতিকে হত্যার সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রাণের বিনিময় ছাড়া অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া এমনিতেই কাউকে হত্যা করে, তাহলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করলো, আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণকে বাঁচাল, তা হলে যেন সে সকল মানুষকেই বাঁচাল"।[১]

সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের অক্টোবর ২০১৬ সংখ্যার প্রচ্ছদে কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতের একটি অংশ তুলে ধরেছে। তারা লিখেছে "Whoever saves one life, saves all of humanity" এর মাধ্যমে তারা সিরিয়ায় সাদা হেলমেট পরা স্বেচ্ছাসেবকদের মানবতাবাদি কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরেছে। এই আয়াতটি শুধু সিরিয়ার মানুষদের জীবনের নিরাপত্তার জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-বর্ণ-মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল মানবতার জন্য প্রযোজ্য।

ইসলাম শুধু মানুষের জীবনের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করেনি, মানুষের সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করেছে। কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে অসংখ্য নির্দেশনা রয়েছে যেখানে মানুষের সম্পদ ও সম্মানকে সম্মানিত করে তার নিরাপত্তা বিধান করেছে। ইসলাম যে পাঁচটি বিষয়কে সংরক্ষণ করা আবশ্যক করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো জীবন, সম্পদ ও সম্মান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- বলেছেন,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য ঐরূপ হারাম যে রূপ হারাম তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই দিন।"[১]

মানবহত্যা বা মানুষের সম্পদ-সম্মান নষ্ট করা তো দূরের কথা পৃথিবীতে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাও ইসলামে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটাইও না।"[২]

অনেকেই দীনের নামে, রাজনীতির নামে, শৃঙ্খলা স্থাপনের নামে, জিহাদের নামে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে যাচ্ছে। অথচ তাদেরকে যখন বলা হয় যে তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তারা মনে করে এবং বলে যে, তারা ভালো কাজই করছে। খারাপ কিছু করছে না। আল্লাহ এই প্রকারের কিছু লোকের দৃষ্টান্ত প্রাদান করতে গিয়ে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ – أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করো না। তখন তারা বলে, আমরা তো কেবল সংশোধনকারী। (আল্লাহ তা'আলা বলেন) জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী।"[৩]

সমাজে সন্ত্রাস, ভয়, আতঙ্ক, নিরাপত্তাহীনতা ছড়িয়ে দেয়া মারাত্মক অন্যায়। কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে ভয় দেখানো বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

"কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়।"[৪]

আজকাল নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সবাই যদি প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে আইনের বাস্তবায়ন করা শুরু করে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বাড়বে ছাড়া কমবে না। তাই সকলের উচিত

---

১. সহীহ আল–বুখারী, হাদীস নং-৬৭

২. সূরা আল-আ'রাফ: ৫৬

৩. সূরা আল-বাক্বারাহ্ ২ : ১১-১২

৪. সুনান আবু দাউদ: ৫০০৬

ধৈর্যধারণ করা। কারো ওপর জুলুম বা অত্যাচার করে আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট জ্ঞান। কোন বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত নয়। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক যুবককে দেখা যায় দীনের অনেক কঠিন ও জটিল মাসআলা-মাসাইল নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। দীন বোঝার ক্ষেত্রে নিজের বুঝকেই প্রাধান্য দেয়। কোন বিশেষজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হয়ে মাসআলাটি সঠিকভাবে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করে না।

যুবসমাজের একটি অংশ ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার কারণে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে। তাই কেউ যদি ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে জানে এবং বুঝে মানার চেষ্টা করে তাহলে তার পক্ষে জঙ্গি হওয়া সম্ভব নয়। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানহীনতা বা ইসলাম সম্পর্কে খণ্ডিত জ্ঞান যে কাউকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করতে পারে। তাই সকল মুসলিমকে ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। সাথে সাথে আলিম-উলামাদেরও মঞ্চের পাশা পাশি মাটিতে নেমে এসে ছাত্র-তরুণ-যুবকসহ সকলের সাথে মিশতে হবে। মতবিনিময় করতে হবে। ইসলামের সঠিক বুঝ তাদেরকে দিতে হবে। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ও জিহাদ যে এক নয় তা বুঝাতে হবে। জিহাদের অর্থ, শর্ত, সময়, প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান বিতরণ করতে হবে। প্রতিদিন নিয়মিত কুরআনের ও হাদীসের কিছু অংশ অর্থসহ বুঝে পড়তে হবে। শিশু-কিশোর-তরুণদের হতাশা দূর করে তাদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। মোটকথা ইসলামকে সঠিকভাবে জেনে মানতে হবে। আর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সরকার, আলিম-উলামা, জনগণ-সকলের সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। কোন এক পক্ষের এক তরফা উদ্যোগ সফলতার মুখ দেখবে না।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদ : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

الإرهاب والترويع والتطرف من أضواء إسلامية

হাফিয মুহাম্মাদ 'আবদুস্ সামাদ আল-মাদানী

প্রিন্সিপাল

উসওয়াতুন হাসানাহ মাদ্‌রাসা, বংশাল, ঢাকা

ইসলাম শান্তির ধর্ম, নবী (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের পূর্বে আইয়ামে জাহিলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে সারাবিশ্বে যখন মানুষে মানুষে মারামারি, হানাহানী, ঝগড়া-বিবাদ, হত্যা, কলোহ এবং বিভিন্ন ফিৎনাহ-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনে ও ইসলামের সূচনায় আস্তে আস্তে সারাবিশ্ব থেকে সকল অন্যায়-অত্যাচার, যুল্‌ম, পাপাচার, হত্যা, হানাহানী বন্ধ হতে লাগল। মানুষের মাঝে শান্তি ও স্বস্তি বিরাজ করতে লাগল। তাই ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম। কারণ এটা হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র ধর্ম।[১] আর ইসলাম-এর অর্থের মাঝে রয়েছে নিরাপত্তা ও শান্তি। মানুষদেরকে নিরাপদ ও শান্তি দেয়ার জন্যই এর আগমন। কিন্তু দুঃখের বিষয়– আজ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে হত্যা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদের মাধ্যমে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে, যা কারোর জন্যই এটা কাম্য নয়। একটি শান্তিপ্রিয় রাষ্ট্রকে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনিত ধর্ম ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন ও ধ্বংস করার জন্য কিছু কুচক্র এজেন্ট ও দেশ বিপদগামী কিছু মুসলিমদের মগজ ধোলাই করে তাদের হাতে অর্থ ও সুসজ্জিত অস্ত্র দিয়ে তাদের মাধ্যমে সন্ত্রাস, জঙ্গি কার্যক্রম, উগ্রতা ও হত্যা, এ রকম ন্যাক্কার জনক জঘন্যতম মানবাধিকার বিরোধী কাজ করানো হচ্ছে, যা ইসলাম বা কুরআন-হাদীস কখনো সমর্থন করে না। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, উগ্রবাদ এগুলোর সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। বরং এসব সম্পূর্ণ ইসলামী বিরোধী। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও উগ্রবাদ, হত্যা, ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা এগুলো সম্পূর্ণ অন্যায় ও হারাম কাজ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا﴾

"তোমরা নিজেরা পরস্পরকে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল"।[২]

তিনি আরো বলেন :

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِيْ الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا﴾

---

১. সূরা আলে 'ইমরান: ১৯

২ .সূরা আন-নিসা: ২৯

"মানুষ হত্যার অপরাধী অথবা পৃথিবীতে অশান্তি (সন্ত্রাস) সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে কেউ যদি হত্যা করে তাহলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকে হত্যা করল"।[১]

উল্লেখিত আয়াত দু'টিতে আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। যা ইসলামে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এটা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।[২] আর কেউ যদি কাউকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে সে যেন সমগ্র পৃথিবীর লোককে হত্যা করে ফেলল। ইসলামের দৃষ্টিতে এগুলো কাজ গুরুতর অন্যায় ও অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে আল্লাহ তা'আলা তার কোন নফল ও ফরয 'ইবাদাত কবুল করবেন না"।[৩]

কোন মুসলিম যদি কাউকে হত্যা করে তাহলে তার কোন 'আমলই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। তার সকল 'আমলই নষ্ট হয়ে যাবে। আর হত্যাকারীর ঠিকানা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا﴾

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত কোন মুসলমানকে হত্যা করবে, তার পরিণাম হবে জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন, আর তার জন্য বিরাট 'আযাবের ব্যবস্থা করবেন"।[৪]

যারা আজকে সন্ত্রাসি কার্যক্রম চালিয়ে, মানুষকে হত্যা করে যাচ্ছে তারা যদি উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলোর মর্মবাণী উপলব্ধি ও অনুধাবন করত তাহলে কখনোই এই জঘন্য কাজে লিপ্ত হত না। এর জন্য দুনিয়াতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আর মৃত্যুর পর পরকালে আগুন বিশিষ্ট চিরস্থায়ী জাহান্নামে বসবাস করতে হবে।

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৩২
২. সহীহ্ আল-বুখারী: ২৬৫৪; সহীহ মুসলিম: ৮৭
৩. সুনান আবূ দাউদ: ৪২৭০
৪. সূরা আন-নিসা: ৯৩

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা, হুমকি দেয়া, ভীতি প্রদর্শন করা, দেশে অশান্তি সৃষ্টি করা এগুলো ইসলাম সম্পূর্ণ অবৈধ বা হারাম ঘোষণা করেছে। মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

"যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) অস্ত্র উত্তোলন করে সে আমাদের (মুসলিমদের) অন্তর্ভুক্ত নয়"।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন :

لَا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ، فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ

"তোমাদের মাঝে কেউ যেন তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত না দেয়। কেননা হতে পারে যে, তার অনিচ্ছা সত্বেও শয়তান তার হস্তদ্বয়ে আঘাত হানার ফলে হতাহত সংঘটিত হবে। অতঃপর সে এ অপরাধের কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"।[২]

তাই কাউকে হত্যা করা তো দূরের কথা, কাউকে অস্ত্র দ্বারা ভয় প্রদর্শন করা, অস্ত্র দিয়ে হুমকি দেয়া ও অশান্তি এবং ফিৎনাহ-ফাসাদ সৃষ্টি করা, ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে।

আজ দেখা যাচ্ছে যে, অনেক জঙ্গি আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে মানুষদেরকে হত্যা করছে, আবার নিজেও মারা যাচ্ছে এবং তারা মনে করছে এটি জান্নাত লাভের উপায়। প্রকৃত কথা হচ্ছে, এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম বলে ঘোষণা করেছে। সে দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্থ হবে আর পরকালেও জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না"।[৩]

---

১. সহীহ আল-বুখারী : ৭০৭০; সহীহ মুসলিম: ৬৮৩৪
২. সহীহ আল-বুখারী : ৭০৭২, সহীহ মুসলিম: ১২৬/২৬১৭
৩. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৯৫

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এই সম্পর্কে ঘোষণা করেন :

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি নিজেকে কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করবে ক্বিয়ামাতের দিন তাকে সে বস্তু দ্বারাই শাস্তি দেয়া হবে"।[১]

অতএব, যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে জাহান্নামে তাকে সেভাবেই শাস্তি দেয়া হবে আত্মঘাতী হামলাও আত্মহত্যার শামিল। তাই যারা আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে মারা যাবে তাদের অবস্থান ও ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আত্মহত্যাকারীর মতো তাদেরকেও জাহান্নামে অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে।

যারা অমুসলিম তাদেরকেও বিনা কারণে অন্যায়ভাবে আক্রমণ ও হত্যা করা ইসলাম হারাম বলে ঘোষণা করেছে। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

"ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে হত্যা করো না, যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন"।[২]

আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লা-হু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا

"যে ব্যক্তি মুসলিম জনপদে চুক্তিবদ্ধ (অমুসলিম) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ চল্লিশ বছর পথের দূরত্ব হতেও তার (জান্নাতের) সুগন্ধ পাওয়া যায়"।[৩]

তাই মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক অন্যায়ভাবে কোন কারণ ছাড়া কাউকেও হত্যা করা, অস্ত্র দ্বারা হুমকি দেয়া, ভয় প্রদর্শন করা, সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে অন্যায় ও যুল্ম করা যাবে না। কারণ এগুলো কুরআন-হাদীসে নিষিদ্ধ, তাই চৌদ্দশত বছর পূর্বেই নবী (সল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ১০ম হিজরীতে বিদায় হাজ্জের ভাষণে আরাফার ময়দানে হারাম ঘোষণা করেছেন।[৪] বরং ইসলাম পরস্পরের প্রতি

---

১. সহীহ আল-বুখারী : ৬০৪৭, সহীহ মুসলিম: ১৭৬/১১০
২. সূরা বানী-ইসরাঈল: ১৭-৩৩
৩. সহীহ আল-বুখারী: ৩১৬৬
৪. সহীহ আল-বুখারী: ৬৭, সহীহ মুসলিম: ১৬৭৯

সহানুভূতি, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, সুখে-দুঃখে এগিয়ে আসার প্রতি আদেশ করেছেন। কারণ ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। মানুষের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য।

কিন্তু অতিব দুঃখের বিষয়– কিছু বিপদগামী মুসলিম ইসলামকে না বুঝার দরুণ এবং অন্যের প্ররোচণায় মুসলিম বা অমুসলিমদের উপর জঙ্গি কায়দায় সন্ত্রাস ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। যা কখনোই আশানুরূপ ও কল্যাণকর নয়। তাই দেশ থেকে "সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ" দমন করতে হলে পিতা-মাতা, অভিভাবক, 'আলেম-উলামাহ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে, গণসচেতনতা বাড়াতে হবে, পত্রিকা, রেডিও ও টিভি'তে এগুলোর ক্ষতিকর দিকগুলো প্রচার করতে হবে, আর যারা এগুলোর সাথে জড়িত তাদেরকে সঠিকভাবে বুঝাতে হবে। তাহলে ইনশা-আল্লাহ, আস্তে আস্তে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ সব দূর হয়ে যাবে। তারাও ইসলামের সঠিক পথে ফিরে আসবে, দেশে দেশে শান্তি বিরাজ করবে। তবে এর জন্য আমাদের হতে হবে যথাযথ আন্তরিক।

আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সঠিক বুঝের উপলব্ধি দান করো, আমাদের দেশ ও জাতিকে সকল অন্যায় ও অপকর্ম থেকে হিফাযাত করো –আল্লাহুম্মা আমীন।

জঙ্গিবাদের কারণ: একটি পর্যালোচনা

أسباب الإرهاب : دراسة مقارنة

মোস্তফা মনজুর

সহকারী অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্ভবত জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদ। শুধু বাংলাদেশ কেন গোটা বিশ্বই এ সমস্যায় আতঙ্কগ্রস্থ। নানা কারণে, নানারূপে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রতিনিয়তই সন্ত্রাসবাদের সংবাদ আমাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব ঘটনা কিংবা জঙ্গিবাদের সম্পৃক্ততা কেবল ইসলাম ও মুসলমানদের সাথেই যুক্ত করা হচ্ছে। ধরে নেওয়া হচ্ছে জঙ্গি মানেই মুসলিম; কিংবা আর একটু আগ বেড়ে মুসলিম মানেই জঙ্গি এরূপ ধারণাও প্রচার করা হচ্ছে। Islamophobia, Muslimophobia, Faith Hate ইত্যাদি অভিধা আজ মিডিয়া ও গবেষণা ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিপক্ষেই ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ বাস্তবতা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের কথা বাদই দিলাম, যেসব কাজে মুসলিমরা জড়িত বলে বলা হচ্ছে সেসব কাজের জন্য ইসলাম কিংবা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠী কতটুকু দায়ী তা ভাবার বিষয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করলে জঙ্গিবাদের সাথে মুসলিম ও ইসলামের নেতিবাচক সম্পৃক্ততা বিশ্ববাসী খুব সহজেই জানতে পারত। কিন্তু এ কাজটা করার সুযোগ তৈরি করা ও পরবর্তীতে এর বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা আর যা-ই হোক বর্তমান সময়ের মিডিয়া দ্বারা সম্ভব নয়। তা-ই নিজেদের অবস্থা বুঝানোর দায়িত্ব মুসলিমদেরই নিতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধ এমনই এক ক্ষুদ্র উদ্যোগ।

জঙ্গিবাদ, তা যার দ্বারাই সংগঠিত হোক, মূলত বিশ্বায়নের একটি বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রভাব। এটা যতটা না ধর্মীয় সমস্যা তারও চাইতে বেশি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। বিশ্বায়নের সাংস্কৃতিক প্রভাবও জঙ্গিবাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলা যায়। নানা গবেষণা আর জঙ্গি কার্যক্রমের বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণই এসব সত্য তুলে এনেছে। নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলে জঙ্গিবাদের উত্থানের বেশ কিছু কারণ পরিলক্ষিত হয়। এখানে সংক্ষেপে কিছু কারণের আলোচনা উপস্থাপন করছি যাতে জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক খোঁজার যে অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে তার বাস্তবরূপ প্রতিভাত হবে।

রাজনৈতিকভাবে জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার নজীর ইতিহাসে কম নয়। প্রথমত, দেশকে অস্থিতিশীল করে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস রাজনীতি অনুশীলনেরই একটা অংশ। বিশেষত যেখানে সরকার ও প্রশাসনের জনপ্রিয়তা প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে বিরোধী শক্তি ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করাটা স্বাভাবিকই। দ্বিতীয়ত, বিশেষ কোন স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে ডাইভার্সন হিসেবে জঙ্গিবাদের বিস্তার করা। যেমন, ছোটখাট কোন জঙ্গি কার্যক্রম সংগঠিত করে জনগণ ও সুশীল সমাজের নজর অন্য দিকে সরিয়ে রাখা যেন অন্য কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রবল চাপের সৃষ্টি না হয়। এরূপ অবস্থার নজীরও রাজনৈতিক ইতিহাসে

কম নয়। তাছাড়া বাক স্বাধীনতার অভাব ও নিজ বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ যখন বন্ধ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি অনুমিতই।

বিশ্বায়নের আন্তর্জাতিক প্রভাবও জঙ্গিবাদ প্রসারের পক্ষেই কাজ করছে। কোন দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করে সে দেশ থেকে সুবিধা আদায় করার ষড়যন্ত্র বর্তমানে বিরল নয়। সেক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলিম দেশগুলোই এসব চক্রান্তের মূল শিকার। তাছাড়া Divide and Rule পদ্ধতির মাধ্যমে উদীয়মান কোন রাষ্ট্রের উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যও জঙ্গিবাদ ইস্যু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলায় বিপক্ষকে পরাজিত করতে অন্য শক্তির মোকাবিলায় জঙ্গিদের মদদদানের ঘটনা সাম্প্রতিক ইতিহাসেই ভুরিভুরি। বিশ্বায়নের ফলে সাম্রাজ্যবাদের নতুন মাত্রা যোগ হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। যুদ্ধ লাগিয়ে কোন দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ আহরণ, অস্ত্র ব্যবসার প্রসার ইত্যাদিও সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তিতে বেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। তাছাড়া বাজার দখলের উদ্দেশ্যে কোন দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্যও জঙ্গিবাদী কার্যক্রম পরিচালনার উদাহরণ বিরল নয়।

ইসলাম ও মুসলিমদের বিপক্ষে পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রকে এক হিসেবে জঙ্গিবাদের জনকই বলা চলে। কেননা পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতাকে (!) একমাত্র ইসলামই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। হান্টিংটন তাঁর Clash of Civilization গ্রন্থে ইসলাম ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দের কথা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ এসব ভোগবাদী চেতনার বিপক্ষে তো নয়ই বরং অনেকটা সহায়ক ভূমিকাই পালন করছে। বিপরীতক্রমে ইসলাম শুধু মুসলিম প্রধান দেশেই নয়, বরং পাশ্চাত্যের অমুসলিম ও নাস্তিক সমাজেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রজ্জ্বলিত। তাছাড়া গোটা বিশ্বে সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু ধর্ম হিসেবে ইসলামের ক্রমপ্রসারও পাশ্চাত্যের চিন্তার অন্যতম কারণ। এসব কারণে ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি পাশ্চাত্যের চক্রান্ত খুব একটা অপ্রত্যাশিত নয়। আর এর হাতিয়ার হিসেবে ইসলাম ও মুসলিমদের নামে জঙ্গিবাদের প্রসার করা হচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহে অস্থিরতা সৃষ্টি করে তাদের ঐক্য বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র হিসেবেও সন্ত্রাসবাদ অন্যতম অবলম্বন। ইতিহাসের পর্যালোচনায় এ সত্য কারোরই অজানা নয়।

মিডিয়ার অপপ্রচার ও সত্যের অপলাপও জঙ্গিবাদকে মুসলিমদের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, যেসব মিডিয়া (যেমন বিবিসি, রয়টার্স, এপি, এএফপি, সিএনএন ইত্যাদি) বর্তমান বিশ্বে সংবাদে উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে

তার সবই একটি নির্দিষ্ট গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত। সেক্ষেত্রে তাদের পরিবেশিত সংবাদ কতটা সত্য আর কতটুকু সত্যের অপলাপ তা বলাই বাহুল্য। নিজেদের স্বার্থে তাদের মিডিয়ার ব্যবহার নানাভাবেই প্রমাণিত। তাছাড়া মুসলিমদের পরিচালিত চ্যানেল ও মিডিয়াসমূহকে বন্ধ করা, যথাযথ সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদিও পাশ্চাত্যের অবস্থানকে সুস্পষ্ট করে তোলে। ঢালাওভাবে ইসলাম ও মুসলিমদের বিষেদাগার; হলুদ সাংবাদিকতা; নানারূপ ব্যাঙ্গাত্মক কার্টুন ও ফিচার প্রকাশ; ব্লগ ও সামাজিক সাইটগুলোতে ইসলামকে কেন্দ্র করে নানা উস্কানিমূলক বিবৃতি; প্রতিশীলতার নামে ইসলাম বিরোধীতার নতুন মাত্রা সংযোজন - মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এসব কর্মকাণ্ডও জঙ্গিবাদ প্রসারেই ভূমিকা রাখছে; দমনে নয়।

সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ও জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিস্তারের জন্য দায়ী। বিশ্বায়নের ফলে প্রাপ্ত তথ্য-প্রযুক্তি সুবিধার অপব্যবহার, আকাশ-সংস্কৃতির আগ্রাসন আমাদের সামাজিক মূল্যবোধকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তাছাড়া পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বল প্রভাব ইত্যাদিও মানুষের মধ্যকার মানবিকতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার গুণ অনুশীলনের গুরুত্ব তুলে ধরতে ব্যর্থ হচ্ছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন ইত্যাদিও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম সুগম করে দিচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম দেওয়া, সামাজিকভাবে যথেষ্ট সম্মান না দেয়া ইত্যাদিও মানুষের মধ্যে শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করছে। যা অনেকাংশেই মানুষকে চরমপন্থা অর্জনে বাধ্য করছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত হতাশাও মানুষকে এ পথে পরিচালিত করতে পারে। দুনিয়াবি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, কোন কিছু না পাওয়ার হতাশা কিংবা বস্তুবাদের অন্তঃসারশূণ্যতা মানুষকে আত্মহননের পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এতে করে তুলনামূলক স্বচ্ছল পরিবারের সন্তানেরও জঙ্গি কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা গড়ে ওঠে।

জঙ্গিবাদের ধর্মীয় কারণ হিসেবেও বেশ কিছু দিক লক্ষ্যণীয়। যেমন, প্রথমেই বলা চলে, ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান ও এর মাধ্যমে জনগণকে, বিশেষ করে তরুণ সমাজকে, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত করার অপচেষ্টা করা হয়। এক্ষেত্রে জিহাদ ও খিলাফতের মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে মানুষকে প্ররোচিত করা হয়। অথচ ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, জিহাদ বা খিলাফাতের নামে যা করা হচ্ছে তা নিজ স্বার্থ হাসিলের পথ বৈ অন্য কিছু নয়। সতর্ক পর্যবেক্ষণে বুঝা যায়, জঙ্গিদের কার্যক্রম ও চিন্তা-চেতনা কোন ক্ষেত্রেই ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে না। বরং রাজনৈতিক বা পার্থিব স্বার্থ হাসিলই তাদের মুল উদ্দেশ্য।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতিশোধ গ্রহণের মানসিকতাও তাদের মধ্যে কাজ করে থাকে। সুতরাং স্বার্থ হাসিলের জন্য আল কুর'আন ও সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটানোর দায় ইসলামের হয় কী করে?

খিলাফত প্রতিষ্ঠার ভুল পদ্ধতির অনুসরণও অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কথা বলে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে, নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়। অথচ খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামে সহজ-সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি রয়েছে। তা অনুসরণ না করে বিপ্লব ও বিদ্রোহের ভুল পদ্ধতির অনুসরণ করে জঙ্গিবাদের প্রসার করা হচ্ছে। এজন্য মূলত দু'টো কারণ পরিদৃষ্ট হয়- প্রথমত, স্বার্থান্ধতা। দ্বিতীয়ত, পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। এছাড়া ব্যক্তিগত হতাশার ফলে ঈমান আমলের অপূর্ণাঙ্গতার কারণে জান্নাতের লোভে শাহাদাতের সহজ উপায় হিসেবে জঙ্গি কার্যক্রমে নাম লিখানোর উদাহরণও থাকতে পারে।

শান্তির দ্বীন ইসলাম যদিও এর একটিও অনুমোদন করে না তথাপিও ইসলাম ও মুসলিমরাই এসব কারণের জন্য দায়ী বলা হচ্ছে। এজন্য ইসলামী আখলাক ও আদর্শের প্রচার-প্রসারের সংকট/অপ্রতুলতা, ইসলামী দাওয়াহ ও ইসলামের শান্তির বার্তা প্রসারে সার্বিকতা হারানো, ইসলামী শিক্ষা-আদর্শ, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অসচেতনতা ও সুযোগের অভাব ইত্যাদিই দায়ী। আর এর দায়ভার শুধু মুসলিমদেরই নয় বরং সকলেরই।

প্রকৃতপক্ষে কোন গোষ্ঠী বা ব্যক্তির জঙ্গি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কারণগুলোর মধ্যে কোন একটি কারণকে দায়ী করা যায় না। বরং অবস্থা ও সময়ের প্রেক্ষিতে এক বা একাধিক কারণ একইসাথে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ধর্মীয় কারণ এগুলোর মধ্যে একটি মাত্র। তাই জঙ্গিবাদ নিয়ে আলোচনায় শুধু ইসলাম ও মুসলিমদের দায়ী করাটা বাস্তবসম্মত নয় কোনক্রমেই। বরং এরূপ একচেটিয়াভাবে মুসলিমদের দায়ী করা জঙ্গিবাদ দমনের অনুসৃত পদ্ধতি হিসেবে বুমেরাং হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। তাই সময় থাকতে সকলেরই উচিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করত জঙ্গিবাদের কারণ খুঁজে বের করে এর সুষ্ঠু সমাধানে সচেষ্ট হওয়া। এক্ষেত্রে আলেমসমাজ ও মুসলিমদের দূরে সরিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয়, বরং তাঁদের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে জঙ্গিবাদ নিরসনে সকলে মিলে কাজ করাটাই হবে বাস্তবসম্মত। যেহেতু জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের সম্পৃক্ততাকে বড় করে দেখা হচ্ছে সেহেতু এক্ষেত্রে ইসলামিক স্কলারদের চিন্তাধারাকে উপেক্ষা করে বা তাদের প্রস্তাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে একদল নামধারী বুদ্ধিজীবির পরামর্শেই এ কঠিন সংকটের সমাধান করা যাবে বলে আশা করা যায় না।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশনা

توجيهات القرآن والسنة لمكافحة الإرهاب

শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল

গবেষক

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউট ফর এডুকেশন এন্ড রিসার্চ

উত্তরা, ঢাকা।

ভূমিকা

সন্ত্রাস বর্তমান সময়ের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়। একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের সাথে প্রতিযোগিতা দিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাস একদিকে যেমন বিশ্ব শান্তিকে হুমকির মুখে দাঁড় করে দিয়েছে অন্যদিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে সভ্যতার সৌধকে। বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে একাকার করে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ মানবসভ্যতার শুরুতেই সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, এর দ্বারা ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে তোলা হচ্ছে এবং বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সন্ত্রাস-এর সংজ্ঞা

সন্ত্রাস শব্দটি বাংলা 'ত্রাস' শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ ভয়, ভীতি, শঙ্কা।[১] আর সন্ত্রাস অর্থ হলো, মহাশঙ্কা, অতিশয় ভয়,[২] কোনো উদ্দেশ্যে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা, অতিশয় শঙ্কা বা ভীতি,[৩] অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ,[৪] ভীতিজনক অবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পরিবেশ।[৫] সন্ত্রাস এর সমার্থক শব্দ হিসাবে সন্ত্রাসবাদ, আতঙ্কবাদ, উগ্রপন্থা, উগ্রবাদ, চরমপন্থা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়।[৬] অভিধানে "সন্ত্রাসবাদ" অর্থ লেখা হয়েছে যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠাননীতি,[৭] রাজনীতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পীড়ন, হত্যা প্রভৃতি

---

১. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ৫৭৩

২. আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ৫৪১

৩. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩

৪. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, সংসদ বাঙালা অভিধান, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ৮০৪

৫. রিয়াজ আহমদ, ব্যবহারিক শব্দকোষ, ঢাকা : সাহিত্য বিলাস, ২০০৮, পৃ. ২৬২

৬. অশোক মুখোপাধ্যায়, সংসদ সমার্থ শব্দকোষ, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৮, পৃ. ২৪৭

৭. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১৩

হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক কর্ম অবলম্বন করা উচিত- এই মত।[১] ইংরেজীতে সন্ত্রাস অর্থ বুঝাতে Terror : great fear/alarm, terrorism[২] extreme fear, the use of organized intimidation terrorism [based on Latin terrere "to frighten"][৩] শব্দসমূহ ব্যবহৃত হয়।

পরিভাষায় 'সন্ত্রাস'কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনে হাদী আল-মাদখালী বলেন,

إن الإرهاب كلمة لها معنى ذو صور متعددة يجمعها الإخافة والترويع للآمنين بدون حق وإزهاق الأنفس البريئة وإتلاف الأموال المعصومة وهتك الأعراض المصونة

"ইরহাব (সন্ত্রাস) এমন একটি শব্দ বিভিন্ন আঙ্গিকে যার অনেক অর্থ রয়েছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- নিরপরাধ, অন্যায়ভাবে নির্দোষ মানুষকে ভয় দেখানো ও শঙ্কিত করা। কখনো নিরীহ ব্যক্তিবর্গকে হত্যার সীমাহীন ভীতি প্রদর্শন, সুরক্ষিত সম্পদ বিনষ্ট বা লুট, সতী-সাধ্বী নারীর সম্ভ্রমহানি করা"।[৪]

আল-মাওসূ'আহ আল-আরাবিয়্যাহ আল-'আলামিয়্যাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الإرهاب : استخدام العنف أو التهديد به لإثارة الرعب

"ইরহাব (সন্ত্রাস) হচ্ছে ভীতি সঞ্চারের জন্য বল প্রয়োগ করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করা"।[৫]

যে কর্মকাণ্ড সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, জান-মালের ক্ষতি সাধন, দেশ ও সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, শান্তি ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন, স্থাপনা ও স্থাপত্য ধ্বংস এবং সর্বস্তরের

---

১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৪

২. Mohammad Ali and others, Bangla Academy Bangali-English Dictionary, Dhaka : Bangla Academy, 1994, p. 786

৩. Illustrated OXFORD DICTIONARY, London : Dorling kindersley Limited, 2006. p. 859

৪. প্রফেসর ফাহাদ ইবনে ইবরাহীম আবুল উসারা, লামহাত 'আনিলি ইরহাবি ফিল আসরিল হাযির, সউদী আরব : জামি'আহ আল-ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০০৪, পৃ. ৫

৫. আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ, আল-ইরহাব আসবাবুহু ওয়া ওসায়িলুল ইলাজ, মাজাল্লাতুল বুহুছ আল-ইসলামিয়্যাহ. সউদী আরব : কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা. ২০০৩, সংখ্যা-৭০, পৃ. ১০৮-১০৯

নাগরিকদের আতঙ্কিত করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখীন করে তাকে বলা হয় সন্ত্রাস। মোটকথা যে কর্মকাণ্ড জনগণের মাঝে ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে এবং জানমালের ক্ষতি সাধন করে তাই সন্ত্রাস এবং যে বা যারা এসকল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তারাই সন্ত্রাসী।

আল-কুরআনে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ

আধুনিক আরবীতে সন্ত্রাস বুঝাতে ইরহাব (إرهاب) শব্দ ব্যবহার করা হলেও প্রচলিত অর্থে সন্ত্রাস বলতে যা বুঝায় তা প্রকাশের জন্য ইরহাব (إرهاب) শব্দের ব্যবহার কুরআনে পাওয়া যায় না। সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যক্রম বুঝানোর জন্য কুরআনে 'ফিতনাহ' (فِتْنَة) এবং 'ফাসাদ' (فَسَاد) শব্দদ্বয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

আল-কুরআনে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' প্রসঙ্গ :

আল–কুরআনে 'ফিতনা' শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব আয়াতে 'ফিতনা'কে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো–

১. আল্লাহকে অস্বীকার করা, তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা, ইবাদতে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা ফিতনার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বল, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে তা হতে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা (দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, নির্যাতন) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়"।[১]

২. দুর্বলের উপর অত্যাচার করা, তাদের ন্যায্য অধিকার হরণ করা, তাদের ঘর–বাড়ি জবরদখল করা এবং তাদের বিভিন্ন পন্থায় কষ্ট দেয়াও ফিতনার আওতাভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

---

১. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২১৭

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, অতঃপর জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এসবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[১]

৩. জবরদস্তিমূলক সত্যকে দমন করা এবং সত্যগ্রহণ থেকে মানুষকে বাধা দেয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾

"ফির'আউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশঙ্কায় মূসার সম্প্রদায়ের এক দল ব্যতীত আর কেউ তাঁর প্রতি ঈমান আনে নাই। বস্তুত ফির'আউন ছিল দেশে পরাক্রমশালী এবং সে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত"।[২]

উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো ছাড়াও সূরা আল-ইসরা-এর ৭৩ নং আয়াত, সূরা আল-বুরূজ-এর ১০ নং আয়াত, সূরা আল-আহযাব-এর ১৪ নং আয়াত-এ ফিতনা শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

আল–কুরআনুল কারীমে 'ফাসাদ' শব্দটি বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে সব আয়াতে 'ফাসাদ' শব্দকে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১. অন্যায় শাসন ও হত্যাকাণ্ড, দুর্বলদের প্রতি অবিচার ও সম্পদ লুটপাট করা। আল-কুরআনে আল্লাহ ফির'আউনকে 'ফাসাদ' সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, কারণ সে তার প্রজাদের মাঝে শ্রেণী ও বর্ণগত পার্থক্য সৃষ্টি করতো এবং স্বৈরাচারী শাসন চালাতো, দুর্বলদের ও বিরোধীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করতো এবং তাদের সম্পদ লুট করতো।

---

১. সূরা আন-নাহল: ১১০

২. সূরা ইউনুস: ৮৩

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

"ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল; তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী"।[১]

২. ন্যায়ানুগ পন্থার বিপরীতে বিকৃত পথে জীবন চালানো। প্রাচীনকালের আদ, সামূদ, লুত, মাদায়েনবাসীসহ বিভিন্ন জাতিকে আল-কুরআনে আল্লাহ ফাসাদকারী হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ তারা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে জীবন-যাপনের পরিবর্তে বিকৃত পথে জীবনকে চালিত করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾

"যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল"।[২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾

"তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ, তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল, আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আনয়ন কর-যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।[৩]

উপরোল্লিখিত আয়াতদুটি ছাড়াও আল-কুরআনে অনেক স্থানে সন্ত্রাসের কাছাকাছি অর্থে 'ফাসাদ' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন: সূরা আন-নাম্‌ল-এর ৩৪ ও ৪৮ নং আয়াত, সূরা আল-বাকারাহ-এর ২০৫ ও ২৭ নং আয়াত, সূরা আল-মায়িদাহ-এর ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত।

---

১. সূরা আল-কাসাস: ৪
২. সূরা আল-ফাজর: ১১–১২
৩. সূরা আল-'আনকাবুত: ২৯

হাদীসে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ

ইসলামী শরী'আহ্‌র দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীসে সন্ত্রাস শব্দটি সরাসরি ব্যবহৃত না হলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন দিক বুঝাতে বেশ কিছু পরিভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সেসব পরিভাষার অন্যতম হলো, আল-কত্‌লু (الْقَتْلُ) বা হত্যা, আয-যুল্‌ম (الظلم) বা অত্যাচার, আত-তারভী, (الترويع) বা ভয় প্রদর্শন, হামলুছ ছিলাহ (حمل السلاح) বা অস্ত্র বহন করা, আল-ইশারাতু বিছ-ছিলাহ (الإشارة بالسلاح) বা অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত করা ইত্যাদি। তবে এসব পরিভাষা ছাড়াও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ডকে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস প্রসঙ্গ বুঝাতে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কয়েকটি নিম্নে উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো।

১. একে অপরের প্রতি অত্যাচার করা নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا﴾

"হে আমার বান্দাগণ! আমি আমার জন্য অত্যাচারকে হারাম করেছি এবং তা তোমাদের জন্যও হারাম করে দিয়েছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর অত্যাচারে লিপ্ত হয়ো না"।[১]

২. স্বাভাবিকভাবে একজনের রক্ত, সম্পদ, সম্মান হানী করা অপরজনের জন্য হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

"তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান পরস্পরের জন্য ঐরূপ হারাম যে রূপ হারাম তোমাদের এই শহর, তোমাদের এই মাস এবং তোমাদের এই দিন"।[২]

এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে সংশ্লিষ্ট অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

১. সহীহ মুসলিম, অধ্যায় : কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি ওয়াল আদাবি, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুয যুলম, বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবি, তা.বি., খ. ৪, পৃ. ১৯৯৪

২. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কওলিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুব্বা মুবাল্লাগিন আও'আ মিন সামিঈন, বৈরূত : দারু ইবনু কাছীর, ১৯৮৭, খ. ১, পৃ. ৩৭

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন"।[১]

অন্য স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবূল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত"।[২]

ইসলাম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই শান্তি। এ জীবনব্যবস্থার এরূপ নামকরণই প্রমাণ করে যে, মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার চিন্তা ইসলামের সামগ্রিক প্রকৃতি ও মৌল দৃষ্টিকোণ হতে উৎসারিত। তাই ইসলামের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান থেকে শান্তির ফল্গুধারা নিঃসৃত হয়। শান্তিময় পরিবেশের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য শান্তি বিঘ্নিত করে এমন সকল কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ অপরিহার্য। তাই যৌক্তিকভাবেই ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা ও এর স্থায়িত্ব বজায় রাখার স্বার্থে সকল ধরনের সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মূল করার নির্দেশনা দান করে। ইসলাম বলতে প্রথমত ও প্রধানত কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ বা হাদীসকেই বুঝায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, এই দু'টি জিনিসকে যতক্ষণ আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, সে দু'টি জিনিস হলো আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ তথা হাদীস"।[৩]

---

১. সূরা আল-ইমরান: ১৯

২. সূরা আল-ইমরান: ৮৫

৩. ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা, অধ্যায় : আল-ক্বাদর, অনুচ্ছেদ : আন-নাহ্ইউ আনিল কওলি বিল ক্বাদর, মিসর : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবিয়্যি, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৮৯৯

তাই সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা বলতে সন্ত্রাস প্রতিরোধে কুরআন ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহতে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে, সন্ত্রাস প্রতিরোধক আয়াত, হাদীস ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ এত বেশি যে, তার সবগুলো এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা অসম্ভব। তাই এ ব্যাপারে ঐ তিন উৎসের মৌলিক নির্দেশনাসমূহের কয়েকটি নিম্নে পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল–কুরআনের নির্দেশনা

আল-কুরআনে প্রথমত সাধারণভাবে সন্ত্রাসের কারণ সৃষ্টি হওয়ার ছিদ্রপথ বন্ধ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১. ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ ও অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ করতে নিষেধ প্রদান করে আল–কুরআনে নির্দেশনা এসেছে যে,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়–স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর”।[১]

২. সন্ত্রাস মূলত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের ফলেই সৃষ্ট। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করে আল–কুরআনে নিষেধজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

“বল, হে কিতাবীগণ! তোমরা তোমাদের দীন সম্বন্ধে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি কর না; এবং যে সম্প্রদায় ইতঃপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে ও সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করো না”।[২]

---

১. সূরা আল-নাহল: ৯০
২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৭৭

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন কর না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না"।[১]

উপরোক্ত প্রথম আয়াতে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে এবং দ্বিতীয় আয়াতে সশস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসঙ্গ বর্ণিত হলেও অন্যান্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি মুসলিমদের জন্যও সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

৩. পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ। সন্ত্রাস নিঃসন্দেহে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তাই সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল-কুরআনে নির্দেশনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾

"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটাইও না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী"।[২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশ্বখ্যাত মুফাসসির হাফিয ইবনে কাছীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض، وما أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد، ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباالدكتور فنهى الله تعالى عن ذلك

"শান্তি স্থাপনের পর ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় ও যে সকল কর্মকাণ্ড পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কেননা যখন কাজ-কারবার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যথাযথভাবে চলতে থাকে, তখন যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়, তবে তা হবে বান্দার জন্য বেশী ক্ষতিকর। এজন্য আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন"।[৩]

---

১. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৯০

২. সূরা আল-আ'রাফ: ৫৬

৩. ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, রিয়াদ : দারুত ত্বায়্যিবাহ লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', ১৯৯৯, খ. ৩, পৃ. ৪২৯

ইমাম কুরতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر

“স্বল্প-বিস্তর যতটুকুই হোক শান্তি স্থাপনের পর আল্লাহ পৃথিবীতে কম বা বেশি যাই হোক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন”।[১]

বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হতে নিষেধ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

“আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলো না; তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না, আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না”।[২]

এভাবে আল-কুরআনুল কারীমে অসংখ্য আয়াতে অন্যায়ভাবে মানব হত্যা, আহত করা, আত্মহত্যা করা, অন্যের সম্পদ লুট করা, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা ঘটানোসহ সন্ত্রাসের বিভিন্ন রূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, পরিণাম, প্রতিরোধ, শাস্তি সম্পর্কে নির্দেশনা এসেছে। এসব আয়াতের ব্যাখ্যা হিসাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসে এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যায়।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল–হাদীসের নির্দেশনা

সন্ত্রাস প্রতিরোধে আল–কুরআনে বর্ণিত নির্দেশনার আলোকে আল–হাদীসেও ব্যাপক নির্দেশনা এসেছে। প্রাসঙ্গিক কারণে কিছু হাদীস নিম্নে পেশ করা হলো-

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

---

১. ইমাম কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন, রিয়াদ : দারু 'আলামিল কুতুব, ২০০৩, খ. ৭, পৃ. ২২৬

২. সূরা আল-কাসাস: ৭৭

"বিবাহিতা ব্যভিচারী, হত্যার বদলে হত্যা এবং দ্বীন (ইসলাম) ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার অপরাধ ব্যতীত 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল' এ সাক্ষ্য দানকারী কোন মুসলিমের রক্ত বৈধ নয়"।[১]

২. সন্ত্রাস অর্থই হচ্ছে ত্রাস, ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি করা, অন্যকে আতঙ্কিত করা। কিন্তু আল-হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যে, কোন মুসলিমকে আতঙ্কিত করা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا

"কোন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিম ভাইকে আতঙ্কিত বা সন্ত্রস্ত করা বৈধ নয়"।[২]

৩. সন্ত্রাস একটি অন্যায় কর্ম। যে কোন অন্যায় কর্ম দেখে তা প্রতিরোধ করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব। সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ প্রচেষ্টা পরিচালিত করার নির্দেশনা প্রদান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি অন্যায় করতে দেখবে, সে যেন তাকে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে কথা দ্বারা প্রতিবাদ করবে, তাও সম্ভব না হলে অন্তর দ্বারা প্রতিবাদ করবে। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক"।[৩]

সন্ত্রাস প্রতিরোধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কার্যক্রম

মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে অশান্ত ও বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

"আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি"।[৪]

---

১. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আদ-দিয়াত , অনুচ্ছেদ : কওলুল্লাহ তা'আলা " ইন্নান নাফসা বিন নাফসি .... হুম যালিমূন (আল–মায়িদাহ – ৪৫), প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২৫২১

২. আবু দাউদ, অধ্যায় : আল – আদাব, অনুচ্ছেদ : মাই ইয়াখুযুশ শাইআ 'আলাল মিযাহি, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৫৮

৩. সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: আল ঈমান, অনুচ্ছেদ : বায়ানু কওলিন নাহয়ি 'আনিল মুনকারি মিনাল ঈমান .... ওয়াজিবানে, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৯

৪. সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭

এজন্য তিনি সর্বদাই বিশ্বে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন ও তৎপর ছিলেন এবং সন্ত্রাস, অন্যায়, অনাচার, অত্যাচার প্রতিরোধে সমগ্র জীবনে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিকে ছিলেন শান্তিস্থাপনকারীদের জন্য সুসংবাদদানকারী অপরদিকে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের জন্য ছিলেন সতর্ককারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে"।[১]

উজ্জ্বল প্রদীপরূপী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমগ্র জীবনে যে আদর্শ বাস্তবায়িত করেছেন, তা অনুসরণের মাধ্যমে আজো পৃথিবীতে শান্তি–শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস প্রতিরোধ করা সম্ভব। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ অনুকরণীয় হিসেবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেই গ্রহণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্বরণ করে, তাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"।[২]

ক. সন্ত্রাসীদের শাস্তিদান

সন্ত্রাস প্রতিরোধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ত্রাসীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। কারণ তিনি জানতেন সন্ত্রাসকে অঙ্কুরেই নির্মূল করা না হলে তা ক্রমেই সমাজ–রাষ্ট্র ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছবে। তখন ইচ্ছা হলেই তা আর নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। যেমন অবস্থা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে দেখা যাচ্ছে। তাই দূরদর্শী বিশ্বনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে সন্ত্রাসকে সমূলেই নির্মূল করেছিলেন। নিম্নের ঘটনাটি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: "উকল বা উরাইনা গোত্রের কিছু লোক (ইসলাম

১. সূরা আল-আহযাব: ৪৫–৪৬
২. সূরা আল-আহযাব: ২১

গ্রহণের উদ্দেশ্যে) মদীনায় এলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (সদকার) উটের নিকট যাওয়ার এবং পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। অতঃপর তারা যখন (উটের পেশার ও দুধ পান করে) সুস্থ হলো তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রাখালকে হত্যা করল এবং উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এ সংবাদ দিনের প্রথম ভাগেই (তাঁর নিকট) এসে পৌঁছল। তারপর তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য লোক পাঠালেন। বেলা বাড়লে তাদেরকে পাকড়াও করে আনা হলো। অতঃপর তাঁর আদেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হলো। উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে তাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়া হলো এবং গরম পাথুরে ভূমিতে তাদের নিক্ষেপ করা হলো। এমতাবস্থায় তারা পানি প্রার্থনা করছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি। আবূ কিলাবাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এরা চুরি করেছিল, হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, ঈমান আনার পর কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরূদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল"।[১]

খ. সন্ত্রাসীদের উৎখাতকরণ

দেশ থেকে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাস নির্মূলের প্রয়োজনে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও সন্ত্রাসীদেরকে গোষ্ঠীসহ উৎখাত করেছিলেন। ইয়াহুদী গোত্র বানূ নাযীর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সন্ত্রাসী হামলার মাধ্যমে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে তাদের আবাসস্থল থেকে উৎখাত করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেয়ার মাধ্যমে মদীনাকে সন্ত্রাসমুক্ত করেন। ঘটনাটির বিবরণ হলো :

"সাহাবী আম্‌র ইবনে উমাইয়া আদ–দামরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বানূ 'আমিরের দু'জন লোককে ভুলবশত শত্রুপক্ষ মনে করে হত্যা করেন। প্রকৃত ব্যাপার হল, বানূ 'আমিরের সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৈত্রীচুক্তি ছিল। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 'রক্তপণ' দিতে মনস্থ করেন। আর এ কাজে সহযোগিতা ও মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি ইয়াহূদীদের সবচেয়ে বড় গোত্র বানূ নাযিরের নিকট যান। তাদের ব্যবসা ছিল মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে উপকণ্ঠে। বানূ 'আমিরের সাথে বানূ নাযীরেরও মৈত্রীচুক্তি ছিল। বানূ নাযিরের লোকজন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বরং তাঁর সাথে প্রথমত খুবই ভাল ব্যবহার করে। তারা এ ব্যাপারে তাঁকে সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস দেয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র পাকাতে থাকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু

---

১. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আল–উযূ, অনুচ্ছেদ : আবওয়াবুল ইবিলি ওয়াদ- দাওয়াব্বি ওয়াল-গানামী ওয়া মারাবিযিহা, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের একটি দেয়াল ঘেষে বসে ছিলেন, তাঁর সাথে আবূ বকর, ওমর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখ দশজন সাহাবীও ছিলেন। বানূ নাযীরের লোকজন নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করতে লাগলেন যে, এমন মোক্ষম সুযোগ আমরা আর কখনো পাব না। আমাদের কেউ যদি ঘরের ছাদে উঠে তাঁর মাথার উপর একটি ভারী পাথর ছেড়ে দেয় তবে আমরা চিরতরে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব। 'আমর ইব্‌নে জাহ্‌হাশ ইব্‌নে কা'ব নামে তাদের এক লোক বলল, আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত। এই বলে সে ঠিকই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর পাথর ছেড়ে দেয়ার জন্য সবার অলক্ষ্যে ঘরের ছাদে উঠে গেল। তখনই মহান আল্লাহ্ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ওহী মারফত এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন। সাথে সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখান থেকে উঠে পড়েন এবং কাউকে কিছু না বলে সোজা মদীনায় চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে থাকা সাহাবীগণও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর মদীনা থেকে আগত এক ব্যক্তিকে পেয়ে তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি বলল, আমি তাঁকে মদীনায় প্রবেশ করতে দেখেছি। অতঃপর তাঁরা মদীনায় এসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাদেরকে ইয়াহূদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানালেন এবং সকলকে রণপ্রস্তুতি নিয়ে তাদের মুকাবিলা করার জন্য বের হবার নির্দেশ দিলেন।[১] এভাবে তিনি সন্ত্রাসীদের উৎখাত করেন।

উপসংহার :

বিশ্ববাসী ইসলামের ব্যাপক আবেদন থাকা সত্ত্বেও হিংসা ও স্বভাবজাত শত্রুতাবশত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বিশেষ করে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা ইসলাম ও মুসলিমদের নামে নানা কুৎসা রটাচ্ছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ইসলাম ও এর অনুসারীরা ইসলাম বিরোধীর নিকট থেকে যেসব ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে বর্তমান সন্ত্রাসকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার অপচেষ্টাও সেসবের অন্যতম। একদিকে ইহুদী-খ্রিষ্টান-পৌত্তলিকদের ষড়যন্ত্র অপরদিকে জন্মগতভাবে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্তি, এদুয়ে মিলে ইসলাম আজ পৃথিবীতে 'ভুলবোঝা ধর্মে' (The Misunderstood Religion) পরিণত হয়েছে। তবে আশার কথা, মুসলিমরা এখন ধীরে ধীরে তাদের অজ্ঞতা ও ভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করার চেষ্টা শুরু করেছে। সন্ত্রাসের সাথে যে ইসলামের কোন রকম সম্পর্ক নেই সে কথা উপর্যুক্ত আলোচনায় কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়েছে। ইসলামের

---

১. সহীহ আল-বুখারী, অধ্যায় : আত-তাফসীর, অনুচ্ছেদ : মা কতা'তুম মিন লিনাতিন, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৪৭৯

অবস্থান কুরআন, হাদীস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনাদর্শে চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। কুরআন, হাদীস ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনাদর্শ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, বরং চরম বিরোধী। শান্তিকে বিঘ্নিত করে এমন কোন কর্মকাণ্ডকে ইসলাম সমর্থন করে না, উপরন্তু বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের চিরন্তন নীতি। ইসলাম স্বভাবগত কারণেই কখনো সন্ত্রাসে বা বিশ্বশান্তি নষ্ট করে এমন কর্মে উৎসাহ, সমর্থন, অনুমোদন দেয় না। মুসলিম কখনো সন্ত্রাসী হতে পারে না। তাছাড়া গুটিকতক তথাকথিত মুসলিমের কর্ম বিচার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত করা কখনোই উচিত নয়।

(অত্র প্রবন্ধটি 'ইসলামী আইন ও বিচার' পত্রিকার বর্ষ-৮, সংখ্যা-৩২ (অক্টোবর-ডিসেম্বর: ২০১২)-এ প্রকাশিত লেখকের মূল প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তরূপ।)

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে ইসলামের নির্দেশনা

ارشادات الإسلام لمدافعة الإرهاب والفساد

হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল

চেয়ারম্যান

তানযীমুল উম্মাহ ফাউন্ডেশন, উত্তরা, ঢাকা

ইসলাম শান্তি, শৃঙ্খলা, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহানুভূতির ধর্ম। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি ভালোবাসা, দয়া, সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের শিক্ষাই ইসলামের নির্দেশনা। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর উদারতা, ক্ষমাশীলতা, পরোপকার ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে সর্বোপরি ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন যুগের অগণিত মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে এবং শান্তির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। আজো ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রতি মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। ফলে ইসলামবিদ্বেষীরা রীতিমতো চিন্তিত ও আতঙ্কিত। তারা ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার অভিপ্রায়ে ইসলামের নামে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে ইসলাম ধর্মকে বিতর্কিত করে তুলছে। ইসলাম কখনোই সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না বরং এগুলোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হত্যা, রক্তপাত ও অরাজকতা প্রত্যাখ্যান করেছে। ইসলাম পাপ, মন্দ ও যাবতীয় খারাপ কাজ থেকে বিরত থেকে সৎ ও ভালো কাজের নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"।[১]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ

সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদ ত্রাস শব্দ হতে উদ্ভূত। এর অর্থ হল ভয়, ভীতি, শঙ্কা। সন্ত্রাস হল আতঙ্কগ্রস্ত করা, অতিশয় ত্রাস বা ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা। আর সন্ত্রাসবাদ হল, রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য হত্যা, অত্যাচার ইত্যাদি কার্য অনুষ্ঠান নীতি। যার ইংরেজি হল Terrorism. এর অর্থ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় বলা হয়েছে: The systematic use of violance to create a general climate of fear in a population and thereby to bring about a particular political objective. অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কোন জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রণালীবদ্ধ সহিংসতার মাধ্যমে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

জঙ্গি, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদী শব্দগুলোর মূল হল জঙ্গ। এটি ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দ। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, তুমুল কলহ, লড়াই, প্রচণ্ড ঝগড়া। জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা। সেভাবে জঙ্গিবাদ

১. সূরা আলে ইমরান : ১১০

অর্থ জঙ্গিদের মতবাদ, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মকাণ্ড। ইংরেজীতে বলা হয় Militant, Militanc কিংবা Military activities. Oxford Advanced Learner's Dictionary-তে বলা হয়েছে : Militant adj, Favouring the use of force or strong pressure to achieve one's aim. অর্থাৎ কারো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তি প্রয়োগ বা প্রবল চাপ প্রয়োগ। জঙ্গিবাদ শব্দটির আরবী ব্যবহার আমরা দেখতে পাই তা হল (الإرهاب) অর্থাৎ কাউকে ভয় দেখানো, সন্ত্রস্ত করে তোলা, ভীতি প্রদর্শন করা। পারিভাষিক অর্থে ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে চোরাগোপ্তা হামলা, অতর্কিত আক্রমণ, হত্যা করা, আত্মঘাতী হামলা কিংবা কোন নির্দিষ্ট মতবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনগণের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করাকে জঙ্গিবাদ বলে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান। সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই হলো ইসলাম। মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলাম বানানোই ইসলামের লক্ষ্য। ইসলাম ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবনসহ সমাজ ও রাষ্ট্রে সুখ, শান্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। সেসব নির্দেশনা পালন করার মাধ্যমেই সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মূলোৎপাটন করা সম্ভব। এজন্য কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

"তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না"।[১]

১. সমাজে বিশৃঙ্খলা, গোলযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা নিষেধ

ইসলাম সুশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন করতে নির্দেশ প্রদান করে। তাই ইসলামের বক্তব্য হলো: সমাজে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ সৃষ্টি করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

"পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না"।[২]

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্ : ৩৮

২. সূরা আল-আ'রাফ : ৫৬ : ৮৫

২. আত্মঘাতী হামলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠি তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে জঘন্য কর্মটি করে থাকে সেটা হলো আত্মঘাতী হামলা। অথচ আল্লাহ তা'আলা নিজের জীবনকেও ধ্বংস করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

"তোমরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না"।[১]

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর দয়ালু"।[২]

৩. আত্মঘাতী হামলা জাহান্নামে যাবার কারণ হবে

আত্মঘাতী হামলা ও আত্মহত্যা প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। ইসলাম ধর্ম কোনো অবস্থাতেই এমন কাজ করার অনুমতি দেয়নি। এ বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَه يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَه يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ-

"যে ব্যক্তি নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করবে (আত্মহত্যা করবে) সে জাহান্নামে নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করবে। আর যে নিজেকে আঘাত করবে (আত্মহত্যা করবে), সে জাহান্নামেও নিজেকে আঘাত করবে"।[৩]

৪. মানব হত্যা জঘন্য অপরাধ

মানবজীবন মহান আল্লাহর নিকট অত্যন্ত সম্মানিত ও পবিত্র। ইসলামে মানব হত্যা একটি জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ একজন মানুষকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হত্যার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্ : ১৯৫
২. সূরা আন-নিসা : ২৯
৩. সহীহ আল-বুখারী : ১৩৩৬

"যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করার কিংবা ভূ-পৃষ্ঠে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়াই কাউকে হত্যা করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করলো, আর যে ব্যক্তি কোন একজন মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই রক্ষা করলো"।[১]

৫. সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না

মানবতা ও বিশ্বশান্তির ভয়ঙ্করতম শত্রু হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদ। তাই বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও গোলযোগের সাথে কোনভাবেই সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِيْ الأَرْضِ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ﴾

"তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ, সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না"।[২]

৬. সমাজে অশান্তি সৃষ্টিকারীরা কখনো সফল হবে না

যারা সমাজে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা বা গোলযোগ সৃষ্টি করতে চায়, তারা কখনো সফলকাম হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

﴿إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ﴾

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারী, দুষ্কর্মীদের কর্ম সার্থক করেন না"।[৩]

৭. বিশৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা করা গুরুতর অপরাধ

ইসলামে ফিতনা-ফাসাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা জঙ্গিবাদকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত শান্তির পৃথিবীতে কেউ যেন শান্তি বিনষ্ট না করতে পারে সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কঠোর হুশিয়ারী দিয়েছেন। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩২
২. সূরা আল-কাসাস : ৭৭
৩. সূরা ইউনুস : ৮১

"আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মাসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা প্রাণহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ"।[১]

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয়

১. সর্ব পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা চালু করা

ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যার মধ্যে সকলের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। সেজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা চালু একান্ত প্রয়োজন। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করা যাবে না। ইসলাম সকলের জন্য ইলম হাসিল বাধ্যতামূলক করেছে । এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"ইলম অণ্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয"।[২]

২. মিথ্যা সংবাদ পরিহার করা

মিথ্যা সকল অন্যায় কাজের মূল। বিশেষ করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করার কারণে সত্য চাপা পড়ে যায়। এর ফলে যারা সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী কাজে সম্পৃক্ত থাকে তারা চিহ্নিত হয় না। মিথ্যা সংবাদ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে উৎসাহ যোগায়। তাই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সর্বপর্যায়ে মিথ্যা সংবাদ পরিহার করতে হবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

"হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে"।[৩]

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্ : ২১৭
২. সুনান ইবনে মাজাহ : ২২৪
৩. সূরা আল-হুজুরাত : ৬

৩. সর্ব প্রকার জুলুম বন্ধ করা

ইসলামে জুলুম নিষিদ্ধ। জুলুম বা অত্যাচার হলো কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করা। সমাজে অশান্তির অন্যতম কারণ হলো জুলুম-নির্যাতন। সেজন্য সর্বপ্রকার জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর জুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"।[১]

৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করা

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ । জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা অপরিহার্য। সমাজের প্রতিটি স্তরে এ কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষ করে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ﴾

"তোমাদের মধ্য হতে এমন একটি জাতি হওয়া উচিত যারা সকল ভাল তথা উত্তম বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে, আসলে তারাই হচ্ছে সফলকাম সম্প্রদায়"।[২]

৫. মদ, জুয়াসহ অসামাজিক কার্যক্রম বন্ধ করা

মদপান ও জুয়া খেলা সামাজিক অনাচার ও অপরাধের মধ্যে অন্যতম। এ দু'টি ব্যক্তি চরিত্র হতে সমাজ চরিত্রকেও কলুষিত করে। ফলে তাদের দ্বারা সমাজে পারস্পরিক কলহ বিবাদ, মারামারি ও হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত সংঘটিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

১. সূরা আশ-শুরা : ৪২

২. সূরা আলে ইমরান : ১০৪

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِى ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, টার্গেট করে পশু বধ করা ও মূর্তির নামে গোশত বণ্টন শয়তানী কাজের অপবিত্রতা। সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ কর তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে। মনে রেখ শয়তান এ মদ্যপান ও জুয়া খেলার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরে চরম শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি করতে সদা সচেষ্ট। সে তোমাদেরকে সালাত ও আল্লাহর স্মরণ হতে বিরত রাখতে ইচ্ছুক। এখন জিজ্ঞাসা এই যে, তোমরা কি এ কাজ থেকে বিরত থাকবে"?[১]

৬. সকল ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা

ইনসাফ হলো ন্যায্যতা যার যা প্রাপ্য তা প্রদান করা। ইনসাফের অনুপস্থিতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ জন্ম নেয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সকল পর্যায়ে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত"।[২]

৭. পারস্পরিক সংশোধন পদ্ধতি চালু রাখা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার আকৃতি-প্রকৃতি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের দিক থেকে হরেক রকম করে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণে স্বভাবগতভাবেই একজন তার জীবনে

---

১. সূরা আল-মায়িদা : ৯০-৯১

২. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ০৮

আক্বীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও মতের দিক থেকে ভিন্ন মতের আরেকজনের সম্মুখীন হতে পারে। এ অবস্থায় ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদেরকে সংশোধনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। এ সংশোধন প্রক্রিয়া সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন"।[১]

৮. শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা দূর করে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا﴾

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে"।[২]

---

১. সূরা আল-হুজুরাত : ০৯

২. সূরা আলে ইমরান: ১০৩

আমরা সকলে জানি, ইসলাম অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা ও মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবকুলের শান্তি, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও উন্নতির জন্য মনোনিত করেছেন ইসলামকে। অতএব একজন মানুষ অপর কোন মানুষের অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণ হতে পারে না। বোমাবাজি, মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও আত্মঘাতী তৎপরতা ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যারা এগুলো করছে তারা বিভ্রান্ত, ইসলাম বিরোধীদের ক্রীড়নক। ইসলামের নামে যেকোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড অনৈসলামিক ও অনৈতিক। ইসলাম সর্বদা মানুষে মানুষে হৃদ্যতা ও সৌহার্দ্য স্থাপনের মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধির পৃথিবী গড়ার তাকিদ দেয়।

সন্ত্রাস দমনে ইসলাম

الإسلام لمكافحة الإرهاب

ড. মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দিন

বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও

ডীন, কলা অনুষদ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

সন্ত্রাস ইসলামে নিন্দনীয়, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর স্থান ইসলামে নেই। কোন রকম সন্ত্রাসের স্বীকৃতি ইসলাম দেয় না। বরং সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। ইসলামই মূলত সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটন করে মানব সমাজে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ, মর্যাদাবোধ, নিষ্ঠা, সততা, অশ্রদ্ধা, কপটতা, অন্যায়, যুলুম, নিপীড়ন, অবিচার, স্বার্থপরতা, অসততা, বিশ্বাসঘাতকতা নিষ্ঠুরতাকে পদদলিত করে সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব উপহার দেয়াই যে ইসলামের মূল শিক্ষা তা তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শান্তির আশ্রয় ইসলাম। অন্ধকার যুগের ইতিহাসকে মুছে দিয়ে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার যে অধ্যায় প্রায় ১৫শ বছর ইসলাম রচনা করেছে আজকের পৃথিবীতে তার আবেদন এখনো ফুরিয়ে যাবে না। নিঃশেষ হয়নি তার বিমল আদর্শের প্রয়োজনীয়তা। কিয়ামত সংঘটিত হবার পূর্বে তা কখনো হবেও না। সে জন্যেই ইসলাম স্বীকৃতি পেয়েছে একটি সর্বকালীন ও সার্বজনীন ধর্ম বা বিধান হিসেবে। ইসলামের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি করলে সে সত্যই উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তাই সময়ের চাহিদা মেটাতে ও যুগ সমস্যার সমাধানের বিধান হিসেবে ইসলামের কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান বিশ্বে সবচাইতে আলোচিত বিষয় হলো সন্ত্রাস। এর ভয়াল থাবা আজ বিশ্বকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ফেলেছে। অন্যায়-অত্যাচারের প্রত্যক্ষ মদদকারী হিসেবেই সন্ত্রাসী শক্তি বিশ্বকে ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার নরক রাজ্য কায়েম করে চলছে। নির্বিচারে হত্যা, রক্তারক্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ বিশ্ব অস্থিরতার হেন কোন দিক নেই যা সন্ত্রাসী পোষকতায় লালিত হচ্ছে না। কোন জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ, মঙ্গলকামী বক্তব্য যখনই সন্ত্রাসবাদীদের স্বার্থে আঘাত হানছে তখন সেসবের টুটি চেপে ধরতে বিন্দুমাত্র দ্বিধান্বিত হচ্ছে না তারা। আজ তারা শান্তিপ্রিয় মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করে তাদের উপর অমানুসিক যুলুম নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহর বাণী

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾

"এই কারণেই বনী ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে, প্রাণহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল

মানুষকে হত্যা করল, আর কেউ কারোও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রান রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিলেন, কিন্তু এর পরও তাদের অনেকে দুনিয়ায় সীমালঙ্ঘনকারীই রয়ে গেল"।[১]

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহর তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন "।[২]

এ মর্মে রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি মিল্লাতে ইসলামের অনুসরণ করে না বরং মুসলিম জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে যায়, সে যদি এ অবস্থায় মারা যায় তবে সেটা কুফরী যুগের মৃত্যু বিবেচিত হবে"।[৩]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, "আসমান ও যমীনের সমস্ত বাসিন্দাও যদি একজন মু'মিনকে হত্যা করার ব্যাপারে শরীক থাকে তবে তাদের সবাইকে মহান আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"।[৪]

সন্ত্রাস দমনে ইসলামের ব্যবস্থা :

১.ইসলাম পৃথিবীতে সকল প্রকার বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা ও সীমা লঙ্ঘনকে নিষেধ করেছে:
আল্লাহর বাণী

﴿وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾

"দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না"।[৫]

﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৩২
২. সূরা আন-নিসা: ৯৩
৩. সহীহ আল-বুখারী, পৃ. ১৩৪৯
৪. জামে আত তিরমিযী, দিল্লী, ভারত, মাকতাবা, রাশিয়া, তাবি. ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯
৫. সূরা আল-বাকারাহ: ৬০

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস"।[১]

﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَـئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর উহা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত"।[২]

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾

"তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না, তারা বলে আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী"।[৩]

﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَـكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

"তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাভূত করল, দাউদ জালূতকে সংহার করল, আল্লাহ তাকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন। তা তাকে শিক্ষা দিলেন আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল"।[৪]

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾

"যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না"।[৫]

﴿وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا﴾

"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় ঘটাইও না"।[৬]

---

১. সূরা আর্-র'দ: ২৫
২. সূরা আল-বাকারাহ্: ২৭
৩. সূরা আল-বাকারাহ্: ১১
৪. সূরা আল-বাকারাহ্: ২৫১
৫. সূরা আল-বাকারাহ্: ২০৫
৬. সূরা আল-আ'রফ: ৫৬

হাদীস:

বাহরাইন থেকে উক্ল ও উরায়না গোত্রের আটজন লোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহন করল। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তার অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাদের পেট ফুলে গেল এবং শরীর হলূদ হয়ে গেল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাদের এ অবস্থা জানানো হলে তিনি তাদেরকে সাদকার উটের চারণভূমিতে গিয়ে উটের প্রশ্রাব ও দুধ পান করতে বললেন। সেখানে গিয়ে তারা সাদকার উটের প্রসাব ও দুধ পান করে সুস্থ হয়ে উঠল। অতঃপর তারা উটের রাখাল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আযাদকৃত দাস 'ইয়াসার' কে হত্যা করল। এক বর্ণনা মতে প্রথমেই তারা কাঁটা দিয়ে তাঁর চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল। অতঃপর উটগুলো নিয়ে তারা পলায়ন করে। সকালের দিকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তিনি তাদের সন্ধানে লোক পাঠালেন। ইমাম মুসলিমের এক বর্ণনা মতে এ সংবাদ যখন পৌঁছল তখন তার কাছে আনসারদের বিশজন যুবক অশ্বরোহী ছিলেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পাঠিয়ে দিলেন সাথে পদচিহ্ন বিশারদ এক লোককে পাঠালেন। দুপুরের দিকে তারা তাদেরকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন। অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নির্দেশে তাদের হাত পা কেটে দেয়া হল। চোখ উপড়ে ফেলা হল এবং এমতাবস্থায় মরুভূমির তপ্তরোদে ফেলে রাখা হল। এ অবস্থায়ই তারা মৃত্যুবরণ করল। এ শাস্তির প্রচণ্ডতা এমন ছিল যে, তারা পানি চাচ্ছিল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হয়নি"।[১]

আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

"সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবশ্যই আল্লাহর নিকট একজন মুসলমানকে হত্যা করার তুলনায় অধিক তুচ্ছ ও নগণ্য"।[২]

---

১. সহীহ আল-বুখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬০২

২. সুনান আত-তিরমিযী: ১৩৯৫

আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ

"আসমান-জমিনের সকলে মিলে যদি একজন মু'মিনকে হত্যা করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা (এর শাস্তি স্বরূপ) সকলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন"।[১]

প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা প্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা :

আল্লাহর বাণী

﴿لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾

"আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত তুলবো না; আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি"।[২]

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর"।[৩]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কোন ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু যখন আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হতো তখন তিনি আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন"।[৪]

---

১. সুনান আত-তিরমিযী: ১৩৯৮
২. সূরা আল-মায়িদাহ: ২৮
৩. সূরা আল-মায়িদাহ: ২
৪. সহীহ আল-বুখারী: ৩৫৬০

ইসলামের মহান আদর্শ সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিশোধ পরায়ন না হওয়া। আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করা প্রতিশোধের চিন্তা না করা। তবে শরীয়তের সীমালঙ্ঘিত হলে প্রতিশোধ নেয়ার বৈধতাও রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র জীবনে কখনও প্রতিশোধ নেননি।

জিহাদ বনাম সন্ত্রাস দমন

আল্লাহর বাণী

﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘন কারীদেরকে ভালোবাসেন না"।[১]

উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন যে,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ﴾

"তোমরা যদি প্রতিশোধ নিতে তাহলে তারা (অমুসলিমরা) যতটুকু কষ্ট দিয়েছে ততটুকু নাও। আর যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর তা ধৈর্য্যশীলদের জন্য বেশী উত্তম"।[২]

হাদীস:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা দেন,

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ

"যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নেয় সে নিরাপদ"।[৩]

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

---

১. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯০

২. সূরা আন-নাহল: ১২৬

৩. সহীহ মুসলিম: ৪৭২২

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন"।[১]

মন্তব্য : সন্ত্রাস যে ধরনেরই হোক তা অবাঞ্ছিত, ইসলাম এটা দমনে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছে, এর অন্যতম মাধ্যম হলো জিহাদ। বাড়াবাড়ি হলে জিহাদে অংশ নিয়ে সন্ত্রাস দমন করতে বলা হয়েছে। তবে জিহাদে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। আশ্রয়প্রার্থী, সন্ধি চুক্তি করতে আগ্রহী, নারী ও শিশুদের আক্রান্ত করা এবং সবুজ গাছপালা ও ফলের বাগান নষ্ট করা যাবে না।

পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে সন্ত্রাস দমন

আল্লাহর বাণী

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ اللهِ وَلاَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلآئِدَ وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"হে মু'মিনগণ, তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শন সমূহের, সম্মানিত মাসের, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশুর নিদর্শনস্বরূপ গলায় পরানো চিহ্ন বিশিষ্ট পশুর, এবং আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের আশায় সম্মানিত গৃহ অভিমুখী যাত্রীদের। তোমরা যখন ইহরাম থেকে মুক্ত হও, তখন শিকার করতে পারো। যারা তোমাদেরকে মসজিদে হারামে প্রবেশে বাধা দেয়, তাদের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের সীমালঙ্ঘনের কারণ না হয় নেক কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনের ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করো, আর পাপ কাজ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে বড়ই কঠোর"।[২]

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও"।[৩]

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৩০১৫
২. সূরা আল-মায়িদাহ্: ২
৩. সূরা আল-হুজরাত: ১০

হাদীস:
আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের প্রতি অত্যাচার করবে না। এবং অপরকে পরিত্যাগ করবে না"।[১]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

"প্রকৃত মুসলিম সে যার হাত ও মুখ থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে, এবং মু'মিন সে যার নিকট হতে মানুষ তাদের জানমালের নিরাপত্তা পায়"।[২]

উবাদা ইবনুস সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ না করতে এবং অন্যের ক্ষতিসাধন না করতে"।[৩]

বিশ্বের সমগ্র মানব ভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধনে আবদ্ধ পরস্পরকে সহযোগিতা করা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহানুভূতি ইসলামের শিক্ষা, সহযোগিতা না করে অন্যকে আক্রান্ত করা বাঞ্ছনীয় নয়, সেহেতু কেউ যদি কারও দ্বারা আক্রান্ত হয় সকলে মিলে তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়ানো উচিত, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও এ অভিন্ন নীতিমালা প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ সকলে মিলে সন্ত্রাস দমনে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে, প্রকৃত মুসলমান তো সেই যার মুখ হতে অন্যেরা নিরাপদে থাকে।

তথ্য সন্ত্রাস দমনে ইসলামের প্রতিকার :

আল্লাহর বাণী :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

---

১. সুনান আবু দাউদ: ৪৯৪৬
২. সুনান আত-তিরমিযী: ২৬২৭
৩. সুনান ইবনে মাজাহ: ২৩৪০

"যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মান্তিক শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না"।[১]

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً﴾

"যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য যা তারা করে নাই; তারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে"।[২]

হাদীস :

সুফিয়ান বিন আসীদ আল-হাজরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন,

كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ

"অত্যন্ত বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বলো সে ওটাকে সত্য মনে করে অথচ তুমি তাতে মিথ্যাবাদী"।[৩]

তথ্য সন্ত্রাস শব্দটি বাহ্যত আধুনিক কিন্তু বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা ইসলামে এর ব্যবহার অতি প্রাচীন, ইসলাম যেহেতু সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য অতএব সবকিছুর দিক নির্দেশনা এতে থাকবে এটাই স্বাভাবিক তাই সব ধরনের সন্ত্রাস ও অপরাধ এর উল্লেখ ও তার প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে। বর্তমান আধুনিক বিশ্বে তথ্য সন্ত্রাস এমনই এক সন্ত্রাসে রূপায়িত হয়েছে যা সকল সন্ত্রাসের শীর্ষে চলে গেছে, সাধারণ সন্ত্রাসের গ্রাউন্ড ওয়ার্ক তথ্যসন্ত্রাসের দ্বারাই করা হয়ে থাকে। তথ্য বিকৃতি, মিথ্যাচার, অপপ্রচার, প্রপাগান্ডা ইত্যাদি সংবাদ মাধ্যমগুলোতে নৈমত্তিক বিষয়। অথচ এর ভয়াবহতা নৃশংসতা ও পরিণতির কারণে দেড় হাজার বছর পূর্বেই ইসলাম তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অতএব আসুন আমরা ইসলামের সুমহান আদর্শে আদর্শবান হয়ে সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে অক্টোপাসের মত ছড়িয়ে পড়া সন্ত্রাস দমনে ব্রতি হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন !

---

১. সূরা আন-নূর: ১৯

২. সূরা আল-আহযাব: ৫৮

৩. সুনান আবু দাউদ: ৪৯৭৩

জিহাদ মানে কি সন্ত্রাস ?

هل الجهاد يعني الإرهاب؟

এমদাদুল হক খান

প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

জিহাদ! অতি পবিত্র একটি শব্দ। পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলা বার বার এর কথা উচ্চারণ করেছেন। অসংখ্য হাদিসে এর কথা অতীব গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় বদর রনাঙ্গণ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধসহ শতাধিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে যা ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র ইসলাম ও ইসলামের ঐতিহ্য রক্ষায় বিধর্মীদের সাথে ধর্ম যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, এক দেশ অন্য দেশের সাথে লড়াই, স্বজাতির অস্তিত্বের লড়াই, মাজলুম ও নিপীড়িতের পক্ষে তাদের উদ্ধারের লড়াই; এসবইতো যিহাদ। এর নামই তো মহান মুক্তিযুদ্ধ। আর এ যিহাদই মহা পবিত্র যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বার বার পবিত্র কুরআন-হাদিসে এর উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে এই বাংলাদেশের রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় একদল মস্তিস্ক বিকৃতিসম্পন্ন যুবক যেভাবে জিহাদের নামে মানুষ হত্যা করছে, যেভাবে দেশে বিদেশে এই জাতি ও দেশটার মান-সম্মানকে খাটো করছে, ইসলামের নামে যেভাবে মানুষ খুন করে এই পবিত্র মহান ধর্মটার বদনাম করছে- তার নাম কি জিহাদ? এটা কি পবিত্র যুদ্ধ? আর কার বিরুদ্ধে এরা যিহাদ করছে? কাদের রক্ত নিয়ে খামোকা মজা করছে? ইসলাম ধর্মে এভাবে মানুষ হত্যা করার অনুমতি আছে কী ? মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক, স্বজাতি হোক কিংবা বিজাতি হোক একটি শান্তিপ্রিয় দেশে কাউকে হত্যা করার অনুমতি ইসলাম এদের দিয়েছে কী ?

গত ১ জুলাই আমাদের কিছু বিপদগামী সন্তানরা গুলশানের "হলি আর্টিজান" রেস্তোরায় যে ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করল এছাড়া পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিনে ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠে যে ন্যাক্কারজনক হত্যাযজ্ঞ চালালো এটা কি ইসলাম ধর্ম কোনদিন সর্মথন করে? পবিত্র কোরআনে বা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসবের অনুমতি কখনো কি দিয়েছেন?

একজন বিদেশী মানুষ যখন এই দেশে ব্যবসা কিংবা পর্যটনে আসেন তখন রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সাধারণ একজন নাগরিকের উপর তাদের হেফাজতের দায়িত্ব বর্তায়। তাদের যাবতীয় নিরাপত্তা প্রদান করার দায়িত্বও এই রাষ্ট্র ও সকল নাগরিকেরই বটে। একটি জাতি, একটি রাষ্ট্রের ইজ্জত-সম্মান হলো বিদেশীদের সাথে ভাল আচরণ, ভাল ব্যাবহার করার মাধ্যমে। একটি রাষ্ট্র ও জাতির সম্ভ্রম ও ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয় অন্যের সাথে সদাচারণ করার মাধ্যমে। আজ সমগ্র বিশ্ববাসি ভাল আচরণ করে স্বজাতিকে উচ্চে উঠানোর চরম প্রতিযোগীতায় নেমেছে। সমগ্র দুনিয়ায়

চলছে রাষ্ট্রের সম্মান বৃদ্ধির মহা অগ্রযাত্রা। গ্রীনল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডসহ সকল দেশের নাগরিকরা সদাচারণ প্রদর্শণ করে গোটা বিশ্বে স্বীয় রাষ্ট্র ও জাতির সুনাম বৃদ্ধি করার দারুণ প্রতিযোগীতায় নেমেছে। তাহলে কেন আমাদের কিছু বিপদগামী সন্তানরা এই অঘটনগুলি বারবার ঘটাচ্ছে? কেন তারা বিশ্বের কাছে আমাদের দেশ ও জাতিটাকে খাটো করছে? কেন আজ আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে এতটা অপমানিত আর লজ্জিত? কেন তারা আমাদের এই দেশটির কথা একবারও ভাবলোনা ? কেন তারা এই জাতি ও ধর্মের কথা একটিবারও চিন্তা করলো না? কেন তারা এতখানি জঘন্য পর্যায়ে গিয়ে বিপদগামী হল? কেন এদের বাবা-মা ও শিক্ষকগণ এদের ভাল পথ দেখাতে পারলেন না? কেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেও সুশিক্ষার তরীতে চড়েও কুশিক্ষার আচরণ ঘটাল? কেন তারা এই রাষ্ট্র ও জাতিকে সমগ্র বিশ্বের দোয়ারে ইতিহাসের এক আস্তাকূড়ে নিক্ষেপ করতে সক্ষম হল? এসব হাজারো প্রশ্ন আজ লাখো মা-বাবার নিকট। অসংখ্য প্রশ্ন আজ লাখো শিক্ষকবৃন্দের নিকট।

একজন মানুষের জীবনটা যখন তার শিশুকাল অবস্থায় থাকে তখন তার কোন দায়িত্ব বা রেস্‌পনসিবিলিটি থাকেনা। আবার যখন এই মানুষটাই যৌবনের জগতে পা রাখে তখন তার কিছুটা দায়িত্ব এসে যায়, যেমন বন্ধুদের সাথে তাকে আদর্শ বন্ধু হিসেবে থাকতে না পারলে তার বন্ধুরা বলবে- এই বন্ধুটির আচরণ ভাল নয়। আবার যদি তার পিতা-মাতার সাথে আচরণ ভাল না হয়, তখন তার বাবা-মা বলবেন- এই ছেলেটার ভবিষ্যৎ লক্ষণ খারাপ। ঠিক এই যুবকটার বিয়ের পরে তার দায়িত্বভার বেড়ে গিয়ে বন্ধুমহলসহ ভাই-বোন, বাবা-মা ও শশুড়-শাশুড়ীদের প্রতি সদাচারণেরও দায়িত্ব বর্তায়। তেমনিভাবে এই মানুষটা যখন সন্তানের পিতা-মাতা হন, তখন অবশ্যই সন্তানের লালন পালন করা, সুশিক্ষা দেওয়া আর ভাল আদর্শ সন্তান হিসেবে তৈরী করার দায়িত্ব ভারটাও কি তার উপর আসে না ? যদি পিতা-মাতার একটু অবহেলার কারণে সন্তান পথভ্রষ্ট হয় এতে কি পিতা-মাতা দায়ি নন ? যদি সন্তান কোন কারণে দুষ্টু বন্ধু কিংবা চরিত্রহীন ব্যাক্তির সংমিশ্রণে গিয়ে বিপদগামি হয়, আর দেশ ও জাতির কাছে অপরাধী হয়, এর দায়িত্বও কি পিতা-মাতার নয় ? আর যদি একান্তই সন্তানদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হয় তাহলে জাতির স্বার্থে, দেশের স্বার্থে আইনের আশ্রয় নেয়া যায়। অথবা আগে থেকেই তাদরেকে কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে পাঠিয়েও তো সংশোধন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এক কথায় সন্তানের পুরো দায়িত্বটা কিন্তু পিতা-মাতার উপর আর চারিত্রিক নজরদারির বিষয়টা শিক্ষক মণ্ডলীর উপর ন্যাস্ত থাকে বটে।

বাংলাদেশের বুকে ইতিহাসের কলঙ্কময় সেই বাংলা ভাই আর শাইখ আব্দুর রহমান নামক দুই দুষ্ট চরিত্র প্রায় এক যুগ পূর্বে এদেশে রেখে গেছে এক বিষাক্ত বীজ। এই বীজটার ধীরে ধীরে উত্থান যেন আজ সমগ্র দেশ ও জাতির জন্য টেনে আনলো এক বিভিষীকাময় পরিস্থিতি। এই দেশ ও জাতির কপালে দিয়ে গেলো এক নিঃছিদ্র অমানিষা। এদেরই বিষাক্ত ছোবলে আজো হাবুডুবু খাচ্ছে সমগ্র জাতি। বিশ্বের বুকে এরা জানিয়ে দিয়ে গেল যে বাংলাদেশ মানেই জঙ্গিবাদীর দেশ। বাংলাদেশের মানুষরা ইসলামের নামে মানুষ হত্যা করতে পারে। নিরীহ মানুষদের হত্যা করে এরা নিজেদের গাজী বলে সম্ভোধন করে। বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়ে গেল মুসলমানদের দেশে স্ব-জাতির বিরুদ্ধে এরা যিহাদ ঘোষণা করতে পারে। ছোট এই দেশটার সর্বমোট ৬৪ জেলার ৬৩ টি জেলার মধ্যে এক সাথে বোমা ফাটিয়ে তাদের বাহাদুরির প্রমাণ দিয়ে সমগ্র বিশ্বের কাছে আমাদের ইজ্জত সম্ভ্রমকে দাফন করে দিয়ে গেল। আজও এদের চেলা-পালারা যে বিদ্ধমান আছে এবং সদা সক্রীয় আছে গত বেশ কয়েকটি ঘটনায় তার প্রমান মিলেছে।

এসবে কি লাভ এদের? এরাতো সবাই জানে যে কাজটা তারা বারবার করে যাচ্ছে এটা চরম অপরাধ। এটা সমাজ বিরোধী এক জঘন্য কাজ। এটা রাষ্ট্র, দেশ ও জাতিকে বিশ্বের বুকে খাটো করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর এরা আরো জানে যে, যেভাবে তারা মানুষ হত্যা করছে এটা ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করেনা। কারণ ইসলাম ধর্মটা এতখানি নোংরা নয় যে কোনভাবেই সাধারণ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার অনুমতি দেয়। তারা যদি সত্যিকারের মুমিন হয়ে থাকে তাহলে তারা জিহাদের মর্মবাণী অবশ্যই জানে। তাহলে এরা কারা? কাদের ইশারায়, কাদের নির্দেশে তারা এই জঘণ্য পদক্ষেপগুলি একের পর এক নিচ্ছে? এদের পেছনে কারা আছে? কারা অর্থ ও মনোবল যোগান দিচ্ছে? আর এতে যোগানদাতাদের লাভটাই বা কি? তারা কি চায় এই জাতিটা ধ্বংস হয়ে যাক? তারা কি চায় এই দেশের প্রতি বিশ্ববাসীর রক্তচক্ষু নিপতিত হোক? তারা কি চায় এই উন্নয়নশীল দেশটির উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাড়াক?

আজ সময় এসেছে আমাদের সকলকে সচেতন হওয়ার। সময় এসেছে সরকারের পাশাপাশি প্রতিটি নাগরিকের সচেতন হওয়ার। প্রতিটি নাগরিকের যেমন নিজেদের ঘরের প্রতি সর্বদা নজরদারী করার দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি দায়িত্ব রয়েছে তাদের প্রতিবেশীর প্রতি নজরদারী করার। যে কোন সন্দেহের উদ্ভব হলে, যে কোন অসদ আচারণের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে খবর দেওয়ার দায়িত্বটাও তাদের রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিককে সরকারের পাশাপাশি দেশের সম্মান ও জাতির সম্মান রক্ষা করা উচিৎ। দেশের সম্মান বাচানো মানে দেশটাকে বাচানো।

পাশাপাশি জাতির ঐতিহ্য বাচানো হচ্ছে এখন এই জাতির সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এটাই এখন প্রকৃত মহান যুদ্ধ কিংবা যিহাদ। আসুন আমরা এখন একটি যিহাদের ডাক দেই, তা হল দেশের সম্মান আর জাতির সম্মান রক্ষা করা।

আসলে জিহাদের অর্থ কি? এর সঠিক ভাবার্থ কি তা আমাদের ভালভাবে বুঝতে হবে। আমাদের সঠিকভাবে বুঝতে হবে যিহাদ সম্পর্কে এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে। যিহাদ একটি আরবি বহুল ব্যবহৃত এবং সুপরিচিত শব্দ। যার উৎপত্তি "যুহুদ" শব্দ থেকে, অর্থাৎ প্রচেষ্টা আর যুদ্ধ। জাহিলিয়াত যুগেও জিহাদ শব্দটির বহু ব্যবহার করা হতো। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ, সম্প্রদায় ও গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ, এক অঞ্চল অন্য অঞ্চলের সাথে লড়াই, দেশে দেশে যুদ্ধ সবই ছিল যিহাদ শব্দের প্রয়োগ। এরপর আরবের বুকে জন্মালেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি ধর্ম রক্ষার জন্য বিধর্মীদের সাথে লড়াই করেছেন। যে যিহাদ তিনি নিজে সক্রীয় থেকে নিজের নেতৃত্ব দেয়া অবস্থায় সংঘঠিত হয়েছে তাকে বলা হয় গায্ওয়া। আর যে যুদ্ধ তিনি সাহাবাদের নেতৃত্বে দল গঠন করে বাইরে পাঠিয়েছেন তাকে বলা হয় সারিয়া। ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে ওহুদ যুদ্ধ তারপর ঐতিহাসিক খন্দক, তাবুকসহ অসংখ্য গাযওয়া ও সারিয়ার ইতিহাস মুসলিম ইতিহাসের পাতায় অনণ্য ঐতিহ্য বহন করে আছে।

কিন্তু এমন একটি ইতিহাস কি আছে যে কোন নিরীহ মানুষ, নিরস্ত্র মানুষ কিংবা বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের উপর আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিংবা কোন সাহাবাগণ হাত তুলেছেন? আল-কুরআনে বহুবার জিহাদের কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্যবার জিহাদের হুকুম করেছেন কিন্তু একটিবারও কি কেউ দেখাতে পারবে যে আল-কুরআনে কিংবা সহীহ হাদিসে কোন নিরস্ত্র মানুষের উপর আক্রমণ করার প্রমাণ কোথাও আছে? এমন কি পূর্ব ঘোষিত যুদ্ধের মাঠেও তারা দুর্বল, বৃদ্ধ, নারী, শিশু, নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের উপর হাত তোলেননি। তিনি প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধের বাইরে অত্যন্ত ভাল আচারণ করতেন। এছাড়া যুদ্ধের মাঠেও শস্য, ফল-ফলাদির গাছগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে নির্দেশ দিতেন। সূরা আল-মায়িদার ৩২নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"মানুষ হত্যা করা কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার মত অপরাধ ছাড়া কেউ কাউকে যদি হত্যা করল তাহলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করলো, আর কেউ যদি কারও প্রাণ রক্ষা করলো তাহলে সে সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো"।

আল্লাহ তা'আলা আরও ঘোষণা করেছেন :

﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾

"অতঃপর তারা যদি তোমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি"।[১]

এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের উপর হামলা করা ইসলাম কোন দিন কোনভাবেই সমর্থন করে না। এমন কি সশস্ত্র যুদ্ধাও যদি যুদ্ধের মাঠে শান্তির প্রস্তাব করে, তাহলে তাতেও সম্মতি প্রদান করার উপর ইসলাম গুরত্ব প্রদান করে। আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে আপনিও (হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার দিকে ঝুঁকে পড়বেন"।[২]

তার মানে আল্লাহর রাসূল কোনদিন অন্যায়ভাবে নিরস্ত্র মানুষের প্রতি আক্রমণ করতেন না। তিনি আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতির প্রণেতা। তিনি নিহত কোন ব্যক্তির অঙ্গহানি করা কিংবা মৃতদের প্রতি অসম্মানমূলক আচরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

ইসলাম মানবীয় ব্যবস্থাপনাকে সর্বদায় প্রাধান্য দিয়েছে। শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম দিয়ে গেছে এক অনণ্য নমুনা। জাতি হিসাবে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আর মানব জাতিকে ঘোষণা দিয়েছেন যে :

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾

"তোমরা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না যাদেরকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। আর অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার উত্তরাধিকারীদেরকে তো তার প্রতিকারের অধিকার দিয়েছেন"।[৩]

---

১. সূরা আন-নিসা: ৯০
২. সূরা আল-আনফাল: ৬১
৩. সূরা বানী ইসরাইল: ৩৩

বাস্তবে সালাম শব্দের অর্থ শান্তি-শৃঙ্খলা। এর থেকেই ইসলাম শব্দটির উৎপত্তি। একজন মুসলমান কখনও শান্তির ধর্মের অনুসারী হয়ে অশান্তি করতে পারে না। সে পারেনা অন্যায়ভাবে মানুষ খুন করতে। পারে না সে একজন নিরীহ, নিরস্ত্র দেশী কিংবা বিদেশীকে হত্যা করতে। অবশ্যই সে ইসলামের মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। একজন মানুষ যদি সত্যিকারের মুমিন হয় তাকে অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।

ইতিহাস সাক্ষী, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হয়েছিল আইয়ামে জাহেলিয়াত তথা অন্ধকার যুগে। সে সময়টা ছিল বিশ্ব ইতিহাসে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা আর নিরাপত্তাহীনতার জঘণ্যতম যুগ। মানবীয় চরিত্রের চরম অধ:পতনের যুগে আগমন হয়েছিল বিশ্ব নবীর। তিনি শিক্ষা দিয়ে গেছেন জগৎবাসীকে এক চরম সভ্যতা আর আদর্শের শিক্ষা। যার ফলে হাজার বছরের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি, যুলুম, অত্যাচার, ভীতি, নিরাপত্তাহীনতা, শোষণ ও বর্বরতার সবকিছুই মুছে দিয়ে গেলেন এক যাদুময় বাণীর মাধ্যমে। যা ছিল ইসলাম ও শান্তির কথা। যা ছিল মানবতা ও আদর্শের কথা। শিক্ষা দিয়ে গেলেন নীতি ও মানবাধিকারের কথা। এক কথায় বলতে গেলে এই বিশ্ব ইতিহাসের মানবাধিকারের একমাত্র জন্মদাতা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অন্য কেউ নন। ১৯৪৮ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর মানবাধিকার সনদের ঘোষণা করেন আধুনিক জাতিসংঘ। আর মানবাধিকারের মূল উৎস বা রেফারেন্স হিসাবে ম্যাগনাকাটা চুক্তিকে বলা হয়েছে। ম্যাগনাকার্টা চুক্তি ছিল ইউরোপের রাজা ও প্রজাদের মধ্যকার এক মানবীয় চুক্তি। যা ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে ইউরোপের রাজাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ধারাবাহিকতার ফলে রাজা ও প্রজাদের পক্ষ থেকে এক শান্তি চুক্তি। আর এই চুক্তির মাধ্যমে সমগ্র ইউরোপে অনেকটা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তা আস্তে আস্তে বর্তমান দুনিয়ায় মানবাধিকার সনদের চুক্তির মৌলিকত্ব গ্রহণের মাইল ফলক বলে পাশ্চাত্যে বহুল পরিচিত।

আসলে কি তাই? আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও বেশী সময় আগে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ নিয়ে একবার ভাবলেই প্রমানিত হয় যে বাস্তবে মানবাধিকারের জন্মদাতা কে ছিলেন? মাজলুমের পক্ষে এই বিশ্বে সর্ব প্রথম কে আওয়াজ উঠালেন? অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে শান্তির প্রস্তাব কার মাধ্যমে এই বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল? তিনি ছিলেন গোটা দুনিয়ার মানবাধিকারের জন্মদাতা, শান্তির পয়গাম দাতা বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। জাহিলিয়াতের চরম অন্ধকারে যখন সমগ্র আরববাসী অত্যাচার, জুলুম, নীপিড়নের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, শাসক আর মোড়ল শক্তির জুলুমের যাতাকলে নিস্পেষিত ছিল

সমগ্র আরব, ঠিক তখনই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমণ করেন সমগ্র দুনিয়ার অশান্তি, নির্যাতন আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক শান্তির বাণী নিয়ে। মহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের পর থেকেই তাকে শান্তির বাহক হিসেবে দেখেছিল আরববাসী। ফলে শিশুকাল থেকেই তাঁকে আল-আমিন অর্থাৎ সত্যবাদি বলে সম্ভোধন করা হত। তিনি যুবক হওয়ার পর “হিলফুল ফুযুল” নামক একটি সংগঠনের জন্ম দেন। স্থানীয় সকল শ্রেণীর মানুষকে সংগে নিয়ে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল সম্মিলিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। নিজেদের গোত্রের আত্মরক্ষা আর মানব সেবার উদ্দেশ্যেই ছিল এর মৌলিকত্ব। পাশাপাশি তিনি আত্ম-মানবতার সেবা ও অসহায় ইয়াতিমের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে গোটা আরবে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

“হিলফুল ফুজুল” এই সংস্থাটি কি মানব সেবার জগতে ম্যাগনাকার্টা থেকে কোনভাবেই কম কাউন্ট করা যায়? অথচ তিনি ছিলেন আরবের এক সাধারণ যুবক। তিনি নবী হওয়ার পর সমগ্র আরবের বুকে যেভাবে শান্তির দুত হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন তারও দৃষ্টান্ত ছিল এক অনন্য সাধারণ। সর্বসময় তিনি জাতি গোষ্ঠি ও সমগ্র আরবের বুকে প্রমাণ করাতে পেরেছিলেন যে তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র কান্ডারী। তিনি বিধর্মীদের সাথে অত্যন্ত ভাল এবং সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। শত্রুর মোকাবেলায় আর্ন্তজাতিক যুদ্ধনীতি অবলম্বন করাসহ শান্তির পথে সবসময় নিজে থেকেই শান্তি চুক্তির জন্য তিনিই প্রথম হাত বাড়াতেন।

অবশেষে আমি অনুরোধ করব সকল সন্তানের পিতা-মাতাকে, অনুরোধ করব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের প্রতি যেন তাদের পিতামাতা ও গুরুজন হওয়ার সফলতা অর্জনে নিজেদের সন্তানদের প্রতি দায়িত্ববান হন। অনুরোধ থাকবে সরকারের উপর উন্নয়নশীল দেশটাকে সামনে এগিয়ে নেবার জন্য সকল স্তরের মানুষকে, সকল শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে এক শান্তি ও ঐক্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। অনুরোধ থাকবে এই দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে যেন তারা সন্ত্রাস মোকাবেলায় এক অনণ্য সাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন। আরো অনুরোধ থাকবে প্রতিটি স্কুল কলেজ মাদ্‌রাসার পরিচালনা কমিটির নিকট যেন তারা তাদের চোখ, কান, সজাগ রেখে জাতির উন্নয়ন আর এই দেশের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। অনুরোধ থাকবে প্রতিটি আলেম, উলামা ও সকল মসজিদের ইমাম-খতিবগণের নিকট তারা যেন প্রতিটি ক্লাশ আর খুতবায় সন্ত্রাসের মত নেক্কারজনক যাবতীয় দিকগুলি সর্বদা প্রাধান্য হিসেবে উল্লেখ করেন। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এই দেশ এই জাতি এক শান্তির মহামিলনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের নিকট এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে টিকে থাকুক এটাই আমার, আপনার ও সকলের কামনা।

জিহাদ পরিচিতি এবং জিহাদ ও সন্ত্রাসের মাঝে ধূম্রজাল

التعريف بالجهاد والشبكة التلبيسية بين الجهاد والفساد والإرهاب

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

জিহাদের পরিচয়

ইবনু ফারেস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, জিহাদ শব্দটি جهد থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে المشقة (কষ্ট, ক্লেশ)। আর এ অর্থে শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। যেমন বলা হয়, جهدت نفسي و اجهدت (আমি পরিশ্রম করেছি এবং আমি সক্ষম হয়েছি)। এখানে جهدت অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾

"আর তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রম লব্ধ বস্তু ছাড়া"।[১]

পারিভাষিক অর্থে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহর পথে শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োগ করে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং দ্বীনের সার্বিক সহযোগিতা করা। অর্থাৎ আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

আল-কাশানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

هو الدعوة الى الاسلام و اعلاء الدين ودفع شر الكفار وقهرهم

'জিহাদ হচ্ছে ইসলামের দিকে আহ্বান, দ্বীনকে সুউচ্চ (প্রতিষ্ঠিত) করা, কাফিরদের অনিষ্ট প্রতিহত করা এবং তাদের দমন করা'।[২] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বরেন,

الجهاد هو بذل الوسع وهو القدرة في حصول محبوب الحق و دفع ما يكرهه الحق.

'জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং তাঁর অপছন্দনীয় বস্তু প্রতিরোধে শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা'।

জিহাদ বলতে কেবল শত্রুর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকেই বুঝায় না। বরং শত্রুর যাবতীয় তৎপরতাকে কথা, কলম, সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিহত করার প্রচেষ্টাও জিহাদ। আবার কু-প্রবৃত্তি বা কু-প্ররোচনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাও জিহাদ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের জিহাদকে 'জিহাদে আকবর' বা শ্রেষ্ঠ

---

১. সূরা আত-তাওবাহ: ৭৯

২. আল-কাশানী, কিতাবুল বাদায়ে ওয়াছ ছানায়ে ফি তারতীবিশ শারায়ে, ৭ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা. বি.), পৃ. ১৮

জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা কু-প্রবৃত্তি ও কু-প্ররোচনা মানুষকে সর্বদা মন্দ পথে ধাবিত করে। গোপন শত্রু শয়তানকে এবং কু-প্রবৃত্তিকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এজন্য একে 'জিহাদে আকবর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহকে ভয় করলে, তাঁর কাছে জবাবদিহিতার ভয় থাকলে, কু-প্রবৃত্তি এবং শয়তানকে দমন করা সহজ হয়। আর এ দুটিকে দমন করতে পারলে জান্নাতের পথ সুগম হয়।

জিহাদ ফরয হওয়ার সময়

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কী জীবনে জিহাদের নির্দেশ পাননি; এসময়ে তাঁকে কেবল দ্বীনে হক্কের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ফলে দাওয়াত ও তাবলীগের মধ্যেই তাঁর কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম দিকে তিনি গোপনে দাওয়াত দিতেন। পরবর্তীতে প্রথমে তিনি স্বীয় নিকটাত্মীয়দের দাওয়াত দেন এবং পর্যায়ক্রমে মক্কাবাসীকে প্রকাশ্য দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এর ফলে তাঁর প্রতি মক্কার কুরাইশদের বিরোধিতা এবং মুসলানদের প্রতি অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। এমনকি মুশরিকদের অত্যাচার মুসলমানদের জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। ফলে নবুওয়াত লাভের ১৩ বছর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মদীনায় গিয়ে তিনি আনসার, মুহাজির, আউস ও খাজরাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেন। মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্য ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের অবস্থানও সুদৃঢ় হয়। তখন আল্লাহ মুসলমানদেরকে কুরাইশদের সাথে জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন।[১] ২য় হিজরী সনে মদীনায় অবতীর্ণ সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মুসলমানদের উপরে জিহাদ ফরয করা হয়।[২] এ মর্মে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

"তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল, যাদের সাথে কাফিররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম"।[৩]

---

১. মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুখতাছার সীরাতুর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), (দামেশক : মাকতাবাতু দারুল ফীহা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৪/১৪১৪ হি.), পৃ. ১৪০-১৪১

২. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, জিহাদ ও ক্বিতাল, মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০১, ৫ম বর্স ৩য় সংখ্যা, পৃ. ৪

৩. সূরা আল-হাজ্জ: ৩৯

তিনি আরো বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"আর তোমরা লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। তোমরা সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।[১]

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদের অনেক প্রকার রয়েছে। যথা- (১) অন্তর দ্বারা জিহাদ (২) যবানের মাধ্যমে জিহাদ বা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে জিহাদ (৩) ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ (৪) সশস্ত্র জিহাদ বা অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান সমাজে সশস্ত্র যুদ্ধই কেবল জিহাদ বলে পরিচিত। অথচ শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি মুখ ও অন্তর দ্বারা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও অর্থ ব্যয় করাকেও জিহাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা, তোমাদের জীবন দ্বারা ও তোমাদের যবান দ্বারা"।[২]

তিনি মুমিনের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে জিহাদের কয়েকটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

"যে ব্যক্তি তাদের বিপক্ষে হাত দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে কথা দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মুমিন। এরপরে সরিষা দানা পরিমাণও ঈমান নেই"।[৩]

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্: ১৯০

২. সুনান নাসাঈ, ৩০৯৬, হাদীছ ছহীহ; সুনান আবু দাউদ, ২১৮৬; মিশকাত, ৩৮২১

৩. সহীহ মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়, ৫০ (১৭৯); মিশকাত, ১৫৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ

(১) **অন্তর দ্বারা জিহাদ :** কোন গর্হিত কাজ শক্তি বা প্রয়োগে প্রতিহত করা সম্ভব না হলে মনে মনে তা ঘৃণা করা হচ্ছে অন্তর দ্বারা জিহাদ।[১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"যদি তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে তা হাত দ্বারা প্রতিহত করবে। হাত দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব না হলে যবান দ্বারা প্রতিহত করবে। তাও সম্ভব না হলে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটা হচ্ছে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক"।[২]

(২) **যবানের দ্বারা জিহাদ বা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে জিহাদ :** প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্ষমতাধর, প্রভাবশালী ব্যক্তির সামনে হক্ব কথা বলা হচ্ছে যবানের মাধ্যমে জিহাদ। যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম অত্যাচারী শাসক নমরূদের সাথে এবং নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের সাথে করেছিলেন। কুরআনুল কারীমে এসেছে ,

﴿فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"তিনি (নূহ আলাইহিস সালাম) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির জন্য আশঙ্কা করি। তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমি কখনই ভ্রান্ত নই, বরং আমি বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না'।[৩]

---

১. ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২

২. সহীহ মুসলিম, ৪৯ (১৭৭), 'ঈমান' অধ্যায়; সুনান আবুদাউদ, ১১৪০ ও ৪৩৪০; সুনান তিরমিযী, ২১৭৩; সুনান ইবনু মাজাহ, ৪০১৩; রিয়াযুছ ছালেহীন, ১৮৩

৩. সূরা আল-আ'রাফ: ৫৯-৬২

শরী'আতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদির দ্বারা মুনাফিকদের সাথে বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে যুদ্ধ করা। এটা যবান দ্বারা জিহাদ করার একটা প্রকারও বটে। এ প্রকার জিহাদের ব্যাপারে আল্লাহ গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"আর তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়"।[১]

(৩) **ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ :** বাতিল প্রতিহতকরণ ও হক্ব প্রতিষ্ঠায় অর্থ-সম্পদ কুরবানী করা হচ্ছে মালী জিহাদ বা ধন-সম্পদের মাধ্যমে জিহাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। আর এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে"।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর তোমাদের ধন-সম্পদ দ্বারা, তোমাদের জীবন দ্বারা ও তোমাদের যবান দ্বারা"।[৩]

(৪) **অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ :** যুদ্ধক্ষেত্রে কাফির মুশরিকদের বিরুদ্ধে আঘাত ও পাল্টা আঘাতের মাধ্যমে জিহাদ কর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর"।[৪]

---

১. সূরা আন-নাহল: ১২৫

২. সূরা আছ-ছফ: ১০-১১

৩. সুনান নাসাঈ, ৩০৯৬, হাদীছ ছহীহ; সুনান আবু দাঊদ, ২১৮৬; মিশকাত, ৩৮২১

৪. সূরা আল-আনফাল: ৬০

সশস্ত্র জিহাদ হচ্ছে জিহাদের সর্বোচ্চ প্রকার। এরপর আর কোন প্রকার নেই। আল্লাহর বাণীতেই তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন,

﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"আর তাদের সাথে লড়াই কর আল্লাহর রাস্তায়, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। আর কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"।[১]

জিহাদের স্তরসমূহ

জিহাদের ৪টি স্তর রয়েছে। যথা- ১. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ২. শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ৩. মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ৪. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ।

১. **প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ :** কু-প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ নানা রকম অন্যায়, অনাচার, অবিচার, যুলুম-অত্যাচার ও পাপকর্মের দিকে ধাবিত হয়। কু-প্রবৃত্তি বা পাশবিক শক্তি মানুষকে গর্হিত ও ইসলাম বিরোধী কাজে প্ররোচিত করে ও প্রেরণা যোগায় এবং ভার কাজে তথা কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। জৈব উপাদানে পুষ্ট ও পাশবিক শক্তিতে বলীয়ান কু-প্রবৃত্তির ফলে মানুষের নৈতিক ও আত্মিক অবনতি ঘটে। মানুষের নৈতিক চরিত্রে অবনতি ঘটলে সে নানা প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীল কাজ করে বসে। এহেন জঘন্য অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নফস বা কু-প্রবৃত্তি দমনের সর্বত্মক চেষ্টা চালানো অতীব জরুরী। আর এটাই হচ্ছে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ। কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে বা নিয়ন্ত্রণ করে তাকে আল্লাহর একান্ত অনুগত করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তার প্রবৃত্তি আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ না করেবে"।[২]

মানুষ এ কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মেনে চললে জান্নাত লাভ তার জন্য সহজতর হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾

---

১. সূরা আল-বাকারাহ্: ১৯০
২. শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত: ১৬৭

"আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালক আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং নিজ আত্মাকে কু-প্রবৃত্তির হাত হতে রক্ষা করে তার স্থান অবশ্যই জান্নাতে"।[১]

(৩) **শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ :** শয়তান মানবমনে যে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং অন্তরে যে কু-মন্ত্রণা দেয় তা প্রতিহত করাই হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। শয়তানের ধোঁকায় যাতে মানুষ পতিত না হয়, সেজন্য আল্লাহ তাকে সাবধান করেছেন। তিনি বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ- إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾

"হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদের প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়"।[২]

কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে মুনাফিকদের সাথে জিহাদ অত্যন্ত কঠিন। কেননা কাফিরদের চেনা যায় ও তাদের শত্রুতা জানা যায়। কিন্তু মুনাফিকদের চেনা কষ্টসাধ্য এবং তাদের ষড়যন্ত্র অবগত হওয়াও দুরূহ।

(৪) **মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ :** মুনাফিকরা মুসলিমের ছদ্মবেশ ধারণ করে ইসলামের দোষ-ক্রটি খোঁজে বেড়ায়। তারা পোষাক পরিচ্ছেদে ও বাহ্যিক আমলের মাধ্যমে নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু তাদের অন্তরে থাকে ইসলাম ধ্বংসের সুগভীর ষড়যন্ত্র। মূলতঃ যথার্থ দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে তাদের প্রতিহত করা এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। এটাই হচ্ছে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ। এ জিহাদ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾

"হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে জাহান্নাম। আর সেটা অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল"।[৩]

---

১. সূরা আন-নাযি'আহ্: ৪০-৪১
২. সূরা ফাতির: ৫-৬
৩. সূরা আত-তাওবা: ৭৩; সূরা আত-তাহরীম: ৯

(৪) **কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ :** কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল প্রকার শক্তি দিয়ে জিহাদ করা। অর্থাৎ তাদের সাথে জান, মাল, যবান ও অন্তর দিয়ে জিহাদ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

"তোমরা আল্লাহর জন্য জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি"।[১]

জিহাদের শর্তাবলী

জিহাদ ইসলামের এক শাশ্বত বিধান, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ বিধান যে কেউ তার খেয়ালখুশী মত জারী বা বাস্তবায়ন করতে পারে না। বরং এর জন্য কতিপয় সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে। এই শর্তগুলো পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান না থাকলে জিহাদ বৈধ হবে না। নিম্নে শর্তগুলো উপস্থাপন করা হল- (১) মুসলিম শাসক বিদ্যমান থাকা, (২) পক্ষ-বিপক্ষ সুস্পষ্ট হওয়া, (৩) যথার্থ ও পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ্য থাকা।[২]

(১) মুসলিম শাসক বিদ্যমান থাকা : জিহাদ হতে হবে মুসলিম শাসকের অধীনে। যিনি দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবেন, যিনি দ্বীন রক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য জিহাদ ঘোষণা করলে জনগণ তাতে অংশগ্রহণ করবে। রাষ্ট্র বা সরকার প্রধান জিহাদ করতে অনিচ্ছুক হলে তার দায়ভার জনগণের উপর বর্তাবে না। এরজন্য জনগণ দায়ী বা গুনাহগার হবে না। কিন্তু এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জিহাদের ঘোষণা দিলে বা জিহাদ পরিচালনা করলে তা হবে জিহাদের নামে ভুল কাজ। এতে অনর্থক মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত হবে, জিহাদ হবে না। জিহাদ কেবল সরকার প্রধানের অধীনে হতে হবে। এ মর্মে নিম্নোক্ত হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

---

১. সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮

২. মানহাজুল জমঈয়ত লিদদাওাতে ওয়াত তাওজীহ (কুয়েত : জমঈয়াতুল এহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৭ খৃ/১৪১৭ হি), পৃ. ৪৮- ৫৩

"সরকার প্রধান হচ্ছেন ঢাল স্বরূপ। তাঁর পশ্চাতে (অধীনে) থেকে যুদ্ধ করতে হবে এবং তাঁর মাধ্যমেই আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি যদি আল্লাহভীতির নির্দেশ দেন এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে এর দ্বারা তিনি সওয়াব পাবেন"।[১]
তিনি আরো বলেন,

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا

'এ বিজয়ের (মক্কা বিজয়ের) পর আর কোন হিজরত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে। যখন তোমাদেরকে (যুদ্ধের জন্য) বের হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হবে, তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে'।[২]

روي اللالكائي عن ابن ابي حاتم انه قال سألت ابي و ابا زرعة عن مذاهب اهل السنت وفي اصول الدين وما ادركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقالا أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا و شاما ويمنا فكان من مذهبهم الي أن قال فان الجهاد ماض منذ بعث الله عزوجل نبيه صلى الله عليه و سلم الي قيام الساعة مع أولى الأمر من ائمة المسلمين لا يبطله شيئ.'

"আল্লামা লালকাঈ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনু আবী হাতিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতা ও আবু যুর'আহকে দ্বীনের মূলনীতি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অভিমত জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা মক্কা, মদীনা, ইরাক, সিরিয়া, ও ইয়ামান সহ সকল শহরের উলামায়ে কেরামকে এ মতের উপর পেয়েছি যে, আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রেরণের সময় থেকে শুরু করে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের নেতাদের (রাষ্ট্রপ্রধান বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তির) সঙ্গে মিলেই জিহাদ অব্যাহত রাখতে হবে। এ জিহাদকে কোন কিছুই বিনষ্ট করতে পারবে না"।[৩]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহ্হাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

وأمر الجهاد موكول الي الامام ويلزم الرعية طاعته فيما يراه

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ২৯৫৭; সহীহ মুসলিম: ১৮৩৫
২. সহীহ আল-বুখারী: ১৮৩৪; সহীহ মুসলিম: ১৪৮৮
৩. মানহাজুল জমঈয়ত, পৃ. ৪৯-৫০; ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস, পৃ. ৭৫-৭৬

'জিহাদের বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধানের উপর নির্ভরশীল। আর প্রজাদের জন্য আবশ্যক হল শাসক যে নির্দেশ দেন তা মান্য করা'।[১]

আবুল কাসেম আর-খিরাকী বলেন,

وواجب على الناس اذا جاءهم العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر ولا يخرجون الى العدو الا باذن الأمير.

'শত্রু এসে পড়লে কম-বেশী পরিমাণে যাই হোক না কেন জনগণের জন্য আবশ্যক হল শত্রুর মোকাবিলায় বের হয়ে পড়া। তবে তারা শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হবে না'।[২]

আবুত ত্বাইয়্যেব মুহাম্মদ ছিদ্দীক হাসান খান কনৌজী বলেন,

الجهاد فرض واجب على الأمة وان وجوبه لم يسقة بموته صلى الله عليه و سلم و أن الامام شرط في أدائه والقيام به.

'উম্মাতে মুসলিমার উপর জিহাদ ফরয। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তিকালে এ ফরয রহিত হয়নি। তবে এ জিহাদ পালন করতে শাসক হচ্ছেন শর্ত'।[৩]

উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি স্বীয় জান-মাল, ইয্যত-আব্রু ও পরিবার-পরিজন রক্ষার্থে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে আইনের আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

اذا كانو يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس لأن يقاتلوا من قبل أن يأذن الامام ومكن لا يقاتلون اذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم الا أن يأذن الامام

'জনগণ নিজ ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার আশঙ্কা করলে শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু নিজ ও পরিবার-পরিজনের জন্য কোন ভয়-ভীতি না থাকলে শাসকের অনুমতি ব্যতীত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না'।[৪]

---

১. মুওয়াল্লাফাতুশ শায়খ, পৃ. ৩৬০; মানহাজুল জমঈয়ত, পৃ. ৫০, টীকা নং ১
২. মানহাজুল জমঈয়ত, পৃ. ৫০, প্রাগুক্ত
৩. আল-ইবরাতু মিম্মা জাআ ফিল গাযওয়া ওয়াশ শাহাদাতে ওয়াল হিজরাতে, পৃ. ১৭৯
৪. মানহাজুল জমঈয়ত, পৃ. ৫০, টীকা নং ১

(২) পক্ষ-বিপক্ষ সুস্পষ্ট হওয়া : জিহাদ হয় অমুসলিম, কাফির, মুশরিকদের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে মুসলিম অমুসলিম পক্ষ স্পষ্ট হতে হবে। পক্ষ-বিপক্ষ স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ ছিল প্রত্যুষে আক্রমণ করা এবং তিনি প্রতিপক্ষ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে আক্রমণ করতেন না। নিম্নোক্ত হাদীসটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَكَانَ يَسْتَمِعُ الأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلاَّ أَغَارَ

"আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর উদয় হওয়ার পর আক্রমণ করতেন। প্রথমে তিনি আযানের অপেক্ষা করতেন। আযান শুনতে পেলে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকতেন নতুবা আক্রমণ করতেন"।[১]

ইসলামের প্রাথমিক যুগে হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে মুসলমানদেরকে মক্কার কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে বিরত রাখা হয়েছিল এজন্য যে, তখন অনেক মুসলমান নিজের আক্বীদা-বিশ্বাস গোপন করে মক্কায় বসবাস করেছিল। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

"যদি (মক্কায়) কিছু সংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না, অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সবকিছু চুকিয়ে দেয়া হত। কিন্তু এজন্য তা করা হয়নি, যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে প্রবেশ করান। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম"।[২]

(৩) যথার্থ ও পর্যাপ্ত শক্তি-সামর্থ্য থাকা : প্রতিপক্ষ বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত ও দমন করার মত যথার্থ শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় না করা পর্যন্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বৈধ নয়। কেননা এ অবস্থা কেবল পরাজয় ও ধ্বংসই ডেকে আনে। এজন্য

---

১. সহীহ মসলিম, ৮৪৭
২. সূরা আল-ফাতাহ: ২৫

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর উপর যুদ্ধের নির্দেশ আসেনি। এমনকি মদীনায় হিজরতের পরও যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর"।[১]

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

إن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والامكان اذ ليس قتالهم بأولى من قتل المشركين والكفار ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والامكان ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور اذا مفسدته أعظم من مصلحته كما نهى في أول الاسلام عن القتال كما في قوله تعالى : ألم تر الى الذين قيل لهم كفوا أيديهم.

'সীমালঙ্ঘনকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিষয়টি শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে অধিক উত্তম নয়। আর এটা জ্ঞাত বিষয় যে, যুদ্ধ (কাফির, মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) শক্তি ও সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরবর্তী যুগের আলিমগণের অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে অবহিত করে গেছেন। কিন্তু তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা ক্ষমতা বহির্ভূত। এর অকল্যাণের ভয়াবহতা কল্যাণের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর। এজন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾

"তুমি যে সব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমাদের নিজেদের হাতকে সংযত রাখ"।[২]

---

১. সূরা আল-আনফাল: ৬০
২. সূরা আন-নিসা: ৭৭

সুতরাং কেবল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কিংবা রাজ্য বিস্তার ও পররাজ্য গ্রাসের মানসে জিহাদ ঘোষণা করা হলে তা জিহাদ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা হবে সন্ত্রাস বা আগ্রাসন। পক্ষান্তরে কেউ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্বের উপর আঘাত হানলে, ইসলামের অবমাননা করলে, মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলে মুসলমানরা নীতিগতভাবে তাদেরকে প্রতিহত করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে হবে। এতে অস্বীকৃতি জানালে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে জিযিয়া দিয়ে বসবাসের প্রস্তাব দিতে হবে। এই দু'টি প্রস্তাবের কোনটি গ্রহণ না করে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করে বসলে, তাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে জিহাদ করা যাবে। তবে এ জিহাদের ঘোষণা দিবেন রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসক। রাষ্ট্রপ্রধান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের বিরত্ব প্রকাশ কিংবা গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারের জন্য জিহাদ ঘোষণা করলে তা বৈধ হবে না।

জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যে পার্থক্য

জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যে সার্বিক দিক দিয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। হাকীকত বা প্রকৃতি, তাৎপর্য, অর্থ ও ভাব, কারণ ও প্রকারভেদ, ফলাফল ও উদ্দেশ্য এবং শারঈ হুকুমের ক্ষেত্রে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে ব্যপক পার্থক্য রয়েছে। জিহাদ বিধিবদ্ধ, শরী'আত সম্মত ইসলামের এক অমোঘ বিধান। আর সন্ত্রাস হচ্ছে ইসলামে নিন্দনীয়, ঘৃণিত, ধিকৃত ও নিষিদ্ধ।

সন্ত্রাস মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা, বৈরীতা ও দুশমনী সৃষ্টিকারী, যা শান্তিপূর্ণ অবস্থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে, সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভীত-বিহ্বল করে তোলে, তাদের সম্পদ ও মান-সম্ভ্রমের উপর হামলা করে, তাদের স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, সর্বোপরি পৃথিবীতে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে জিহাদ হয়ে থাকে মানুষের শান্তি-নিরাপত্তা, জান-মাল, ইয্যত-সম্মান রক্ষার লক্ষ্যে। তাছাড়া মানুষের জীবন যাত্রার স্বাধীনতা বৃদ্ধি, প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, যুলুম-নির্যাতনকারীদের কবল থেকে নির্যাতিতদের উদ্ধার ও রক্ষা, শক্তিধর ও প্রভাবশালী প্রতিপক্ষ ও দখলদার সাম্রাজ্যবাদীদের হিংস্র ছোবল থেকে নিজ দেশে ও নিজ শহরের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য জিহাদ করা হয়ে থাকে।

শত্রুতা ও বৈরীতা সৃষ্টি, শান্তিপ্রিয় জনতাকে সন্ত্রস্ত করা, অন্যের ক্ষমতা ও শক্তি খর্ব করা বা তাদের উপর প্রভাব বিস্তার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ইসলাম কখনো মুসলিম জাতিকে দেয় না; বরং ইসলাম মুসলমানদেরকে বিভিন্ন দলের সাথে ঐক্য গড়ে তোলার ও সংহতি বৃদ্ধি করার, তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধনকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করার নির্দেশ দেয়। আর তাদের

পবিত্র স্থান সমূহ সংরক্ষণ এবং তাদের জীবন রক্ষার আদেশ দেয়। ফলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের সাথে অন্যদের শত্রুতা সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যদি তাদের প্রতি যুলুম-নির্যাতন করা হয় তাহলে তা প্রতিহত করতে তারা সুদৃঢ় অবস্থান নেয়।

ইসলামের প্রচার-প্রসার, হক্বের সাহায্য-সহযোগিতা, অন্যায়-অনাচার ও যুলুমের প্রতিরোধ, ন্যায়পরায়ণতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে জিহাদকে ইসলামের বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। তেমনি জিহাদকে ইসলামে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর রহমত প্রতিষ্ঠার জন্য, যে রহমতসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগদ্বাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। যাতে করে তিনি তাদেরকে পথভ্রষ্টতার আঁধার ও গোমরাহীর যুলমাত থেকে হেদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে ফিরিয়ে আনতে পারেন। আর সন্ত্রাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে এসবের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মোটকথা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা শরী'আত সিদ্ধ ফরয। আর সন্ত্রাস হচ্ছে মানবতা পরিপন্থী এক জঘন্য অপরাধ। জিহাদ শরী'আত সম্মত, আর বৈরীতা সৃষ্টিকারী সন্ত্রাস হচ্ছে নিষিদ্ধ। জিহাদ হয় স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ হল দুনিয়া বা পার্থিব স্বার্থ লাভ করার জন্য।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ পার্থক্য উপলব্ধি করা ও সত্যিকার জিহাদে অংশগ্রহণ করার তাওফীক দিন এবং জিহাদের নামে সকল জঙ্গি তৎপরতা প্রতিহত করতে সাহায্য করুন।

(অত্র লেখাটি উপরিউক্ত লেখকের লিখিত ও শ্যামলবাংলা প্রকাশনী, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত "জিহাদ ও জঙ্গিবাদ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গ্রন্থ থেকে চয়নকৃত ও কিছুটা পরিমার্জিত।)

ফিতনাতুত তাকফীর-কাফির প্রতিপন্ন করা উগ্রপন্থীদের প্রধান হাতিয়ার

فتنة التكفير من أعظم أسلحة المتطرفين

ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও

চেয়ারম্যান

সাউদী ইউনিভার্সিটিস অ্যালামনাই এসোসিয়েশন বাংলাদেশ

আত-তাকফীর শব্দটি আরবী التكفير শব্দ হতে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আমাদের সমাজে তাকফীরী গ্রুপের সুবাদে আমরা অনেকেই তাকফীর শব্দটির সাথে পরিচিত। তাকফীর শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে কাউকে কাফির বানানো, কাফির সাব্যস্ত করা বা কাফির ফাতওয়া দেয়া। কাউকে কাফির সাব্যস্তকরণের কাজটি কোনভাবেই সাওয়াব, ইবাদাত, নেক আমল, অত্যন্ত জরুরী কাজের অন্তর্ভূক্ত ছিল না। এ কাজটির জন্য ইসলামী নির্দেশনায় কোন ভাবে উৎসাহিত করা হয়নি। যুগে যুগে আলিমগণ নিজেদেরকে একাজে সম্পৃক্ত করা হতে বিরত থাকতেন। বরং এ কাজটিকে নিজেদের উপর বড় আশঙ্কাজনক কাজ মনে করতেন। শুধুমাত্র দ্বীনের বৃহৎ স্বার্থে এবং মুসলিম উম্মাহকে সতর্কীকরণের নিমিত্তে কাউকে কাফির ফাতওয়ার বিষয়টি তারা সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে অনুমোদন দিতেন।

ইসলামী বিধানে তাকফীর মূলত শাস্তিমূলক বিধান। এ বিধানটি সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ন্যাস্ত। কেউ তাকফীরকে নিজ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা অথবা এ কাজকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের নেক আমল হিসাবে গ্রহণ করা অত্যন্ত ভুল কাজ।

মাসআলাতুত্ তাকফীর-এর ভয়াবহতা:

তাকফীরের বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ, আশঙ্কাজনক ও কঠিন। তাই তাকফীরকে খেল তামাশা হিসাবে গ্রহণ করা আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার পরিপন্থী কাজ। শুধুমাত্র খারিজী সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারীরাই যুগে যুগে তাকফীরকে নিজেদের বিরোধীদের বিপক্ষে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা এর মাধ্যমে নিজেদের হীন দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে তাকফীর-এর মাঝে ইসলাম, মুসলিম ও মুসলিম উম্মাহর কোন ধরনের মাসলাহাত বা স্বার্থ নিহিত থাকতে পারে না। ইসলাম শাস্তিমূলকভাবে এ কাজটি অত্যন্ত সতর্কভাবে অনুমোদন দিয়েছে। আমরা যতদিন মাসআলাতুত তাকফীরের ভয়াবহতা ও জঘণ্যতা সম্পর্কে সচেতন না হব ততদিন আমরা এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সাধারণ ও হালকা বিষয় হিসাবে গ্রহণ করব। তাই নিম্নে এর ভয়াবহতার কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল :

১. তাকফীরের বিষয়টির মাঝে হয়ত নিজের ব্যক্তিগত ধ্বংস রয়েছে অথবা অন্যের ধ্বংসের হাতছানি রয়েছে। দুটি বিষয়ই জঘণ্য ও মারাত্মক। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের ধ্বংস কোনদিন কামনা করতে পারে না, যেমনিভাবে কেউ অন্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে না।
২. তাকফীরের মাসআলায় পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্তি ব্যাপক। যথাযথ কারণ না থাকলে এ বিষয়ে পথভ্রষ্ট হওয়া খুবই সহজ। আমরা জানি এ ব্যাপারে

অনেক বড় বড় আলিমও বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। তাই যারা স্বল্পজ্ঞান নিয়ে এ বিষয়ে নিজেদেরকে পরিপক্ক মনে করতে চান, বা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে চান, তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাদের উচিত হবে নির্ভরযোগ্য আলিমদের শরণাপন্ন হওয়া এবং কোন ভাবে তাড়াহুড়া না করা।

৩. এখানে একটি বিষয় আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জানা দরকার যে, তাকফীরের বিষয়টি মূলত গবেষণামূলক ও ইজতিহাদ নির্ভর বিষয় না। বরং এ বিষয়টি জুডিসিয়াল ও বিচার-ফয়সালামূলক। তাই এতে যোগ্য গবেষক স্বাধীনভাবে মত দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে না। বিষয়টি নিয়ে কেউ আলোচনা ও বর্ণনা করতে পারে তবে কোনভাবেই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকার কোন আলিম, মুফতী, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ সংরক্ষণ করে না। অবশ্যই বিষয়টি কোর্টের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে।

সংক্ষিপ্ত এ প্রবন্ধে এ বিষয়ে আর দীর্ঘ আলোচনা করতে চাই না, তবে আমরা স্পষ্ট করে একথা তুলে ধরতে চাই বিষয়টি হালকা ভাবে বা তামাশা হিসাবে গ্রহণ করার কোন অবকাশ নেই।

বর্তমানে আমাদের একদল যুবককে এ নিয়ে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করতে দেখছি। তারা এ বিষয়ে অনেক লেখালেখিও শুরু করেছে। তারা নিজেদের মৌলিক কাজ বাদ দিয়ে এ বিষয়ে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে খুব ইন্টারেস্ট পাচ্ছে। তারা মনে করে এটি তাদের concern। সত্যি কথা হচ্ছে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ভুলে গিয়ে অন্যের ত্রুটি-বিচ্যুতির পিছনে নিজেকে সম্পৃক্ত করা কারো জন্য কোন ভাবেই কল্যাণকর হয় না। তাই এ কাজটি যারা করছে তারা নিজেদের কল্যাণকে উপেক্ষা করছে।

তাকফীরীদের টার্গেট কারা?

আমরা জানি তাকফীরীদের টার্গেট সাধারণ মানুষ না। তেমনিভাবে তারা কাফির, মুশরিক ও ইহুদীদেরকেও নিজেদের টার্গেট হিসাবে গ্রহণ করেনা। তাদের টার্গেট হচ্ছে দু শ্রেণীর লোক প্রথমত: মুসলিম দেশসমূহের সরকার ও সরকার প্রধানরা, দ্বিতীয়ত : মুসলিম সমাজের সহীহ চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ আলিম-ওলামাগণ। কেন তারা এ দু শ্রেণীকে টার্গেট করেছে। প্রথমত : সরকার ও সরকার প্রধানকে টার্গেট করার মাধ্যমে তারা তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করতে পারলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অস্ত্র ধারণ, গুপ্ত হত্যা করার মত জঘণ্য কাজে লিপ্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত : সহীহ ধারার আলিমদের কাফির আখ্যায়িত করতে পারলে আলিমদের থেকে মুসলিম সমাজ,

বিশেষভাবে যুবসমাজকে দূরে সরাতে পারে। ফলে যুবকরা আলিমদের পথনির্দেশনা গ্রহণ না করে বিভ্রান্ত ও বিচ্ছিন্ন দলসমূহের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে আলিমরা সরকার বা রাষ্ট্রের তল্পিবাহকের মত অথবা আলিমরা ভীত।

মূলত: মানব সমাজের জন্য দু শ্রেণীর লোকের সঠিক অবস্থান অপরিহার্য। প্রথমত : সরকারের সঠিক অবস্থান, অন্যথায় রাষ্ট্রে সকল প্রকার অশান্তি বিরাজ করবে। দ্বিতীয়ত : আলিমদের অবস্থান, অন্যথায় মানুষদের মাঝে সকল প্রকার অবক্ষয় নেমে আসবে এবং মানুষ চিন্তাধারায় ব্যাপক ভাবে বিভ্রান্ত হবে।

কাফির মনে করার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা:

মুসলিম ব্যক্তিকে যথেচ্ছা কাফির বলার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ সকলকে হুঁশিয়ার করেছেন। ধারণামূলকভাবে কাউকে কাফির বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে ব্যক্তির অন্তরের বিষয়ের উপর আন্দাজ অনুমানের উপর হুকুম লাগানো হয়ে থাকে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মু'মিন নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুত: আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো ইতিপূর্বে এমনি ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন।"[১]

এ আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাফসীর ইবন কাছীরে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- وَمَعَهُ غَنَمٌ لَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

---

১. সূরা আন-নিসা: ৯৪

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا) إِلَى قَوْلِهِ (كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا)

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বনী সুলাইম গোত্রের এক ব্যক্তি মেষপাল চরাতে চরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের এক দলের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদেরকে লক্ষ্য করে সালাম প্রদান করল। তারা ধারণা করে বললেন, এ লোক কেবল আমাদের নিকট থেকে পরিত্রাণের জন্য সালাম দিয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে মুসলিম নয়। এ বলে তারা তাকে হত্যা করলেন। আর তার মেষপাল গনীমতের সম্পদ হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত করলেন। অতঃপর আয়াতটি নাযিল হয়।"[১]

আলোচ্য আয়াতে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তিকে মুমিন নয় বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তাকে মুসলিম বলে গণ্য করতে হবে। ব্যাপক তদন্ত ও যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ ধরণের কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা এবং তাকে হত্যা করা হারাম।

কাফির প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সতর্কীকরণ

কোন ব্যক্তিকে বিনা কারণে কাফির বলে সম্বোধন করতে রাসূললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। সাথে সাথে কাউকে অযথা কাফির বলার ভয়াবহ পরিণতিও বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

"কোন ব্যক্তি অন্যকে পাপাচারী ও কাফির বলে সম্বোধন করবে না। যদি কেউ এরূপ করে আর সম্বোধন ব্যক্তি যদি সেরূপ না হয়, তাহলে তার এ উক্তি তার (সম্বোধনকারীর) দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে"।[২]

---

১. তিরমিযী, 'তাফসীর' অধ্যায়, হা/৩০৩০; তাফসীর ইবনু কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০৪

২. সহীহ আল-বুখারী: ৬০৪৫

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

"যে ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করল, তার এ বাক্য তাকে সহ দু'জনের একজনের দিকে ফিরে আসবে"।[১]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلًا فَأَحَدُهُمَا كَافِرٌ

"কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করলে তাদের দু'জনের যে কোন একজন কাফির হিসাবে গণ্য হবে"।[২]

অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

إذا قال الرجل لصاحبه يا كافر فإنها تجب على أحدهما فإن كان الذي قيل له كافر فهو كافر وإلا رجع إليه ما قال

"যদি কোন ব্যক্তি তার সাথীকে বলে, এই কাফির! তাহলে তার এ উক্তি তাদের দু'জনের একজনের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। যাকে কাফির বলা হচ্ছে সে যদি প্রকৃতই কাফির হয়, তাহলে সে তো কাফির। অন্যথা কাফির বলে সম্বোধনকারীই কাফির হয়ে যাবে"।[৩]

উপরোল্লিখিত হাদীসগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মুসলিম ব্যক্তিকে বিনা কারণে কাফির বলে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ ঐ ব্যক্তির মধ্যে কাফির হওয়ার মত কোন দোষ-ত্রুটি না থাকলে তাকে কাফির আখ্যায়িত করা বৈধ নয়। তাই আন্দাজ বা অনুমান ও ধারণার উপর ভিত্তি করে কাউকে কাফির প্রতিপন্ন করা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী হারাম কাজ বরং এর মাধ্যমে নিজেই কাফির হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে।

তাকফীর বা কাফির সাব্যস্তকরণ-এর প্রবণতা ও কারণ :

চরমপন্থী খারিজীদের মত বর্তমানেও মুসলিম ব্যক্তিবর্গকে কাফির ফতোয়া দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে দেশের

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৬১০৩, ৬১০৪

২. মুসনাদু আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪, ৪৭, ৬০, ১০৫, সনদ সহীহ

৩. মুসনাদু আহমাদ: ৫৭৯০

সরকার, আলেম-ওলামা থেকে শুরু করে সবাইকে কাফির বলে ফাতওয়া প্রদান করে। মূলতঃ যারা তাদের মত ও পথের অনুসারী নয় তাদেরকেই চরমপন্থীরা কাফির মনে করে। অথচ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা অনুযায়ী, মুসলিম ব্যক্তি কবীরা গুনাহ করলেও তাকে কাফির বলা যাবে না। কৃত গুনাহের জন্য সে ফসিক, ফাজির তথা পাপাচারী হবে কিন্তু সে কাফির হবে না।

শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

إن مسألة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضا هي فتنة قديمة تنبتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج ... ومنها فرقة لا تزال موجودة الآن باسم أخر

"কেবলমাত্র শাসকদেরকেই নয় বরং সাধারণ মুসলিমদেরকেও কাফির আখ্যায়িত করার বিষয়টি একটি অতি পুরাতন ফিৎনা। ইসলামের মধ্যে খারিজীরা এরূপ ফিৎনার আবির্ভাব ঘটায়। বর্তমান যুগেও বিভিন্ন নামে তাদের অনুসারী রয়েছে।"

'ঐসব চরমপন্থীরা মসজিদের ইমাম, খত্বীব, মুওয়াযযিন ও খাদেমদেরকেও কাফির বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, মাদ্রাসা ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে কাফির বলার কারণ কী? তাহলে তারা এর কারণ হিসাবে বলে যে, সরকার আল্লাহর বিধান ব্যতীত যে বিচার-ফায়সালা করে তারা এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তাই তারা কাফির'।

মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে-

১. তাদের ইলমী অজ্ঞতা ও দ্বীনি জ্ঞানের স্বল্পতা।

২. ইসলামী দাওয়াতের সঠিক মূলনীতি ও শারঈ বিধান যথাযথভাবে অনুধাবন না করা।

৩.নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য ও হীন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হওয়া।[১]

৪. কাফির প্রতিপন্ন করার ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে না জানা।

তাকফীর বা কাফির আখ্যায়িত করার অধিকার কার?

কাউকে কাফির প্রতিপন্ন করার অধিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য খাছ। কোন মানুষ তার ইচ্ছানুযায়ী কাউকে কাফির আখ্যায়িত করতে পারে না। এ সম্পর্কে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বক্তব্য নিম্নরূপ :

---

১. তদেব, পৃ. ১৩,২০

১. ইমাম নাবাবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন:

জেনে রাখুন! হক্বপন্থীদের মাযহাব এই যে, গুনাহের কারণে কিবলার অনুসারী কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। এমনকি প্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসারী খারিজী, মু'তাযিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায়কেও কাফির আখ্যা দেয়ার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন কিছুকে জেনে শুনে অস্বীকার করবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির। তবে যদি নব মুসলিম হয় অথবা দূরবর্তী এমন কোন গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী হয় যার নিকট ইসলামের সমস্ত নিয়ম-কানুন পৌঁছেনি সে কাফির হবে না। তাকে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অবহিত করার পরেও যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। অনুরূপভাবে যদি যিনা অথবা মদ পান অথবা হত্যাসহ বিভিন্ন ধরণের হারাম কর্মকে জেনে শুনে হালাল মনে করে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে।[১]

২. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

'(কাফির প্রতিপন্ন করার) বিষয়ে আবু ইসহাক আল-ইসফারাইনী ও তার অনুসারীদের মত কোন কোন লোক যা বলে থাকে এটা তার বিপরীত। তারা বলে, 'আমাদেরকে যারা কাফির বলে আখ্যায়িত করে আমরা কেবল তাদেরকেই কাফির প্রতিপন্ন করব'। কিন্তু কাফির প্রতিপন্ন করার বিষয়টি তার অধিকার নয়; বরং এটি আল্লাহর হক্ব। কেননা কোন মানুষ কাউকে মিথ্যাবাদী বললে তাকেও মিথ্যাবাদী বলা সমীচীন নয়। অনুরূপভাবে অশ্লীল কাজ সম্পাদনকারীদের সাথে অশ্লীলতা করা যাবে না। আবার কেউ যদি বলৎকার অপছন্দ করে তবে তার উপর জোর করে বলৎকারের অপবাদ আরোপ করা যাবে না। কেননা এটা আল্লাহর হক্ব হওয়ার কারণে হারাম। যদিও খ্রিস্টানরা আমাদের নবীকে গালি দেয়, তাই বলে ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আমরা গালি দেব না। আবার রাফিযীরা আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাফির আখ্যায়িত করলেও আমরা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাফির আখ্যায়িত করব না...। এজন্য বিদ্বানগণ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তাদের বিরোধীদেরকে কাফির আখ্যায়িত করেন না, যদিও ঐ বিরোধীরা কুফরী করে থাকে।

যেহেতু কাফির প্রতিপন্ন করা শারঈ হুকুম। সুতরাং কাউকে অনুরূপ শাস্তি দেওয়া কোন ব্যক্তির জন্য সমীচীন নয়। যেমন কেউ যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে কিংবা তোমার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে তাহলে তোমার জন্য এটা উচিত হবে না যে, তুমিও তাকে মিথ্যাবাদী বলবে কিংবা তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে।

---

১. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬২

কেননা এটা আল্লাহর হক্ব হওয়ার কারণে হারাম। অনুরূপভাবে কাফির প্রতিপন্ন করাও আল্লাহর হক্ব। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকে কাফির বলেছেন তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে কাফির বলা যাবে না।[১]

৩. শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উছাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم فهومن الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة فيجب التثبت فيه غاية تثبت فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه

"কাফির ও ফাসিক হওয়ার হুকুম প্রদান আমাদের অধিকার নয়; বরং এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হক্ব। আর এটা শারঈ বিধানের অন্তর্ভূক্ত, যার প্রত্যাবর্তন কিতাব ও সুন্নাহের দিকে। সুতরাং এ ব্যাপারে তার উভয়ের চূড়ান্তভাবে অটল থাকা আবশ্যক। অতএব যার কাফির ও ফাসিক হওয়ার ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নাতের দলীল রয়েছে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফির বা ফাসিক আখ্যায়িত করা যাবে না"।[২]

৪. খালিদ আল-আম্বারী বলেন,

"কাফির প্রতিপন্ন করার হুকুম শারঈ এবং কেবল আল্লাহর হক্ব। কোন সংস্থা বা দল এর অধিকারী নয় এবং এ ব্যাপারে বিবেক বা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞান বিবেচ্য নয়। এখানে অতি আবেগ ও প্রকাশ্য শত্রুতার কোন স্থান নেই। স্থায়ীভাবে অত্যাচারী ব্যক্তি ও অবাধ্য ব্যক্তির যুলুমের কারণে তার উপর (কাফির আখ্যাদানের) হুকুম প্রযোজ্য হবে না। অথবা অতি প্রতাপশালী শক্তিধর ব্যক্তির শক্তি প্রয়োগ ও গাদ্দারীর কারণে তার উপরও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে কাফির বলেছেন তাকে ব্যতীত অন্যকে কাফির বলা যাবে না'।[৩]

চরমপন্থী তাকফীরীদের মূলভিত্তি:[৪]

শাইখ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাকফীরের আসল ভিত্তি যা ইদানিং চারদিকে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা হল কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত। যা এই লোকেরা সব সময় উপস্থাপন করে আসছে :

---

১. আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহুওয়া উছূলুত তাকফীর, পৃ. ১৯-২০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪. ফিত্‌নাতুত্‌ তাকফীর, পৃ. ৯-১৩

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির"।[১]

এই আয়াতের সাথে সম্পর্কিত আয়াতগুলোতে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির"।[২]

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই জালিম"।[৩]

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই ফাসিক্ব"।[৪] তারা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে উক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রথম আয়াতটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির"।[৫]

তাদের উচিত ছিল কমপক্ষে যেসব দলীলে 'কুফর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোকে কষ্ট করে হলেও একত্রিত করা। পক্ষান্তরে তারা এই একটি আয়াতে বর্ণিত 'কুফর' শব্দ দ্বারাই দ্বীন থেকে অন্যকে খারিজ ঘোষণা করেছে। এর ফলে তাদের কাছে কোন মুসলিম যদি এই কুফরে লিপ্ত হয়, তবে ঐ মুসলিমের সাথে মুশরিক, ইহুদী ও নাসারা প্রমূখদের কোন পার্থক্য নেই বলে তারা ভেবে থাকে।

কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর অভিধানে 'কুফর' শব্দের অর্থ শুধু এটাই নয়। অথচ তারা সেটাই দাবী করেছে। আর এই ভুল বুঝ দ্বারা অনেক মুসলিমকে তারা কাফির প্রতিপন্ন করছে, অথচ তাদের প্রতি তা প্রযোজ্য নয়।

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৪
২. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৪
৩. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৫
৪. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৭
৫. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৪

'তাকফীর' শব্দটি সব সময় একই অর্থ তথা দ্বীন থেকে খারিজ হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বরং এর সম্পর্কে পরবর্তী দু'টি আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ন্যায়ও হয়ে থাকে অর্থাৎ 'ফাসিক' ও 'জালিম'। সুতরাং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে জালিম বা ফাসিক্ব বৈশিষ্টের অধিকারী হবে। তার জন্য কখনই এটা প্রযোজ্য নয়, সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

অবশ্য কুফর এর একটি অর্থ প্রকৃত কাফির হয়ে যাওয়া। এই অর্থটি ও আরবী অভিধান, ইসলামী শরী'আ ও কুরআনের অভিধান দ্বারা স্বীকৃত। এ কারণে যে কেউই আল্লাহর হুকুমের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়- সে হাকিম বা শাসক হোক কিংবা সাধারণ প্রত্যেকেরই কুরআন, সুন্নাহ এবং সালফে-সালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী আহরিত ইলমের উপর কায়েম থাকা ওয়াজিব।

আরবী ভাষার নিজস্বতা সম্পর্কে জানা ছাড়া কুরআন ও ইসলামী শরী'আহ-এর গভীর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। আর এই নিয়মও প্রযোজ্য সে যদি কোন ব্যক্তির আরবী ভাষার ব্যাপারে এতটা শক্তিশালী অথবা পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা অর্জিত না হয়, তবে সে নিজের পরিকল্পনানুযায়ী যা সে নিজের ভিতরে আকাঙ্খা করে - সেক্ষেত্রে সে ঐ সমস্ত আলেমদের দিকে নিজেকে সোপর্দ করবে যারা পূর্বে চলে গেছেন। বিশেষ ভাবে যাদের সাথে কুরুনে সালাসাহ (নেককারদের তিনটি যুগ)-এর সম্পর্ক রয়েছে। যাদের হিদায়াত, কামিয়াবী ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তাদের দিকে নিজেকে প্রত্যাবর্তন করার দাবী হল, তাদের মাধ্যমে পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা। কেননা, তাদের মধ্যে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সম্পৃক্ততার নিদর্শন পাওয়া যায়। আসুন আমরা পুনরায় আয়াতটি প্রসঙ্গে আসি :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন তা দ্বারা যারা বিধান দেয় না তারা কাফির"।[১]

এই আয়াতটির ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ বাক্যটির উদ্দেশ্য কী?

সম্পূর্ণভাবে ইসলাম থেকে খারিজ (বহিষ্কার) হয়ে যাওয়া? নাকি এর অর্থ -কখনো ইসলাম থেকে খারিজ হওয়া, আবার কখনো ইসলাম থেকে পরিপূর্ণরূপে খারিজ না হওয়া অর্থাৎ আংশিকভাবে খারিজ হওয়া। এ পর্যায়ে আয়াতটি কিছুক্ষণ গভীরভাবে লক্ষ্য করুন। কেননা, আয়াতটি ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ বাক্যটির দ্বারা কখনো ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য হতে পারে।

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৪৪

আবার কখনো এর উদ্দেশ্য হতে পারে, আমলগত দিক থেকে কোন আহকামের ব্যাপারে ইসলাম থেকে খারিজ হওয়া। এর সহীহ তাফসীরের ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে যা সহযোগিতা করবে তা হল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোষিত মুফাস্‌সির সাহাবী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিশ্লেষণ। কেননা, কিছু গোমরাহ্ ফিরক্বাহ্ ছাড়া সবাই একমত যে সাহাবী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন তাফসীরের ব্যাপারে ইমাম। আর এ কারণেই আমার জানা মতে সম্ভবত, সাহাবী ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে 'তরজমানুল কুরআন' উপাধি দিয়েছিলেন।

"কুফর দূনা কুফর" (كفر دون كفر): এটাই সুস্পষ্ট হয় যে, এই আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সময় এমন কথা বলেছিলেন- যা আজকাল আমরা বলছি। অর্থাৎ তখন এমন কিছু লোক ছিল যারা আয়াতটির যাহেরী (প্রকাশ্য) অর্থ গ্রহণ করত। আর যে ব্যাখ্যার প্রতি আমি এখন ইঙ্গিত করছি তা তারা অস্বীকার করত। অর্থাৎ কখনই এটা যাহেরী অর্থ (কাফির অর্থ- মুরতাদ হওয়া) হবে না, বরং কখনো কখনো এর থেকে কম স্তরের কুফরও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এজন্য ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

"এটা এমন কুফর নয়, যার দিকে এরা (খারিজীরা) গিয়েছে। এটা এমন কুফর নয়, যা মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয়। বরং এটি হচ্ছে كفر دون كفر (চূড়ান্ত) কুফরের থেকে ছোট কুফর"।

এই আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে এটাই সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত জবাব। এছাড়া অন্যান্য দলীল যেখানে কুফর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোও এই মর্মটি ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়- যে ব্যাপারে আমি আমার আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি। কুফর শব্দটি অনেক দলীলেই উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু সেগুলো কুফরে আকবার অর্থে আসে নি। কেননা যে সব আমলের ক্ষেত্রে কুফর শব্দটি ঐ সব দলীলে ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় না। ঐ সমস্ত দলীলের মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের একটি প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা যায়, আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেক্বী, আর হত্যা করা কুফরী"।[১]

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৬০৪৪

আমার কাছে قتاله كفر বাক্যটি আরবী ভাষার একটি সূক্ষ্মতত্ত্বগত ব্যাপার। কেননা, যদি কেউ বলে, ফিসকও আল্লাহর নাফরমানী তথা তাঁর ইতা'আত থেকে খারিজ হওয়া। কিন্তু যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবী ব্যাকরণের ফাসাহাত ও বালাগাতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই তিনি বলেছেন :

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

"মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী, আর হত্যা করা কুফরী"।[১]

লক্ষ্য করুন, আমরা হাদীসে বর্ণিত فسق শব্দটিকে পূর্ববর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের তাফসীর হিসাবে فسق শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ :-

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইন দ্বারা বিচার করে না তারাই ফাসিক্ব"।[২]

তাহলে এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াত :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

এবং হাদীস : سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ "মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেক্বী"।[৩] এ ব্যবহৃত فسق শব্দটির দাবী কি একই হবে?

প্রকৃতপক্ষে فسق শব্দটি كفر শব্দটির পরিপূরক। যার দাবী হল كفر শব্দটি কখনো ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়, আবার কখনো كفر শব্দটির দাবী হল, যা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না। অর্থাৎ এর দাবী হল, যা পূর্বে তাফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে كفر دون كفر (বড় কুফর থেকে ছোট কুফর) আর হাদীসটিও সেই দাবী করেছে যে, এর অর্থ কখনো কুফরও হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন :

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৬০৪৪
২. সূরা আল-মায়িদাহ্: ৪৭
৩. সহীহ আল-বুখারী: ৬০৪৪

"মু'মিনদের দুই দল দন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দিবে। অতপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন"।[১]

এই আয়াতটিতে আমাদের রব বিদ্রোহী ফিরক্বার বর্ণনা দিয়েছেন যারা ফিরক্বায়ে নাযিয়াহ তথা প্রকৃত মু'মিন দলের সাথে ক্বিতাল করে। কিন্তু তাদের প্রতি কুফরের হুকুম দেন নি। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে, "মু'মিনকে হত্যা করা কুফর"। সুতরাং প্রমাণিত হল, ক্বিতাল কুফর কিন্তু এটি كفر دون (ছোট কুফর) যা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পূর্ববর্তী আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে।

শাইখ আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি, চরমপন্থী তাকফীরী সম্প্রদায় কুফুরি শব্দ পেলেই কাফির আখ্যায়িত করার জন্য লেগে পরে অথচ তাদের এই ভিত্তি শুদ্ধ নয় বরং সাহাবী ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের এ তাফসীর ও ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েছেন যা প্রমাণ করে কুফুরি বলা হলেই তা মুসলিম মিল্লাত থেকে খারিজ করে দেয় না।

তাকফীর বা কাফির সাব্যস্তকরণ-এর শর্তাবলী :

কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন পাপাচার বা কবিরা গুনাহে জড়িত হওয়ার কারণে কাফির না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইসলামের কোন রুকন ও ফরযকে অস্বীকার না করে। অথবা যদি কোন গুনাহের কাজকে হালাল মনে না করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে গালি দেয়া, কুরআন মাজীদকে পদদলিত করা ও অবমাননা করে পুড়িয়ে ফেলা, ব্যভিচারকে বৈধ মনে করা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন,

فإن استحل ذلك فإنه يحكم بكفره فإن زنى أو سرق أو شرب الخمر فلا يقال بأنه كافر...

"কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে গুনাহের কাজকে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি যেনা করে, ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে কিংবা মদ পান করে, তবুও তাকে কাফির বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এসব হারাম কাজকে বৈধ মনে না করবে। তবে এসব গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে ফাসিক বলা যাবে"।[২]

---

১. সূরা আল-হুজুরাত : ৯

২. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬

কাফির বিধান প্রযোজ্য হওয়ার শর্তাবলী :

১। জ্ঞান থাকা : যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হচ্ছে সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এ বিষয়ে উক্ত ব্যক্তির জ্ঞান না থাকে তাহলে কুফরি কাজের জন্য তাকে কাফির বলা যাবে না। বরং এ ক্ষেত্রে তাকে উপযুক্ত পন্থায় সংশয় মুক্ত জ্ঞান দান করতে হবে। উপযুক্ত পন্থায় সংশয় মুক্ত জ্ঞান না দিয়ে কাফির বললে নিজেই কাফির হয়ে যাবে। কারণ: কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে কাফির বলা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ. فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলে সম্বোধন করবে, সত্যিকার অর্থে সে যদি কাফির না হয় তাহলে সম্বোধনকারী ব্যক্তিই কাফির হয়ে যাবে।"[১]

২। ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকা : যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা থাকতে হবে। যদি ক্ষমতা ও স্বাধীনতা না থাকার কারণে কুফরি কাজ করে তবে কাফির হবে না।

৩। স্মরণ ও ইচ্ছা থাকা : যে অপরাধের কারণে কোন ব্যক্তিকে কাফির বলা হবে, সে অপরাধ করলে কাফির হয় বলে কুরআন-হাদীসের দলীল প্রমাণিত হতে হবে। এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে সে অপরাধে জড়িত হওয়া প্রমাণিত হতে হবে। যদি অনিচ্ছায় বা ভুলক্রমে উক্ত অপরাধে জড়িত হয় তবে তাকে কাফির বলা যাবে না।

অতএব, উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, সরকার ও সরকারী দায়িত্বশীলদের রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটি ও পাপ থাকলেই বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কুরআনের বিধান অনুযায়ী শাসন করতে না পারলে ঢালাওভাবে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে আনুগত্য ত্যাগ করা ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যাবে না। কারণ ইসলামে সকল অপরাধ কুফুরি কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়না তাই কাউকে কাফির আখ্যা দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা এ বিষয়ে ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী।

এছাড়া ইসলাম বিধ্বংসী কতিপয় কাজ রয়েছে, তন্মধ্যে অতি মারাত্মক হচ্ছে ১০টি। এগুলির কোন একটি কারো দ্বারা সংঘটিত হলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। সেই কাজগুলি হচ্ছে:

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৬১০৪; সহীহ মুসলিম: ৬০

১। শিরক করা তথা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক সাব্যস্ত করা। এই শিরক আল্লাহর যাত, ছিফাত ও ইবাদত যে কোন ক্ষেত্রে হোক না কেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। শিরক ব্যতীত অন্য যত পাপ রয়েছে তিনি ইচ্ছা করলে সবই ক্ষমা করে দিতে পারেন"।[১]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি শিরক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম। আর এ সকল যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকবে না"।[২]

২। যে ব্যক্তি নিজের ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা করে এবং তাদের উপর নির্ভর করে ও ভরসা রাখে, সে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে কাফির বলে গণ্য হবে।

৩। যে ব্যক্তি মুশরিকদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করবে না বা তাদের কুফরিতে সন্দেহ পোষণ করবে কিংবা তাদের ধর্মকে সঠিক বলে মনে করবে সে কাফির বলে পরিগণিত হবে।

৪। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শের চেয়ে অন্যের আদর্শকে পূর্ণাঙ্গ বলে বিশ্বাস করবে কিংবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত বিধান অপেক্ষা অন্যে বিধানকে অধিক উত্তম মনে করবে, সে কাফির বলে গণ্য হবে।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত বিধানের প্রতি যদি কেউ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কিংবা তাঁর আনীত সুন্নাহর প্রতি ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়, তাহরে সে কাফির বলে পরিগণিত হবে। যদিও বাহ্যিকভাবে সে ঐ বিধানের উপর আমলও করে।

---

১. সূরা আন-নিসা: ১১৬

২. সূরা আল-মায়িদাহ: ৭২

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিষয়কে ঘৃণা করেছে, সুতরাং আল্লাহ তাদের আমলগুলোকে বরবাদ করে দিয়েছেন"।[১]

৬। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীনের কোন বিধান বা অন্য কোন কিছু যেমন পুরস্কার বা শাস্তি ইত্যাদি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে, সে কাফির। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"(হে রাসূলুল্লাহ!) তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর আয়াত সমূহের সাথে এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? কোন প্রকার ওযর-আপত্তির অবতারণা কর না। তোমরা ঈমান আনয়নের পর আবার কুফরি করেছ"।[২]

৭। যাদু-টোনা করা। কাউকে অন্যের নিকট থেকে ফিরিয়ে রাখা, কাউকে কারো সাথে সংযুক্ত করে অবলম্বন করাও যাদুর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি যাদু করবে বা তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

"ঐ দু'জন (হারূত-মারূত ফেরেশতাদ্বয়) এই কথা না বলে কাউকে যাদু শিক্ষা দিতেন না যে, নিশ্চয়ই আমরা (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা স্বরূপ। সুতরাং (আমাদের নিকট থেকে যাদু শিখে) কাফির হয়ো না"।[৩]

৮। মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য-সহযোগিতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের (বিধর্মীদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদেরকে সহযোগিতা করে না"।[৪]

---

১. সূরা মুহাম্মাদ: ৯

২. সূরা আত-তাওবা: ৬৫-৬৬

৩. সূরা আল-বাক্বারাহ: ১০২

৪. সূরা আল-মায়িদাহ: ৫১

৯। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনীত শরী'আতের বাইরে থাকার অবকাশ রয়েছে, সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের দলভুক্ত হবে"।[১]

১০। আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলাম হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ হওয়া। দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করা, তদনুযায়ী আমল না করা, এ ধরনের মানসিকতার ব্যক্তিও কাফির বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾

"ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে বেশি যালিম হতে পারে, যাকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে স্বীয় প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা, অতঃপর সে তা হতে বিমুখ হয়েছে? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী"।[২]

তাকফীর বা কাফির সাব্যস্তকরণ হারাম প্রসঙ্গে ওলামায়ে কিরামের অভিমত:

১। ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'নিরানব্বই দিক থেকে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করার সম্ভাবনা থাকে, আর এক দিক থেকে যদি তার ঈমানদার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মুসলিমের উপর ভাল ধারণা পোষণ করার লক্ষ্যে তাকে ঈমানদার হিসাবেই আমি গণ্য করব'।[৩]

২। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বিচারক ও আলিমদেরকে বলতেন, 'তোমরা যেসব কথা বল আমি যদি তা বলতাম, তাহলে অবশ্যই কাফির হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি তোমাদের কাফির আখ্যা দিতে পারছি না। কারণ তোমরা আমার দৃষ্টিতে অজ্ঞ'।[৪]

৩। ইমাম নববী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, 'জেনে রাখুন! হক্বপন্থীদের মানহাজ এই যে, গুনাহের কারণে কিবলা অনুসারী কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। এমনকি প্রবৃত্তি ও বিদ'আতের অনুসারী খারিজী,

---

১. সূরা আলে ইমরান: ৮৫
২. সূরা আস-সাজদাহ: ২২
৩. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

মু'তাযিলা ও অন্যান্য সম্প্রদায়কেও কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন কিছুকে জেনে শুনে অস্বীকার করবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির। তবে যদি নওমুসলিম হয় অথবা দূরবর্তী এমন কোন গ্রাম্য এলাকায় বসবাসকারী হয় যার নিকট ইসলামের সমস্ত নিয়ম-কানূন পৌঁছেনি সে কাফির হবে না। তাকে ইসলামের বিধান সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। অবহিত করার পরেও যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে কাফির বলা যাবে। অনুরূপভাবে যদি যেনা অথবা মদ পান কিংবা হত্যাসহ বিভিন্ন ধরণের হারাম কর্মকে জেনে শুনে হালাল মনে করে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে'।[১]

৪। ইবন তাইমিয়াহ বলেন, 'কখনো কখনো মৌলিক কথা কুফরির পর্যায়ভুক্ত হয়। এর ফলে এ কথার প্রবক্তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যেতে পারে এভাবে, যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলবে সে কাফির। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কুফরি কথা বলে তাহলে নির্দিষ্ট করে তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপক্ষে এমন দলীল প্রতিষ্ঠিত না হবে যা তাকে কাফির হিসাবে প্রমাণ করে'।[২]

তিনি আরো বলেন, 'মুহাদ্দিছ মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী জমহুর ফক্বীহ, সকল ছূফী, দার্শনিক মতবাদের অনুসারী মু'তাযিলা ও খারিজীদের একদল অন্যান্য অনেকে এ ব্যাপারে ঐক্যমত যে, যার নিকটে রিসালাত সম্পর্কে প্রমাণ সাব্যস্ত হওয়ার পরও সে তার উপর ঈমান আনে না সে কাফির'।[৩]

তিনি আরো বলেন :

يقول علماء السلف في المقدمات الا عتقادية لا نكفر أحدا من اهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل و قد ثبت الزنا والسرقة و شرب الخمر على أناس في عهدالنبي صلى الله عليه و سلم ولم يحكم فيهم حكم من كفر بل جلد هذا

'সালাফী মনীষীগণ আক্বীদার ক্ষেত্রে ভূমিকাতেই বলে থাকেন যে, আমরা কোন অপরাধের কারণে আহলে ক্বিবলা বা ক্বিবলার অনুসারী কাউকে কাফির আখ্যায়িত করি না এবং কোন অপকর্মের জন্যও ইসলাম থেকে কাউকে খারিজ করে দেই না।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

৩. দ্রঃ খালিদ ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আম্বারী, আল-হুকমু বিগইরী মা আনযালাল্লাহু ওয়া উছ্লুত তাকফীর (রিয়ায : মুয়াসসাসাতুল জারীসী, ৩য় প্রকাশ : ১৪১৭ হিজরী), পৃ. ১৬

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে অনেক মানুষের দ্বারা ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপানের মত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু তিনি তাদের ব্যাপারে কাফির হওয়ার বিধান পেশ করেন নি। বরং তিনি এক্ষেত্রে শাস্তির বিধান করেছেন'।[১]

৫। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি ইসলামী বিধান সম্পর্কে না জেনে আব্দুর কাদির জিলানী অথবা সাইয়্যিদ বাদাবীর কবরে সিজদা করে, তাহলেও তাকে কাফির আখ্যা দেয়া যাবে না। তবে ইসলামের বিধান ও দলীল সম্পর্কে জানার পরেও যদি সিজদা করে তাহলে সে কাফির'।[২]

৬। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'সেই সব মুসলিমদেরকে আমরা কাফির আখ্যা দিতে পারি না যাদের নিকট কাফির আখ্যা দানের দলীলগুলো স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা হয়নি। কেননা তাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ দাঈ (দাওয়াতদাতা) নেই, যারা জনগণের দ্বারপ্রান্তে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম'।[৩]

৭। শায়খ আবদুল আযীয ইবন বায (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'খারিজী সম্প্রদায় গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দিয়েছে এবং গুনাহগারদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলেছে। মু'তাযিলা সম্প্রদায়ও শাস্তির দিক থেকে (অর্থাৎ তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী) খারিজীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছে। কিন্তু তারা তাদেরকে কুফর ও ঈমান উভয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় স্থান দিয়েছে। নিঃসন্দেহে এসবই ভ্রষ্টতা। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাই চিরসত্য। আর তা হচ্ছে এই যে, কোন মুসলিমকে গুনাহের কারণে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহকে হালাল মনে না করবে'।[৪]

৮। ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন :

وأما نحن فنقول إن كل من كفر فهو فاسق ظالم عاصي وليس كل فاسق ظالم عاص كافرا بل قد يكون مؤمنا بالله

---

১. শায়খুল ইসলাম ইমাম আহমাদ ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমুউ ফাতাওয়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৭০-৭৬

২. ফিতনাতুত তাকফীর, পৃ. ৬৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

'আমরা বলি, যারাই কুফরি করে তারা ফাসেক, যালেম, অবাধ্য-পাপী। আর প্রত্যেক ফাসেক-যালেম-পাপী কাফির নয়; বরং আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী কিছুটা হলেও মুমিন থাকে'।[১]

৯। আল্লামা সিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (১৮০৫-১৯০২ খৃ.) বলেন :

لا يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر

'কবীরা গুনাহ বা অন্যান্য পাপের কারণে আহলে ক্বিবলা বা ক্বিবলার অনুসারী কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা যায় না'।[২]

১০। ইমাম ত্বাহাবী (২৩৯-৩২১ হি.) বলেন :

ولا أحدا من اهل القبلة بذنب مالم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

'আমরা এমন কোন অপরাধের কারণে আহলে ক্বিবলা বা ক্বিবলার অনুসারী কাউকে কাফির আখ্যায়িত করি না, যে অপরাধ তার (জান-মাল) হালাল করে না। আবার এটাও বলি না যে, সে যে অপরাধ করে তা তার ঈমানের ক্ষতি করে না'।[৩]

উপসংহার

আমরা জানি তাকফিরী মানহাজ বা কর্মনীতি হচ্ছে মূলত বিপথগামী ও চরমপন্থী খারিজী সম্প্রদায়ের মানহাজ। তারাই প্রথমে মুসলিমকে কাফির আখ্যা দানের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতার সূচনা করে। তাদের এই আচরণ ছিল ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত কলংকজনক ইতিহাস। তারা নিজেদের এসব কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়ার জন্যে বড় হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে কাফির আখ্যা দানের ফিৎনাকে। এবিষয়ে শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফিতনাতুত তাকফীর নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা উপরোক্ত আলোচনাও এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, এটি চরমপন্থীদের আবিস্কার এবং তাকাফীর বা কাফির আখ্যাদানের ভয়াবহতা সম্পর্কে না জানার কারণেই তারা মূলত তারা নিজেদেরকে এই কাজে লিপ্ত করেছে। বর্তমানে আমাদের যুবকদের মাঝে এই ফিতনার প্রসার লক্ষ করছি। আমরা যুবসমাজকে অনুরোধ করতে চাই, তারা যেন এই বিষয়ে নিজেদেরকে আন্দাজ অনুমান ও সন্দেহের উপর ভিত্তি করে সম্পৃক্ত না করে। বরং এই বিষয়ে

---

১. আল-ফিছাল ফিল মিলালওয়ান নিহাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫
২. আল্লামা সিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, কাৎফুছ ছামার, পৃ. ৮৪
৩. শরহু আল-আক্বীদাতুত ত্বাহাবিয়াহ, পৃ. ৩৫৫

যোগ্য আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এই ধরনের ভয়াবহ বিষয়ে যারা ইসলামের বিদগ্ধ আলেমদের শরণাপন্ন হবে না বরং তাদেরকে উপেক্ষা করবে তারা যেকোনভাবে পথভ্রষ্ট হতে পারে। কারণ তাকফীরের বিষয়টি দু'মুখো ছুরির মতো। এতে হয়ত নিজের অথবা অন্যের ধ্বংস অপরিহার্য। তাই আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সবাইকে সঠিক জ্ঞান ও হিদায়াতের তাওফিক দান করেন এই দো'আ করা দরকার।

(অত্র লেখাটি ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম লিখিত ও শ্যামলবাংলা প্রকাশনী, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত "জিহাদ ও জঙ্গিবাদ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" ও রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস থেকে প্রকাশিত "ইসলামের দৃষ্টিতে চরমপন্থা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস এবং রিভাইভ্যাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির অবস্থান গ্রন্থদ্বয়ের সহযোগিতায় সংকলিত ও সম্পাদিত।)

ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের কোন সম্পর্ক নেই

الإرهاب لا علاقة له بالإسلام

মুহাম্মদ আবদুল কাহহার

সিনিয়র শিক্ষক

গজমহল ট্যানারী উচ্চ বিদ্যালয়, জিগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা

জঙ্গি, জঙ্গিবাদ ও জঙ্গিবাদী শব্দগুলোর মূল হল জঙ্গ। এটি ফার্সী ও উর্দু ভাষার শব্দ হলেও বাংলা ভাষায় এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। জঙ্গ অর্থ যুদ্ধ, রণ, সমর, তুমুল কলহ, প্রচণ্ড ঝগড়া। জঙ্গি অর্থ যোদ্ধা, যুদ্ধ সংক্রান্ত, রণকুশল, প্রকাণ্ড, মারমুখো।[১] আমরা বর্তমানে 'জঙ্গি' বলতে বুঝি বে-আইনী সহিংসতা ও খুনখারাপি। এ অর্থে প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত পরিভাষা সন্ত্রাস (terrorism), যারা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র বা সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত তাদেরকে আমরা 'চরমপন্থী' বলি। আর যারা ইসলামের নামে বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা, অস্ত্রধারণ, সহিংসতা বা খুনখারাপিতে লিপ্ত তাদেরকে বলি জঙ্গি।

'বিশ্ব মুসলিম সংস্থার' অধীন 'ইসলামী ফিক্হ কাউন্সিল' ১৪২২ হিজরীতে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত ১৬ তম অধিবেশনে সন্ত্রাসের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে তা হচ্ছে, কোন ব্যক্তি, সঙ্গান বা রাষ্ট্র কোন মানুষের ধর্ম, বিবেক বুদ্ধি, ধন-সম্পদ ও সম্মান-মর্যাদার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যে শত্রুতার চর্চা করে তাকে সন্ত্রাস বলে।[২] আর সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের কোনো যোগসূত্র নেই। অনৈতিক, অকল্যাণ, অনিয়ম, ন্যায়ের পরিপন্থী, ক্ষতিকর, অগ্রহণীয় ও অগ্রহণযোগ্য কোন কাজই ইসলাম সমর্থন কিংবা অনুমোদন করে না। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে ইসলামকে সন্ত্রাসের জনক বলে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথচ ইতিহাস ও বাস্তবতা হচ্ছে এর বিপরীত। সন্ত্রাস বলে যা বুঝানো হয় তার শুরু হয় ইহুদি উগ্রবাদীদের দ্বারা।

ইসলামের ইতিহাসে আমরা যুদ্ধ দেখতে পেলেও সন্ত্রাসের সাথে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল ইসলাম সমর্থন করে না। সম্প্রতি কিছু মুসলিম বিভিন্ন দেশে অযোদ্ধা ও নিরীহ মানুষদের হত্যা করছে বা সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে- এটি ন্যাক্কারজনক। গোটা পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সন্ত্রাসী ঘটনা সংগঠিত হলেও ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে দায়ী করা হয় না। ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাস বা হত্যার বিষয়ে যা কিছু বলা হয় তার অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক ও অনুমান নির্ভর অপপ্রচার, যা ভিত্তিহীন।

---

১. নরেন বিশ্বাস, বাংলা একাডেমী বাঙলা উচ্চারণ অভিধান, বাংলা একাডেমী ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণের তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪১৪/ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৫৩

২ . মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান, হত্যা-গুম-অপহরণের কারণ ও প্রতিকার, দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ আগস্ট ২০১৬

ইসলাম কখনো জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না বরং এটি হারাম। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী (জানুয়ারি ১৬) বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যার ৮৬.৬% মুসলিম হলেও এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে।[১] প্রকৃত মুসলিমরা কখনই সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদকে পছন্দ করেন না। জঙ্গিদের কর্মকাণ্ডকে তারা গ্রহণ করেন না।

গণমাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, উগ্রবাদী ও জঙ্গিরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্দিষ্ট একটি গণ্ডিতে তারা বসবাস করেন। সাধারণ মানুষের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা নেই বলেই কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ায় ঈদুল ফিতরের দিন (২০১৬) পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় নিহত জঙ্গি আবির রহমানের জানাযায় কবরস্থানের তত্ত্বাবধায়ক মাওলানা মাহতাব উদ্দীন ব্যতীত আর কাউকে দেখা যায়নি। এমনকি জঙ্গিদের পিতা, মাতা বা পরিবারের অন্য সদস্যরাও তাদের পরিচয় প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। নিহত জঙ্গিদের লাশ বেওয়ারিশ হিসেবে চিহ্নিত করে দাফন করা হয়। এ থেকেই স্পষ্ট যে, এ দেশের মানুষ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে গ্রহণ করেন না। পথে-ঘাটে, বাসা-বাড়িতে ঢুকে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ইসলাম সমর্থন করে না। মুখে 'আল্লাহু আকবার' স্লোগান তুলে কারো ওপর হামলা করলেই তা বৈধ হয়ে যায় না। আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। ইসলাম গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর স্বয়ং আল্লাহই ছেড়ে দিয়েছেন এবং বল প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾

"যার মন চায় সে ঈমান আনবে, আর যার মন চায় সে কুফরী করবে"।[২]

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

"দ্বীন গ্রহণে কাউকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করা যাবে না। সত্য পথ গোমরাহী বা ভুল পথ থেকে সুস্পষ্টভাবেই পৃথক হয়ে গিয়েছে"।[৩]

---

১. দৈনিক ইনকিলাব, ১৫ জুলাই ২০১৬
২. সূরা আল-কাহাফ: ২৯
৩. সূরা আল-বাকারাহ্: ২৫৬

ইসলামের নামে যারা জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত তারা এটিকে জিহাদ হিসেবে গণ্য করেন। সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কার্যক্রমকে জিহাদ বলে চালিয়ে দেয়ার কারণে জিহাদের প্রতি মানুষের বিরূপ ধারণা তৈরী হতে শুরু করেছে। কেউ আবার জিহাদ আর কিতালকে একত্র করে ফেলছেন। অথচ জিহাদ একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ আমল। এটি শুরু হয় ব্যক্তি নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অবস্থানের মাধ্যমে। অথচ এই কুরআনিক শব্দের অপব্যাখ্যা করে জঙ্গিবাদের প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। আরবি জিহাদ শব্দটি জাহদুন বা জহুদুন শব্দ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। "কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ" আল কুরআনে জিহাদের সমর্থক। [১] জিহাদ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, যুদ্ধ, প্রচেষ্টা, সাধনা।[২] এককথায় কঠোর পরিশ্রম করা, চূড়ান্ত শ্রম-সাধনা করা। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সাধ্যমত সাধনা করা। কোন বিষয়ে নিজেকে প্রাণপণে নিবেদিত করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বপ্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জান-মাল, শক্তি-সামর্থ্য, জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রভাব-প্রতিপত্তি যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে সংগ্রাম করার নাম জিহাদ।[৩] সকল প্রকার অন্যায়-অবিচার, জুলুম-নিপীড়ন, ফেতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদ, আগ্রাসন প্রতিরোধ ও দ্বীনকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের জিহাদ পরিচালিত হয়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾

"যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর কাছে তাঁরা উচ্চ মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ; আর তাঁরাই সফলকাম"।[৪]

ইসলামী স্কলারদের মতে জঙ্গিবাদের কারণগুলোর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন, আগ্রাসন ও ষড়যন্ত্র, মুসলিম দেশে ইসলাম দমন, বেকারত্ব ও হতাশা এবং ইসলামের শিক্ষার বিকৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলোকে আমলে নিয়ে জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে।

---

১. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআনের পরিভাষা, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন, প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ১৯৯৮ ঈসায়ী, পৃ. ২১১

২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০০০ ঈসায়ী, পৃ. ২৬৭

৩. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, এপ্রিল, ২০০৯ ঈসায়ী, পৃ. ৬৩৪

৪ . সূরা আত-তাওবা: ২০

দেশের কোথাও কারো ওপরে যখন কোনো হামলা হয় তখন একশ্রেণির লোকদের বলতে শোনা যায়, হামলাকারীর মাথায় টুপি ছিল, গায়ে লম্বা জামা ছিল, মুখে দাড়ি ছিল, মাদ্‌রাসার ছাত্র ইত্যাদি বলে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। মাদ্‌রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও মাদ্‌রাসা সংশ্লিষ্টদের প্রতি ইঙ্গিত করে। এছাড়া অপরাধীদের কেউ কেউ হয়তো কোন এক সময়ে মাদ্‌রাসায় লেখা পড়া করেছেন বা মাদ্‌রাসাকে ভালোবাসেন, অথবা নিবন্ধনকৃত কোনো একটি ইসলামি দলের সাথে সম্পৃক্ত অথবা তিনি মনে প্রাণে ইসলামকে ভালোবাসেন বলেই ধর্মীয় বই পড়েন, লিখেন এবং তা সংরক্ষণ করেন।

এমন একজন ব্যক্তি যখন নূন্যতম কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়েন তখনই তাকে কেন্দ্র করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে মাদ্‌রাসা, ইসলামকে জানা ও বুঝার নানা ধরণের প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করার পাঁয়তারা চালানো হয়। যারা উদ্দেশ্য প্রণদিতভাবে মাদ্‌রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করছেন তারা জেনে থাকবেন যে, নীতিগত ভাবে কোন মাদ্‌রাসাতেই জঙ্গি তৈরী হয়না। কোন মাদ্‌রাসায় জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ কিংবা তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাও শোনা যায় নি। মাদ্‌রাসার কোন আবাসিক হল থেকে অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত নেই। মাদ্‌রাসা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোন মামলা ছাড়া অন্য মামলার তথ্য পাওয়া যাবেনা এমনটিই জনসমাজে স্বীকৃত। অথচ সম্প্রতি গুলশানে যারা হামলা করেছিল তাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিল। কিন্তু কেউ তো সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধের জন্য আওয়াজ তুললো না। যদিও আমরা বন্ধের দাবী করছি না।

এছাড়া বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হল থেকে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা নতুন কোনো বিষয় নয়। অথচ বোমাবাজী, টেন্ডারবাজী, পুলিশের অস্ত্র ছিনতাই, মানুষ হত্যা, গুম-খুন, চাঁদাবাজি, রাহাজানি জোর-যুলুম, জমি দখল, হল দখল, অবৈধ অস্ত্র কেনা-বেচা, ইভটিজিং, ধর্ষণসহ নানা অপকর্মের সাথে কতিপয় সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই জড়িত বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু এ জন্য কোন বিদ্যালয়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার কথা শোনা যায় না। সাধারণ শিক্ষার ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নজরদারী বাড়ানো কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানকে দায়ীও করা হয়না। এ ধরণের সকল অপরাধকে ব্যক্তিগত অপরাধ বলে ধরে নেয়া হয়। তাহলে মাদ্‌রাসা ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে শত্রুতা কেন? মূলত ইসলামের বিদ্বেষকারীদের পক্ষেই এ ধরনের ধ্যান-ধারণা রাখা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা আবাসিক হলগুলোতে অস্ত্র পাওয়ার পরেও সেটা যদি জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আওতায় না পড়ে তাহলে মাদ্‌রাসার ছাত্ররা এমন কি অঘটন ঘটিয়েছে যার কারণে তাদেরকে জঙ্গী বলতে হবে?

ওইসব কাজে মাদ্‌রাসার ছাত্রদের সম্পৃক্ততা তো কখনোই ছিলনা। তারপরেও তাদের বিরুদ্ধে কেন অপবাদ দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"তোমরা মন্দ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মন্দ ধারণাপ্রসূত কথাবার্তা নিকৃষ্টতম মিথ্যাচার"।[১]

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কোন মুসলিম ভাইয়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসা কোন শব্দের কারণে তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সেটির কোনো কারণ খুঁজে পাবেন"।[২]

ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে সু-নীতি অবলম্বন করলে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব।

মূলত স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসাসহ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অসৎ কর্মকাণ্ডের শিক্ষা দেয়া হয় না। সুতরাং যারা বিপদগামী হয় তাদের কারণে কোন প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা নিছক বোকামি বা অজ্ঞতা বা শত্রুতা ছাড়া কিছু নয়। কোনো মানুষ যদি সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী কাজ করে তাহলে সেটা তার ব্যক্তি অপরাধ বলেই গণ্য হবে। ব্যক্তির দোষের কারণে কোন প্রতিষ্ঠান ও দলকে দায়ী করা অনুচিত। স্কুল কিংবা মাদ্‌রাসায় পড়ুয়া যে কেউ বিপথগামী হতেই পারে। তার জন্য গোটা সমাজ ও জাতীকে দায়ী করা অজ্ঞতার শামিল। এতে করে সমাধানের পরিবর্তে বহুবিধ সমস্যা তৈরী হয়। মাদ্‌রাসায় অধ্যয়ন করলে জঙ্গি হতে পারে আর স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করলে জঙ্গী হয় না, হতে পারেনা এমন ধারণা রাখা ঠিক নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না থাকার ফলে যে কারো পক্ষেই বিপগদামী হওয়া সহজ। অপরাধী যেই হোক না কেন বা যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন তার অপরাধের কারণে দল, প্রতিষ্ঠান বা ধর্মকে দোষারোপ করা যাবে না একই সাথে এটিও বলবো, কোন শিক্ষার্থী বা কোন মানুষ বিপদগামী হলে সে জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা দলকে ততক্ষণ পর্যন্ত দায়ী করা উচিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের সহযোগিতা বা জড়িত থাকার সত্যতা না মিলবে।

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ২৭৪৯ ; সহীহ মুসলিম: ২৫৬৩

২. মা'আরেফুল কোরআন

মুসলমানরা কখনোই অশান্তি চায়না। তারা শান্তিতে বিশ্বাসী। যুগে যুগে যেসব বর্বর হামলা হয়েছে তার সাথে শান্তিকামী মানুষের অংশগ্রহণ ছিলনা। অন্যায়ভাবে হত্যা করা ইসলাম অনুমোদন করেনা। কেউ যদি ইসলামের বিধি-বিধান উপেক্ষা করে তাদের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে ইসলামের নামে চালিয়ে দেয় সেটা হবে মহা অন্যায়। তাই নিশ্চিন্তে বলা যায়, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। যারা প্রকৃত ইসলামের কথা বলে তারা কখনোই জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হতে পারেনা। উগ্রপন্থীরা ইসলামের অপপ্রচারের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে অনলাইন ও গণমাধ্যমকে বেছে নিয়েছেন। গণমাধ্যমে ইসলামের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে এক শ্রেণীর মানুষ ভ্রান্ত মতবাদের সাথে জড়িয়ে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ওয়েবসাইটে বিভিন্ন নামে ব্লগ খুলে বোমাবাজি, হত্যা, খুনসহ নানা অপরাধের কৌশল শিখাচ্ছেন। কিছু কিছু সাইট এমন আছে, যেখানে সর্বদাই জিহাদের অপব্যাখ্যা প্রচার করা হচ্ছে। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই একটি গোষ্ঠী ইসলামী সংগঠনের নাম ব্যবহার করে নানা সময়ে চিঠি, লিফলেট, ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে বিতর্কের ঝড় তুলছেন। এ ধরণের কর্মকাণ্ড মুসলমানদের জন্য খারাপ দৃষ্টান্ত বৈ কিছুই নয়। সমাজে শান্তি, কল্যাণ ও ন্যায়-ইনসাফ এবং মানুষের জানমাল ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের দিক নির্দেশনা রয়েছে তা হুবহু মানতে হবে।

সর্বোপরি, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ থেকে বেঁচে থাকতে হলে যথাযথভাবে ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞান, সুশাসনের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, সর্বস্তরে জবাবদিহিতা, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি আল্লাহ যেন আমাদেরকে তার সঠিক দ্বীন বুঝা ও আমল করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

খারিজী সম্প্রদায়: পরিচয়, উৎপত্তি ও চিন্তাধারা

التعريف بالخوارج : نشأتها وأفكارها

ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাসী গ্রুপের উত্থানের প্রথম ঘটনা আমরা দেখতে পাই খারিজী সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড। ৩৫ হিজরী সালে (৬৫৬ খৃ.) ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান উসমান ইবনু আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম রাষ্ট্রের সেনাপতি ও গভর্নরগণ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আলীর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি দাবি জানান যে, আগে খলীফা উসমানের হত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। আলী দাবি জানান যে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পূর্বে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে, কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্রমান্বয়ে বিষয়টি জোরালো হয়ে গৃহ যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে উভয়পক্ষে হতাহত হতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিশী মজলিস গঠন করেন। এই পর্যায়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর অনুসারীগণের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষ ত্যাগ করেন। এদেরকে 'খারিজী' দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। এরা ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ, যারা রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের প্রায় সকলেই ছিলেন যুবক। এরা ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ ও নিষ্ঠাবান আবেগী মুসলিম। এরা দাবি করেন যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই চলবে না। আল্লাহর বিধান অবাধ্যদের সাথে লড়তে হবে। আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾

"মুমিনগণের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর তাদের একদল অপর দলের উপর অত্যাচার বা সীমালঙ্ঘন করলে তোমরা জুলুমকারী দলের সাথে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে"।[১]

এছাড়া কুরআনুল কারীমে এরশাদ করা হয়েছে: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾

'কর্তৃত্ব শুধুমাত্র আল্লাহরই' বা "বিধান শুধু আল্লাহরই"।[২]

---

১. সূরা আল-হুজুরাত: ৯

২. সূরা আল-আন'আম: ৫৭

কাজেই মানুষকে ফয়সালা করার দায়িত্ব প্রদান কুরআনের নির্দেশের স্পষ্ট লঙ্ঘন। কুরআনুল কারীমে আরো এরশাদ করা হয়েছে,

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির"।[১]

তারা কুরআনের এসব নির্দেশনার অপব্যাখ্যা করে। আলী ও তার অনুগামীগণ যেহেতু আল্লাহর নাযিল করা বিধান মত মু'আবিয়ার সাথে যুদ্ধ না চালিয়ে, সালিসের বিধান দিয়েছেন, সেহেতু তাঁরা কাফির। তারা দাবি করেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁদের অনুসারীগণ সকলেই কুরআনের আইন অমান্য করে কাফির হয়ে গিয়েছেন। কাজেই তাদের তাওবা করতে হবে। তাঁরা তাঁদের কর্মকে অপরাধ বলে মানতে অস্বীকার করলে তারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। তাঁরা তাঁদের মতের পক্ষে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উদ্ধৃত করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবী তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, কুরআন ও হাদীস বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আজীবনের সহচর সাহাবীগণ। কুরআন ও হাদীসের তোমরা যে অর্থ বুঝেছ তা সঠিক নয়, বরং সাহাবীদের ব্যাখ্যাই সঠিক। এতে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের মতকেই সঠিক বলে দাবি করেন।

এরা ইসলাম ও মুসলিম সম্পর্কে 'পিউরিটান' ধারণা লালন করত। তারা মনে করত যে, ইসলামী বিধিবিধানের লঙ্ঘন হলেই মুসলিম ব্যক্তি কাফিরে পরিণত হয়। এজন্য তারা এইরূপ কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠা' বা রাজনৈতিক পর্যায়ে ইসলামী বিধিবিধান পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে দলবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করে। পাশাপশি এই মহান উদ্দেশ্যে (!) যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র গুপ্ত হত্যা করে। এছাড়া তারা আলীকে কাফির মনে করেন না এরূপ সাধারণ অযোদ্ধা পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করতে থাকে।

খারিজীদের ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী :

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ: ৪৪

يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مَعَ صَلاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের সালাতের পাশে তোমাদের সালাত তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের সিয়ামের পাশে তোমাদের সিয়াম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যাদের নেক কর্মের পাশে তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছেই নগণ্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে, যারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন শিকারের দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অন্য দিক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়, তেমনিভাবে তারা দীনের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে"।[১]

এদের পরিচয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে দিয়েছেন,

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة

"শেষ যুগে এমন একটি সম্প্রদায় আগমন করবে যারা বয়সে তরুণ এবং তাদের বুদ্ধিজ্ঞান অপরিপক্কতা, বোকামি ও প্রগলভতায় পূর্ণ। মানুষ যত কথা বলে তন্মধ্যে সর্বোত্তম কথা তারা বলবে। কিন্তু তারা ইসলাম থেকে তেমনি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, যেমন করে তীর শিকারের দেহ ভেদ করে ছিটকে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তোমরা যখন তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে"।

এখানে ইসলামের নামে বা সত্য, ন্যায় ও হক্ক প্রতিষ্ঠার নামে সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত মানুষদের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে:

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৫০৫৮

প্রথমত, এরা অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের। এদের নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি সবই যুবক বা তরুণদের হাতে। সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ আলিম ও নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব বা পরামর্শ এরা মূল্যায়ন করে না।

দ্বিতীয়ত, এদের বুদ্ধি অপরিপক্ক ও প্রগলভতাপূর্ণ। আমরা আগেই দেখেছি যে, সকল সন্ত্রাসই মূলত রাজনৈতিক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। আর রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য অস্থিরতা ও অদুরদর্শিতা সন্ত্রাসী কর্মের অন্যতম কারণ। অপরিপক্ক বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার অভাব ও দূরদর্শিতার কমতির সাথে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার এ সকল সত্যান্বেষী ও ধার্মিক যুবককে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করেছিল।

খারিজী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তির কারণ :

১. জ্ঞানের অহঙ্কার :

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের এই ঘটনা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, জ্ঞানের অহঙ্কারই ছিল তাদের বিভ্রান্তির উৎস। আমরা এরূপ উগ্রতা ও সন্ত্রাসে লিপ্তদের দুটি বৈশিষ্টের দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ কথা উল্লেখ করেছেন: তারুণ্য এবং বুদ্ধির অপরিপক্কতা বা হটকারিতা। এ কারণে তারা ইসলাম বুঝার ক্ষেত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিজেদের বুঝকেই -এর আজীবনের সহচর ও দীন সম্পর্কে অধিক চূড়ান্ত মনে করত। রাসূলুল্লাহ জ্ঞানী সাহাবীগণের মতামতকে অবজ্ঞা করা বা তাদের পরামর্শ গ্রহণকে তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করত। তাদের বুঝের বাইরে মতপ্রকাশকারীদেরকে ঢালাওভাবে তারা অবজ্ঞা করত। এমনকি কাফির আখ্যায়িত করত।

উপর্যুক্ত বিভ্রান্তি থেকে তারা বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যেগুলির কারণে তারা তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ‘ইসলাম প্রতিষ্ঠার জিহাদ বলে মনে করে।

২. মুসলিমদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে কাফির আখ্যা দেয়া :

খারিজীদের বিদ্রোহ, উৎপত্তি ও বিকাশের প্রথম সূত্র ছিল, কুরআনুল কারীমের কিছু আয়াতের আলোকে আল্লাহর বিধানমত ফয়সালা না দেওয়া কুফুরি কাজ। এটিই ছিল খারিজীদের প্রথম মূলনীতি। তারা কুরআনের কিছু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে দাবি করে যে, মুসলিম পাপে লিপ্ত হলে সে কাফির বা ঈমান হারা হয়ে যায়। তাদের মতে ইসলামের যে কোন অনুশাসন ত্যাগ করাই কুফুরি। কাজেই যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো অনুশাসন লঙ্ঘন করে সে ঈমানহারা বা কাফিরে পরিণত হয়।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে কুরআন হাদীসের আলোকে স্পষ্টতই পাপ। যেমন, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার ইত্যাদি। খারিজীগণ শুধু এগুলিকেই কুফরী বলে গণ্য করেনি। উপরন্তু, তাদের মতের বিপরীত রাজনৈতিক কর্ম বা সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে 'পাপ' বলে গণ্য করেছে, এরপর তারা সেই পাপকে কুফরী বলে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে খারিজীগণের কাফির-কথনের মূল ভিত্তি 'পাপ' নয়, বরং 'রাজনৈতিক মতাদর্শ' তারা তাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এরূপ সকল মুসলিমকে কাফির বলে গণ্য করত।

৩. কাফিরকে ঢালাও ভাবে হত্যা করা বৈধ মনে করা :

কাউকে কাফির বলে গণ্য করা আর তাকে হত্যা করা কখনোই এক বিষয় নয়। কিন্তু খারিজীরা সাধারণ মুসলিমদেরকে কাফির বলেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা তাদেরকে ঢালাওভাবে হত্যা করার বৈধতা দাবি করেছে।

৪. রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ও ইমাম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা :

রাষ্ট্রের আনুগত্যের বাইরে যাওয়া কত বড় অপরাধ তা তারা কোন ভাবেই বুঝার চেষ্টা করত না; বরং তারা রাষ্ট্রদ্রোহীতাকে কখনো কখনো বৈধ কাজ মনে করত। খারিজীগণ রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদির কোনো গুরুত্ব স্বীকার করত না। পরবর্তীতে কেউ কেউ তাদেরকে রাষ্ট্র, ইমাম, বাইয়াত ইত্যাদির গুরুত্বের বিষয়ে বললে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে 'আমীর' বা ইমাম বলে 'বাইয়াত' করে নেয়। এভাবে তারা রাষ্ট্রীয় পরিভাষাগুলিকে 'দলের' ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ব্যাপারে তাদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়।

৫. জিহাদকে ব্যক্তিগত ফরয বলে গণ্য করে ইচ্ছামত জিহাদ ঘোষণা করা :

কুরআন-হাদীসে অগণিত স্থানে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং জিহাদের জন্য মহান পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কাফিরদের সাথে যুদ্ধ ছাড়াও মুসলিম-অমুসলিম সকলের মধ্যে 'সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করতে' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তির ফলে খারিজীগণ রাষ্ট্রীয় ফরয ও ব্যক্তিগত ফরযের মধ্যে কোনো পার্থক্য করত না। তারা জিহাদ ও 'আদেশ নিষেধ' বিষয়ক কুরআনী নির্দেশনার আলোকে প্রচার করে যে, জিহাদ ও আদেশ-নিষেধ ইসলামের রুকন ও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

(এ প্রবন্ধটি প্রফেসর ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-এর লেখ "ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ" গ্রন্থ থেকে সংকলিত ও সম্পাদক কর্তৃক পরিমার্জিত ও সম্পাদিত।)

কেন এই গোঁড়ামী ও চরমপন্থা?

لماذا هذا التعصب والتطرف؟

বিভিন্ন কারণে সমাজে গোঁড়ামী ও চরমপন্থার উদ্ভব হয়ে থাকে। নিম্নে গোঁড়ামী ও চরমপন্থার কয়েকটি কারণ আলোচনা করা হলো :

১। দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব :

গোঁড়ামীর মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম কারণ হলো দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। দ্বীনি প্রজ্ঞার স্বল্পতা, দ্বীনের রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থতা এবং তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও স্পিরিট অনুধাবনে অক্ষমতা। এসব কথার মাধ্যমে দ্বীন সম্বন্ধে পূর্ণ অজ্ঞতার কথা বুঝানো হচ্ছে না। কারণ পূর্ণ অজ্ঞতা সম্ভবতঃ বাড়াবাড়ি ও উগ্রপন্থার দিকে নিয়ে যায় না বরং তার উল্টো দিকেই নিয়ে যায়। অর্থাৎ তা নৈতিক অবক্ষয় ও স্বেচ্ছাচারিতার দিকেই ধাবিত করে। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানের অভাব বলতে অপরিপক্ব জ্ঞান বুঝানো হচ্ছে। যে 'অপরিপক্ব জ্ঞান' তাকে 'জ্ঞানী' বলে ধারণা দেয় অথচ সে অনেক কিছুই জানে না। সে এখান-সেখান হতে কিছু জ্ঞানার্জন করে-যা পরস্পর সম্পর্কহীন ও শৃঙ্খলাহীন। অর্থাৎ সে ভাসাভাসা জ্ঞানের অধিকারী হয় ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। সে দ্বীনের একক বিষয়গুলোকে 'মুহকামাত' তথা সন্দেহহীন বিষয়গুলোর সাথে, আর অনির্ভরযোগ্য বিষয়গুলোকে নির্ভরযোগ্য বিষয়ের সাথে তুলনা করতে পারে না। সে পরস্পরবিরোধী দলিলসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও তারজীহ তথা অগ্রাধিকার দানের কৌশল রপ্ত করতে পারে না। কোন্ দলিল অগ্রাধিকার যোগ্য আর কোন্ বিষয় প্রাধান্যপ্রাপ্তির যোগ্য তা উপলব্ধি করতে পারে না।[১]

এভাবে শরীয়তের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য না বুঝে ইচ্ছামত অভিমত গ্রহণ করে। এদের প্রতি হাদীসে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে :

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا-

"আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের নিকট থেকে ইল্‌মকে ছিনিয়ে নিবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞানকে উঠিয়ে নিবেন। ফলে কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, আল সাহওাতুল ইসলামিয়া বাইনাল জুহুদি ওয়াত তাতাররুফ, কায়রো: দারুস সাহওয়া , ১৪১২ হিজরী, পৃ. ৩৩-৩৬

না। তখন মানুষ অজ্ঞদেরকে নেতা বানাবে। মানুষ তাদের কাছে দ্বীনের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা না জেনে ফতুয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা বিভ্রান্ত হবে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করবে"।[১]

মূলতঃ অহংকারযুক্ত অল্পবিদ্যা পূর্ণ অজ্ঞতার চেয়ে অত্যধিক বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। কারণ অল্পবিদ্যার অধিকারী ব্যক্তি কষ্মিনকালেও তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেনা। শুধু তাই নয়, তারা তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে। এ মর্মে হাফেজ ইবনু কাসীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) (৭০১-৭৭৪ হিজরী,) বলেছেন :

يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم ، إن هذا الأمر يرضى رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر الموبقات والعظائم والخطيئات وأنه مما زينه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود-

'তাদের অজ্ঞতা ও বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতার কারনে তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের এ কাজে আসমান-জমিনের প্রতিপালক তুষ্ট হবেন। কিন্তু তারা জানে না যে, এটা কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অধিক ধ্বংসাত্মক, মারাত্মক ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। বহিস্কৃত ও বিতাড়িত ইবলিস এ কাজে অনুপ্রাণিত করে'।[২]

২. দ্বীন সম্পর্কে বিকৃত ও ভুল ধারণা :

গোঁড়ামী ও চরমপন্থা উদ্ভবের আরেকটি অন্যতম কারণ হচ্ছে শরীয়তের বিধিবিধানসমূহ ভুল বা বেঠিকভাবে অনুধাবন করা। ইসলাম অনুধাবনের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, ইসলামী শরীয়ত ও রিসালাতের মূল উদ্দেশ্য অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকার কারণে দ্বীনের অনেক বিধান সম্পর্কে তারা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। এ সম্পর্কে শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আল-বদর বলেন :

ومن سوء الفهم في الدين . ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي رضى الله عنه و قاتلوه . فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا . مخالفا لفهم الصحابة رضي الله عنهم . و لهذا لما ناظر ابن عباس فرجع من رجع منهم

১. সহীহ আল-বুখারী: ১০০; সহীহ মুসলিম: ৬৯৭১

২. ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, কায়রো: দারুর রাইয়ান, ১৪০৮ হি/১৯৮৮ খৃ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৯৭

'দ্বীন সম্পর্কে ভুল ধারণা যা খারিজীরা পোষণ করতো। যারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দল থেকে বের হয়ে গিয়েছিল এবং তাকে হত্যা করেছিল। তারা শরীয়তের দলিলসমূহকে ভ্রান্তভাবে বুঝতো, যা ছিল সাহাবায়ে কিরামের বুঝের সম্পুর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের সাথে আলোচনা করে যখন তাদের কাছে দলিলসমূহের সঠিক বুঝ উপস্থাপন করলেন তখন তাদের মধ্যে যারা ফিরে আসার তারা ফিরে আসলো'।[১]

৩. ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাবঃ

চরমপন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তিগত শুধু ধর্মীয় জ্ঞানেই অপরিপক্ক নয়; ইতিহাস-ঐতিহ্য, বাস্তবতা, জীবন ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহর সুন্নাত তথা নিয়ম সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান অপরিপক্ক। ফলে তাদের কাউকে কাউকে দেখা যায় যে, এমনকিছু পেতে চায় যা পাওয়া সম্ভব নয়। এমন কিছু ইচ্ছা করে যা হতে পারে না। এমন অলীক কল্পনা করে যা অবাস্তব। আর বাস্তবতাকে বোঝে অপ্রকৃতভাবে এবং তারা তাদের মস্তিষ্কে বিদ্যমান ধারণামতে সব কিছুর ব্যাখ্যা দেয়। যার কোন ভিত্তি নেই আল্লাহর সৃষ্টিতে, আল্লাহর বিধানে এবং তাঁর শরীয়তের বিধি-বিধানে।

চরমপন্থী ও গোঁড়া ব্যক্তিরা গোটা সমাজ পাল্টে দিতে চায়। তারা চায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা-চেতনা, নিয়ম-নীতি, চরিত্র ও বিধান ইত্যাদি কাল্পনিক ও অবাস্তব নিয়ম-নীতির মাধ্যমে পরিবর্তন করে দিতে। পরিবর্তন চায় এমন দুঃসাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে যাতে মূল্যবান প্রাণের কুরবানী বেশী হয়। তারা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। এ মৃত্যু তাদের হোক বা অন্য কারো হোক। তারা ফলাফলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না সেটা যা-ই হোক না কেন।

৪. বিকৃত চিন্তাধারার থেকে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যের ব্যাখ্যা :

গোঁড়া ও চরমপন্থীরা কুরআন-হাদীসের বক্তব্যের গভীরে প্রবেশ করে না। তারা-এর অর্থ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য না বুঝে আক্ষরিক ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে। যেমন নিম্নোক্ত নাস-এর প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ইমাম মালিক, বুখারী, মুসলিম ও সুনান গ্রন্থের লেখকগণ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের দেশে ও শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

---

১. আব্দুল মুহসিন ইবনু হামদ আল-আব্বাদ আল-বদর, বিআইয়ে আকলিন ওয়াদ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান (রিয়াদঃ দারুল মুগনী লিন নাশর ওয়াত তাওযি ১ম প্রকাশ, ২০০৩/১৪২৪ হি, পৃ. ৬

এ নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন কাফিররা কুরআনের অসম্মান করবে বা তার কোন ক্ষতি করবে এ ভয়ে। যদি কখনো মুসলমানরা এ জাতীয় ভয় হতে মুক্ত হন তখন তারা তাদের সফরের সময় অমুসলিম দেশে নিজের সাথে আল-কুরআন নির্দ্বিধায় নিয়ে যেতে পারেন। এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্ব আজকে একমত, কারোরই কোন দ্বিমত নেই। বরং বিভিন্ন ধর্মালম্বীরা বর্তমান যুগে তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সহজ ভাবে পৌছাবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। যাতে মানুষ তাদের দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে অবগত হতে পারে, আর তাদের ধর্মের দাওয়াত অন্যের কাছে পৌঁছে যায়। মুসলমানরাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করছে-যে দেশের মানুষের ভাষা আরবী নয় সেদেশের স্থানীয় ভাষায় আল-কুরআন অনুবাদ করে পৌছানোর মাধ্যমে। সুতরাং শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করা আক্ষরিক অর্থে সর্বযুগ ও সকল অবস্থার জন্য প্রযোজ্য নয়।

৫. সুস্পষ্ট দলিল বাদ দিয়ে দ্ব্যর্থবোধক দলিলের অনুসরণ করা

গোঁড়ামী ও চরমপন্থ্বর আরেকটি কারণ হচ্ছে মুহকাম বা সুস্পষ্ট দলিল বাদ দিয়ে 'মুতাশাবিহ' বা দ্ব্যর্থবোধক দলিলের অনুসরণ করা।[১]

বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ করে না। যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান তারাই এমন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾

"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহকাম' এগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ'। যাদের অন্তরে সত্য-লঙ্ঘন করার প্রবণতা রয়েছে তারাই 'মুতাশাবিহ' আয়াতগুলির অনুসরণ করে ফিতনা বিস্তার ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে"।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে হাদীসে এসেছে :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية فقال:« إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ ».

১. উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, পৃ. ৮৬-৮৭
২. সূরা আলে ইমরান : ৭

"আয়শা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন- যখন তোমরা কোন মানুষকে দ্ব্যর্থবোধক আয়াতের অনুসরণ করতে দেখবে তখন জানবে এদের কথাই আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে।[১] চরমপন্থীরা সাধারণত মুতাশাবিহ দলিলের অনুসরণ করে চলে। তারা এসব দলিল দ্বারা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য সফল করতে সচেষ্ট হয়। তারা বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণেও মুতাশাবিহ দলিলের উপরে নির্ভর করে। ফলে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের মূল্যায়নে, তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে, মুমিন বা কাফির প্রমাণে মারাত্মক ভ্রান্তিতে উপনীত হয়।[২]

সুতরাং কুরআন-হাদীস ভালভাবে অনুধাবন না করলে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

৬. চরমপন্থার বেড়াজালে ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা

ইসলাম প্রচারে স্বাধীনতা না থাকা বা ইসলামী দাওয়াতদানে প্রতিবন্ধকতা চরমপন্থা উৎপত্তির আরেকটি কারণ।[৩]

ইসলাম শুধু ব্যক্তির জন্য নয় বরং সমষ্টির জন্য। একক ব্যক্তির বদলে সমাজের সকলকে বাঁচার প্রতি আহ্বান করে। পরস্পরের সহযোগিতা ও সৎকাজের আদেশ শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয় বরং একটি অপরিহার্য শর্ত। দাওয়াতী ক্ষেত্রে সামষ্টিক কাজ বাধ্যতামূলক। কাজেই ইসলাম বিরোধী শক্তি যখন ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী তৎপরতাকে নস্যাতের পাঁয়তারা করে, ইসলাম প্রচারের শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডকে বাধাগ্রস্ত করে তখন ধর্মপ্রাণ মুসলিম শক্তিও সহিংসতাকে সহিংসতা দিয়েই মোকাবিলা করার দিকে পা বাড়াতে পারে। উক্ত কারণে মুসলমানদেরকে সুষ্ঠু ও স্বাধীন পরিবেশে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। অন্যথায় এ প্রতিবন্ধকতা গোপন সহিংসতা বা চরমপন্থার জন্ম দিতে পারে।

---

১. সহীহ আল-বুখারী : ৪৫৪৭ ; সহীহ মুসলিম : ৬৯৪৬

২. ড. ইউসুফ আল-কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর মুহাম্মদ আখুঞ্জী (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫,পৃ. ৫৭-৫৮) উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, পৃ. ৮৭

৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন,২০০৫,পৃ. ৭৯

মুসলিম দেশগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, মার্কস্‌বাদ, লিবারেলিজম ইত্যাদি মতবাদের প্রবক্তারা যখন স্বাধীনভাবে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পায় এবং মুসলিম জনতা ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন চরমপন্থা জন্ম নেয়।[১]

৭. যথার্থ ধর্মীয় পরিবেশের অনুপস্থিতি

সমাজে বা দেশে ধর্মীয় পরিবেশ না থাকলে ধর্মপ্রাণ মানুষের মনে চরম আঘাত লাগে। ফলে তারা সমাজে ও রাষ্ট্রে ধর্মীয় পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। যার ফলশ্রুতিতে চরমপন্থা ও গোঁড়ামীর পথে কেউ কেউ যাওয়ার চিন্তা করতে পারে।

সুতরাং মুসলিম দেশে যখন ইসলামী পরিবেশের পরিবর্তে অনৈসলামী পরিবেশ গড়ে ওঠে, ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার বদলে ফ্যাসিবাদ, মার্কসবাদ, সেকুলারিজম, সোসালিজম ইত্যাদি লালন করা হয় তখন সেখানে গোঁড়ামী সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মুসলিম দেশের শাসকগণ যখন কুরআন-সুন্নাহর বিধানের বদলে মানবরচিত বিধানকে অগ্রাধিকার দেয়, ন্যায়নীতির পরিবর্তে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়, ধর্মীয় শাসনের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনকে প্রাধান্য দেয় তখন গোঁড়ামীর উত্থান ঘটে। কারণ ইসলামের বিরুদ্ধে সারাবিশ্ব ঐক্যবদ্ধ কিন্তু মুসলিম বিশ্ব ইসলামের ব্যাপারে উদাসীন। এমন বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হলেও মুসলিম শাসকগণ মুখে কুলুপ এঁটে নিশ্চুপ বসে থাকেন যা গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে উস্কে দেয়।[২]

৮. মুসলিম উম্মার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণ এবং গোপন ষড়যন্ত্র

প্রাচ্যের ও প্রাতিচ্যের, দক্ষিণের ও উত্তরের মুসলিম বিশ্বগুলো এবং তাদের পবিত্র স্থানগুলো ন্যাক্কারজনক হামলা ও আক্রমণের শিকার হচ্ছে এবং মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে কখনো প্রকাশ্য আবার কখনো গোপন যে সব যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে তার ফলেও চরমপন্থার উদ্ভব ঘটতে পারে।

---

১. আল্লামা ইউসুফ আল কারাযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলাম, অনুবাদক ড. মাহফুজুর রহমান, খায়রুন প্রাকাশনী, ২০০৪, পৃ. ১২৭-১৩০

২. ড. ইউসুফ আল-কারজাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তর মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫, পৃ. ৭২-৭৩; উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, পৃ., ১১৬-১১৯

৯. প্রবৃত্তির অনুসরণ

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার আরেকটি কারণ হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা।[১] আর মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে কুরআন-হাদীস ছেড়ে প্রবৃত্তির অনুসরণে লিপ্ত হয়। শাইখ আব্দুল মুহসিন বলেন :

فان للشيطان مدخلين على المسلمين ، ينفذ منهما إلى أغوائهم وأضلالهم، أحدهما : أنه إذا كان المسلم من أهل التفريط والمعاصى ، زين له المعاصى والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله ورسوله......... والثانى : أنه إذا كان المسلم من أهل الطاعة والعبادة ، زين لها الإفراط والغلو فى الدين ، ليفسد عليه دينه _

"মুসলমানদের বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে শয়তানের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, যা মানুষকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট করতে সে প্রয়োগ করে। প্রথমত: যদি মুসলিম ব্যক্তি চরমপন্থী ও অবাধ্য হয় তাহলে তার নিকট অবাধ্যতা ও প্রবৃত্তিকে শয়তান সুশোভিত করে উপস্থাপন করে যাতে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ থেকে দূরে থাকে। দ্বিতীয়ত: যদি মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত ও ইবাদতগুজার হয় তাহলে শয়তান গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে তার সামনে সুন্দর করে উপস্থাপন করে যাতে তার দ্বীন পালনে সে বিভ্রান্ত হয়"।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসেও এর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"জান্নাতকে অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা এবং জাহান্নামকে প্রবৃত্তি দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে"।[৩]

---

১. ফাতহী ইয়াকান, ইসলামী সমাজ বিপ্লবে যুবসমাজের ভূমিকা, অনুবাদ ড.মাহফুজুর রহমান ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪/১৪২৫ হি:, পৃ. ৩৩

২. আব্দুল মুহসিন ইবনু হামদ আল-আব্বাদ আল-বদর, বিআইয়ে আকলিন ওয়াদ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান (রিয়াদ: দারুল মুগনী লিন নাশর ওয়াত তাওযি ১ম প্রকাশ, ২০০৩/১৪২৪ হি:, পৃ. ৪

৩. সহীহ মুসলিম : ৭৩০৮

শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ আরো বলেন :

ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم أتباع الهوى وركوب رؤوسهم الفهم فى الدين ويزهدهم فى الرجوع إلى أهل العلم لئلا يبروهم ويرشدهم إلى الصواب وليبقوا فى غيهم وضلالهم-

শয়তানের ধোঁকা ও প্রতারণাই চূড়ান্ত গোঁড়া ও চরমপন্থিদের সামনে প্রবৃত্তির **অনুসরণ, ঔদ্ধত্যের শীর্ষে আরোহণ ও দ্বীন** সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা সুসজ্জিত **করে উপস্থাপন করে এবং বিজ্ঞ আলিমদের** থেকে বিমুখ করে রাখে, যাতে বিদ্বানরা তাদের সঠিক জ্ঞান ও সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে এবং বিজ্ঞ আলিমদের থেকে বিমুখ করে রাখে, যাতে বিদ্বানরা তাদের সঠিক জ্ঞান ও সুপথ প্রদর্শন করতে না পারে। আর তারা (চরমপন্থীরা) যেন তাদের সীমালঙ্ঘন ও ভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে।[১]

সুতরাং চরমপন্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ যে একটি অন্যতম কারণ তা বলাই বাহুল্য।

মহান আল্লাহ প্রবৃত্তির অনুসারীকে বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে বলেছেন :

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾

"আল্লাহর পথনির্দেশকে অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে?"[২]

তিনি আরো বলেছেন :

﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

"আপনি প্রবৃত্তি অনুসরণ করবেন না। কারণ তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে"।[৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন :

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

---

১. আব্দুল মুহসিন ইবনু হামদ আল-আব্বাদ আল-বদর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৫
২. সূরা আল-কাসাস : ৫০
৩. সূরা সোয়াদ : ২৬

"যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং যারা সরল পথ থেকেও বিচ্যুত হয়েছে, তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না"।[১]

১০. শরীয়তের উপর ব্যক্তিপূজার প্রাধান্য

ব্যক্তিপূজার মাধ্যমেও গোঁড়ামীর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। অর্থ্যাৎ ব্যক্তির আনুগত্যে সীমালঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে গোঁড়ামীর উদ্ভব ঘটে। একারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

"তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না খ্রিষ্টানরা যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি কেবল আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল"।[২]

সমাজের একশ্রেণীর মানুষ নীতি ও আদর্শের চেয়ে ব্যক্তিপূজায় বেশি ব্যস্ত। আদর্শের চেয়ে ব্যক্তির সাথে তাদের সম্পর্ক হয় গভীর। এর ফলে মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এর মূল কারণ হচ্ছে তাকওয়া ও শরীয়তের চেয়ে ব্যক্তির প্রতি তাদের আসক্তি অত্যধিক। এর ফলে সমাজে বিভেদ, দলাদলি ও মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিপ্রেম ও প্রবৃত্তিপূজা আদর্শ ও মূল্যবোধের স্থান দখল করে। ফলশ্রুতিতে গোঁড়ামী ও চরমপন্থার সৃষ্টি হয়।[৩] উপরোক্ত কারণগুলো গোঁড়ামী ও চরমপন্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে কারণ হতে পারে; তবে কোন কোন কারণ চরমপন্থীদের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে বিবেচিত নাও হতে পারে। যারা চরমপন্থা ও উগ্রবাদকে দমন করতে চান তাদের এ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়ার জন্য সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে।

(অত্র লেখাটি মোঃ মুখলেছুর রহমান প্রণীত "গোঁড়ামী ও চরমপন্থা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ" বই থেকে সংগৃহীত।)

---

১. সূরা আল-মায়িদা : ৭৭
২. সহীহ আল-বুখারী: ৩৪৪৫
৩. ইসলামী সমাজ বিপ্লবে যুবসমাজের ভূমিকা, পৃ. ৩১-৩২

গোঁড়ামী ও চরমপন্থা প্রতিকারের উপায় বা সমাধানের পথ

طريقة مكافحة التطرف والتعصب

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার নিরসনে বা চিন্তাগত এ সমস্যার সমাধানে সর্বপ্রথম যা করণীয় তা হলো, সমস্যাসমূহ সঠিকভাবে চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে:

০১. চরমপন্থা চিহ্নিতকরণে বাড়াবাড়ি পরিহার

এ ব্যাপারে ড. ইউসুফ আল-কারযাভী বলেছেন :

"আমি মনে করি যারাই এ সমস্যা সামাধান করতে চায় তাদের প্রত্যেককে হুকুমদানে মধ্যপন্থা ও ইনসাফ অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় তারা নিজেরাই চরমপন্থার আলোচনায় এবং তার সমাধানে চরমপন্থার আশ্রয় নিবে। এ ব্যাপারে ইনসাফ অবলম্বনের প্রথম আলামতটি হলো কথিত চরমপন্থা চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে এবং একে ভয় করা ও এ সম্পর্কে ভয় সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি না করা। যেমন আমরা আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে তিলকে 'তাল' ও বিড়ালকে 'উট' বানিয়ে থাকি। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি খুবই ক্ষতিকর। কারণ তা বাস্তবতাকে বিকৃত করে আর পাল্লার মধ্যে হেরফের ঘটায় এবং কোন কিছুর প্রতি সঠিক দৃষ্টিদানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে তার পক্ষে বা বিপক্ষে হুকুম হয় জুলুমকারী ও ত্রুটিপূর্ণ"।[১]

অনেক সময় 'ধর্মীয় চরমপন্থা' এসেছে অনুরূপ এক বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, ধর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে। এক্ষেত্রে প্রথমোক্ত বাড়াবাড়িকারীদেরকে আলোচনার রাস্তা করে দিতে হবে। তাদের মধ্যপন্থা ও ইনসাফ অবলম্বন করতে হবে। তাহলে দ্বিতীয় চরমপন্থীরাও প্রত্যাগমন করবে চরমপন্থা হতে। ফলে সকলে একত্রে মিলিত হতে ও বসবাস করতে পারবে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো ধর্মের সীমালঙ্ঘনকারী ও ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীরা যত না নিন্দা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি নিন্দা ও প্রতিরোধের শিকার হচ্ছে ধর্মীয় চরমপন্থীরা। অথচ উচিত ছিল উভয় ধরনের চরমপন্থীদের নিন্দিত হওয়া।

০২. কোমল কণ্ঠে উপদেশ দেয়া

গোঁড়ামী ও চরমপন্থী লোকদেরকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিহার করার জন্য কোমল ব্যবহারের মাধ্যমে উপদেশ দিতে হবে। চড়া ও কড়া ভাষায় কথা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা শিখিয়ে দিয়েছেন :

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী : উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলাম, অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾

"দুর্দম অহংকারী ফিরাউনকে তোমাদের দু'জন (মুসা ও হারুন) নরম ভাষায় কথা বলো। আশা করা যায় সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা আল্লাহকে ভয় করবে"।[১]

০৩. কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ

কথা-বার্তা, আচার-আচরণে কৌশলী ও সহানুভূতিশীল হতে হবে, বিশেষতঃ যুবকদের সাথে। মনে রাখতে হবে গোঁড়ামী ও চরমপন্থা নেতিবাচক দিকসমূহ জনসম্মুখে তুলে ধরতে হবে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার সাথে। চরমপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি নিয়ে আন্তরিকতার সাথে তাদের মনোভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন :

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

"বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও উত্তম নসিহতের মধ্যমে তোমার রবের দিকে আহ্বান কর"।[২]

০৪. যুক্তি দিয়ে বুঝানো

গোঁড়া ও চরমপন্থী লোকেরা সহজে অন্যের কথা বুঝাতে চায় না, তাই তাদেরকে যুক্তি দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। এতে গোঁড়ামী কেটে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"এবং তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় যুক্তি প্রয়োগ করে বিতর্ক করো"।[৩]

০৫. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সবার জন্য খোলা রাখতে হবে

আমাদেরকে সেই পুরাতন পন্থা পরিহার করতে হবে-যা নিয়ে সর্বদা নিরাপত্তারক্ষী ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ভাবে। অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা পরিহার করতে হবে এবং স্বাধীনতার পরিবেশ বজায় রেখে সমালোচনাকে স্বাগত জানাতে হবে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নসীহত ও উপদেশ দানের স্পিরিট পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। উমর রাদিআল্লাহু আনহু যেমন বলেছিলেন তেমনি আমাদেরকেও বলতে হবে– "উপদেশদাতার প্রতি চিরদিন অভিনন্দন। তাকে

---

১. সুরা ত্বহা: ৪৪
২. সূরা আন্-নাহল: ১২৫
৩. সূরা আন্-নাহল: ১২৫

সকাল-বিকাল অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তা'আলা সে লোককে মেহেরবানী করুন যিনি আমাকে আমার নিজের দোষ-ক্রুটি সম্বন্ধে অবগত করেন"। উমর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁকে উপদেশ ও পরামর্শদাতাকে উৎসাহিত করতেন। তার যেকোন কর্মে সমালোচককে স্বাগত জানাতেন।

০৬. জনগণের আক্বীদা-বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি শাসকদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন

প্রত্যেক জাতিরই তার নিজের আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী শাসিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। তাদের এ অধিকারও আছে যে, তাদের আইন-কানুন ও সংবিধানে তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটবে এবং শিক্ষানীতিও সে অনুযায়ী প্রণীত হবে। আর সংস্কৃতি ও প্রচারমাধ্যমগুলো আক্বীদা-বিশ্বাসের সাহায্যে এবং তার প্রচার-পোপাগাণ্ডায় ব্যবহৃত হবে। মুসলিম শাসকদের তার প্রজা সাধারণের আক্বীদা-বিশ্বাস, চেতনা ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও আস্থাশীল হতে হবে। এতে চরমপন্থা সৃষ্টির আশঙ্কা অনেকাংশে কমবে।

০৭. সামাজিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ

প্রথমত: উগ্রপন্থা ও চরমপন্থা প্রতিকারে সমাজের ভূমিকা সর্বাধিক। কেননা সমাজ অনৈতিক ও ধর্মহীন অপতৎপরতা প্রতিরোধে অগ্রগামী হলে চরমপন্থার উদ্ভব হতে পারে না, হলেও তা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। তাই সমাজকেই গোঁড়ামী ও চরমপন্থা প্রতিকারে ভূমিকা পালন করতে হবে। তাছাড়া সমাজে পারস্পরিক বিরোধিতা, অস্থিতিশীলতা, মুসলমানদের ইসলাম বিমুখতা ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে চরমপন্থা দৃষ্টি ও প্রসারে।[১] এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাথমিক পদক্ষেপ হচ্ছে ইসলামের প্রতি আন্তরিক, সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট সামাজিক অবস্থান গঠন ও সার্বিক ইসলামী পবিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া।

দ্বিতীয়ত : একজনের দোষ অন্য একজনের উপর চাপানোর প্রবণতা পরিহার করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

"কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না"।[২]

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯

২. সূরা আল-আন'আম : ১৬৪

তেমনি সংখ্যালঘুর দোষ সংখ্যাগুরুর উপর চাপিয়ে দেয়া অনুচিত। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড বিচার করা যায় না বরং তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও আচরণের আলোকেই মূল্যায়ন করতে হবে। সুতরাং যার অসৎ কর্মের চেয়ে সৎ কর্ম বেশি সে-ই সৎ ও ভাল।

তৃতীয়ত : আচরণে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। সমাজের দায়িত্বশীলদের কথাবার্তা, আচার-আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখা, সুবিবেচক ও উদার হওয়া আবশ্যক। সত্য ও প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করে উপস্থাপন করলে বিচারব্যবস্থা হয় দোদুল্যমান, সুচিন্তা হয় কলুষিত।[১]

০৮. বুদ্ধিবৃত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ

বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও চরমপন্থার প্রতিকার করতে হবে। চরমপন্থী ও গোঁড়ামী চিন্তাধারার উৎস যেহেতু মেধা ও মনন, তাই তা উৎখাতে মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। মনস্তাত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল অবলম্বন করে অত্যন্ত সতর্কতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে দমন করতে হবে। চরমপন্থা প্রতিরোধে চরমপন্থা, গোঁড়ামী মোকাবিলায় গোঁড়ামী, সন্ত্রাসের মোকাবিলায় সন্ত্রাস, অপকর্মের প্রতিরোধে অপকর্ম ও মন্দের প্রতিবধান মন্দ দ্বারা কিংবা নিছক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে করার চিন্তা সঠিক নয়। এতে সাময়িক সাফল্য অর্জিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। পরিণতিতে তা পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়।

এক্ষেত্রে দেশে ও সমাজে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে জনগণ বিভিন্ন সমস্যায় বিজ্ঞ আলিম, জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ পায়। শাইখ আব্দুল মুহসিন বলেছেন :

و ان طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم كما حصل رجوع ألفين من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما

"চরমপন্থার ফিতনা থেকে শান্তিলাভের পদ্ধতি হলো আলিমদের দিকে প্রত্যাবর্তন। যেমন ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর সাথে আলোচনার পরে খারিজীদের ২০০০ লোক বিভ্রান্তিমুক্ত হয়ে সঠিক পথে ফিরে আসে"।[২]

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামী পুনর্জাগরণ: সমস্যা ও সম্ভাবনা, রূপান্তরঃ মুহাম্মদ সানাউল্লাহ আখুঞ্জী, আহসান পাবলিকেশন, ২০০৫/১৪২৬ হিঃ, পৃ. ৮৫-৮৬

২. আবদুল মুহসিন ইবনু হামদ আল-আব্বাদ আল-বদর, বিআইয়ে আকলিন ওয়া দ্বীনিন ইয়াকুনুত তাফজীর ওয়াত তাদমীর জিহাদান (রিয়াদ: দারুল মুগনী লিন নাশর ওয়াত তাওযি, ১ম প্রকাশ, ২০০৩/১৪২৪ হিঃ), পৃ. ১৫

০৯. সুশাসন ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা

চরমপন্থাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে প্রতিহত করতে দেশের শাসকদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশে সুশাসন চালু ও অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশ থেকে দুর্নীতি ও অস্থিতিশীলতা দূর করতে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানে সক্রিয় হতে হবে। ধর্মে সীমালঙ্ঘনকারী ও ধর্ম নিয়ে পরিহাসকারীদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। সকল নাগরিককে নিজ ধর্ম-কর্ম পালনের অধিকার, সুযোগ ও স্বাধীনতা সমানভাবে দিতে হবে।[১]

১০. ইসলামের নির্ভুল শিক্ষাদানের জন্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠা

ইসলামের স্বরূপ তুলে ধরার জন্য শক্তিশালী ইসলামী মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। জ্ঞানী ও মৌলিক চিন্তার অধিকারী আলিমদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দান ও গাইড করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ এ সকল বিকৃত ও চরমপন্থী ধারণাগুলো মৌলিক চিন্তার অনুপস্থিতির কারণেই ঘটে থাকে। আর চিন্তার শূন্যতা থাকলেও মানুষের মনে গোঁড়ামী সৃষ্টি হয়।[২]

১১. অভিযোগ উত্থাপনে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন

বিশেষ কোন ধর্ম, জাতি বা গোষ্ঠীর প্রতি গোঁড়ামী ও চরমপন্থার অভিযোগ উত্থাপন করা সঙ্গত হবে না। এতে চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি বাড়বে বৈ কমবে না। চরমপন্থা ও গোঁড়ামী মন্দ ও নিন্দনীয় তা যে ধর্মের লোকই করুক না কেন- এমন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে হবে।

১২. যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন

প্রথমে আমাদের যুবক ভাইদের দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করে দিতে হবে তাহলে তরা যথাযথভাবে অন্তঃদৃষ্টি দিয়ে এবং দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের দ্বীনকে বুঝে নিতে পারবে।

১৩. শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বাধা দান

গোঁড়ামী ও চরমপন্থাকে প্রথমে সাধারণভাবে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে, ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

---

১. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, উপেক্ষা ও উগ্রতার বেড়াজালে ইসলামী জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪৩

২. العالمية সংখ্যা :১৮২, কুয়েত, জুন ২০০৫, পৃ. ৩২

وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا

"দুষ্কৃতিকারীর হাত ধরো এবং তাকে সত্যের দিকে চালিত করো"।[১]

এছাড়া নিম্নোক্ত হাদীসেও শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

"তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি কোন অন্যায়-দুষ্কৃতি কাজ হতে দেখবে তার উচিত হাত দিয়ে শক্তিপ্রয়োগ করে তা পাল্টে দেয়া। যদি তা না পারে তবে মুখ দিয়ে ফিরাবে। যদি তা-ও না পারে তবে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করবে। আর এটাই ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা"।[২]

১৪. আইন সম্মতভাবে প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ

গোঁড়ামী ও চরমপন্থার ফলে অস্বাভাবিক অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হত্যাকাণ্ড, রক্তপাত প্রকৃতি অপকর্ম বিস্তৃতি লাভ করলে তা প্রতিরোধ করার জন্য ইসলাম প্রশাসনিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। তা-ও আবার এককভাবে নিজের হাতে আইন তুলে নয়। বরং রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাগবে। বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যাবে না। এতে দেশে আরো একটি গৃহযুদ্ধ লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ বন্ধের স্বাভাবিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾

"বিশৃঙ্খলা সমূলে বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করে যাও"।[৩]

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾

"কেননা বিশৃঙ্খলা হত্যার চাইতেও জঘন্য অপরাধ"।[৪]

এতে সন্ত্রাস, হত্যা, অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে :

﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

---

১. সুনান আবূ দাউদ : ৪৩৩৮
২. সহীহ মুসলিম : ১৮৬
৩. সূরা আল-আনফাল: ৩৯
৪. সূরা আল-বাক্বারাহ্: ১৯১

"তোমরা যদি (বিশৃঙ্খলা, সন্ত্রাস ইত্যাদি) দূর করতে যুদ্ধ না করো তাহলে পৃথিবীতে ভয়াবহ অরাজকতা ও বিপর্যয় দেখা দিবে"।[১]

এখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। অন্যথায় সন্ত্রাস, হত্যা, বোমা আক্রমণ বন্ধ ও নির্মূল করা যাবে না।

১৫. রাষ্ট্রীয়ভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান

নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া কর্তব্য। একদা কতিপয় বেদুইন মুনাফিক মুসলমানের ছদ্মবেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসলো। তারা ছিল রোগ-শোকে, অর্ধাহার-অনাহারে জরাজীর্ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা স্বরূপ তাদেরকে উটের পাল দেখিয়ে দিলেন এবং সেখানে গিয়ে উটের দুধ পান করতে লাগলো। কিছু দিনের মধ্যে তারা সুস্বাস্থ্য ফিরে পেলো এবং উটগুলো ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য উটের রাখালকে হত্যা করে ফেললো। উক্ত খবর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌঁছলে তাঁর নির্দেশে সাহাবীরা তাদেরকে বন্দী করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সন্ত্রাসের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন।[২]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন : 'বিপর্যয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীর মতই। অর্থাৎ যে বিশৃঙ্খলা করবে সে আক্রমণকারীর শাস্তি পাবে। তার শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।'

(অত্র লেখাটি মোঃ মুখলেছুর রহমান প্রণীত "গোড়ামী ও চরমপন্থা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ" বই থেকে সংগৃহীত।)

---

১. সূরা আল-আনফাল: ৭৩
২. সুনান আবূ দাউদ ও সহীহ আল-বুখারী

জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা জিহাদ নয়

الإرهاب والتطرف ليس بجهاد

জিহাদ ইসলামের একটি মৌলিক পরিভাষা। জিহাদ ইবাদাত। তাই জিহাদকে প্রকৃত অর্থ থেকে বিকৃত অর্থে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অবৈধ। মানুষকে খুন করে, বোমাতঙ্ক সৃষ্টি করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মনগড়া ব্যাখ্যার সঙ্গে ইসলামী জিহাদের দূরতম সম্পর্ক নেই। বরং আদর্শিক মহানুভবতা, ক্ষমা, উদারতা ও সুনৈতিকতার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। তাই আংশিক বা খণ্ডিত ইসলাম এবং ইসলামের অপব্যাখ্যা থেকে মুসলমানদের সজাগ ও সচেতন থাকা দরকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধবন্দী ইসলামের দুশমন কাফিরদের হত্যা বা নির্যাতন করেননি। বরং ইসলামের শান্তির বাণী, মুসলমানদের সুন্দর আচরণ, মহানুভবতা, উত্তম ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে অমুসলিমরা স্বেচ্ছায় পবিত্র কালিমা পাঠ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছে।

সমাজের প্রতিটি ধর্মানুরাগী মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করাই ইসলাম ও মুসলমানদের শিক্ষা। সাময়িক উত্তেজনা বা সস্তা আবেগের বশবর্তী হয়ে চরমপন্থা গ্রহণ, অতি বাড়াবাড়ির কোন অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলাম মানুষকে ভালোবাসতে বলে, হত্যা করতে নয়। সুন্দর, প্রগতিশীল, বিজ্ঞানসম্মত ও শান্তির ধর্ম ইসলাম মানবজাতিকে বিভক্ত করতে আসেনি, ঐক্যবদ্ধ করতে এসেছে। অধিকার হরণ করতে আসেনি, অধিকার দিতে এসেছে। প্রকৃত মুসলমানদের আদর্শ হলো, স্নেহপ্রবণতা, কোমলতা, সারল্য, ধর্মপ্রাণতা ও ধর্মভীরুতা এবং কখনোই ধর্মান্ধতা নয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনে অমুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাদের ইজ্জত-আব্রু ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তার জন্য প্রহরীর দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, অমুসলিম জনগোষ্ঠীও মানুষ, তারাও আল্লাহর বান্দা। ইসলাম সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তারা সকলেই জানেন, ঐতিহাসিকভাবে যা সর্বজনবিদিত, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমাজের সকল মানুষের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠা ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রেরণা। বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর অব্যাহত জুলুম ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ মানবতা যখন ইসলামের শান্তিময় আদর্শের দিকে ছুটে আসছে তখন ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করার জন্য তারা তাদেরই লালিত পেইড এজেন্টের মাধ্যমে কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে চরমপন্থী দর্শন প্রচার করছে। তরুণদের একাংশকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতায় লাগাচ্ছে। আর তাকেই জঙ্গিবাদ হিসাবে প্রচার চালিয়ে ইসলামকে সন্ত্রাসবাদী ধর্ম বলে বদনাম করছে। অতঃপর সন্ত্রাস দমনের নামে বিশ্বব্যাপী নিরীহ মুসলমানদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে।

ইসলামের নামে জঙ্গিবাদের স্বরূপ:

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোনো গোত্রীয়, জাতীয় ও ধর্মীয় পরিচয় নেই। কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো জাতি বা কোনো ধর্মকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা সমর্থনীয় নয়। গুলশান ও শোলাকিয়ায় সন্ত্রাসী হামলা ইসলামের নামে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সঙ্গে এসব জঙ্গি ও তাদের কর্মকাণ্ডের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে ধর্মের নামে রয়েছে শান্তির সুবাস, যে ধর্মের নবীকে প্রেরণ করা হয়েছে জগতবাসীর জন্য শান্তি ও রহমত স্বরূপ, সে ধর্মের নামে এমন অপকাজ নিষিদ্ধ ও অমানবিক। কথিত জঙ্গিদের কোন কাজই ইসলামসম্মত নয়। তাদের কর্মকাণ্ডের বেনিফিসিয়ারি কারা? মদের বোতলে 'ইসলামী' লেবেল এঁটে দিলেই হারাম মদ কী হালাল হয়ে যায়? কোনো মদ্যপ 'আল্লাহু আকবার' বলে মদ পান করলে সেটাকে যেমন কেউ 'ইসলামী মদ' বলবে না, তেমনি কোনো সন্ত্রাসী ইসলামের নামে 'আল্লাহু আকবার' বলে মানুষ হত্যার মতো কাজ করলে, সেটাকে 'জিহাদ' ভাবার অবকাশ নেই।

সন্ত্রাস, জিহাদ ও যুদ্ধ কি এক?

যুদ্ধকে দুনিয়ার কোন ইতিহাসে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বলা হয়নি। কারণ যুদ্ধের ধরনের সাথে জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থার বৈরিতা রয়েছে। তাই জিহাদকেও কোনভাবে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ বলা যায় না এবং যাবে না। কারণ জিহাদ অধিকার, স্বাধীনতা ও আদর্শিক বিষয়। এটি শুধু শুধু বিশৃঙ্খলা ও আতঙ্ক সৃষ্টির নাম নয়। সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, বিনা কারণে হত্যা ও সমাজে ভীতি তৈরির নাম কখনোই জিহাদ নয়; বরং ইসলামের জিহাদ হচ্ছে অন্যায় আগ্রাসন ও সন্ত্রাস-নৈরাজ্য দমনের জন্য। জিহাদ মানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নয়। জিহাদ নিপীড়িত, অত্যাচারিত জাতিকে মুক্তির জন্য। অন্যায় প্রতিরোধের জন্য। ইসলামে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকার পরও মুসলিম নামধারী অনেকে ইসলামের মহান আদর্শকে উপেক্ষা করে, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে সন্ত্রাস ও আগ্রাসনের পথ বেছে নেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শিরকের পরে মানুষের প্রাণ হরণ কিংবা জীবননাশের চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ﴾

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না"।[১]

---

১. সূরা আন-নিসা: ২৯

আত্মহত্যা করা মহাপাপ। জিহাদের ময়দানে আহত হয়ে তীব্র যন্ত্রণায় কাতর জনৈক সৈনিক আত্মহত্যা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 'জাহান্নামী' বলে আখ্যায়িত করেন। কেননা তার শেষ আমলটি ছিল জাহান্নামীদের আমল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

'আল্লাহ অবশ্যই ফাসিক-ফাজিরদের মাধ্যমে এই দ্বীনকে সাহায্য করে থাকেন'।[১]

জিহাদ সম্পূর্ণ যুলুমমুক্ত আদর্শিক যুদ্ধ:

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا

'হে আমার বান্দা, আমি নিজের ওপর জুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও একে হারাম করেছি। অতএব তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না'।[২]

জুলুম অত্যাচার আল্লাহর জন্যও হারাম। অতএব যারা নিরপরাধ মানুষের ওপর জুলুম অত্যাচার করে তাদের কর্মকাণ্ডও কতটা হারাম অনুমেয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল"।[৩]

মানুষের প্রাণহানী ঘটানোকে যেখানে বলা হয়েছে পুরো মানবজাতিকে হত্যার সমতুল্য, সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকে গণ্য করা হয়েছে হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ হিসেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾

"আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর"।[৪]

---

১. সহীহ আল-বুখারী: ৩০৬২; সহীহ মুসলিম: ৩১৯
২. সহীহ মুসলিম: ৬৭৩৭
৩. সূরা আল-মায়িদা: ৩২
৪. সূরা আল-বাকারাহ: ১৯১

গুলশান-শোলাকিয়া হামলার মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রমাণিত হলো যে, শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচন ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা কমানোর ঢাকঢোল বাজালেই জঙ্গি সমস্যার সমাধান হবে না। আধুনিক শিক্ষিত উচ্চবিত্তরাও জঙ্গি হতে পারে। এবার আমাদের সন্দেহের তীর নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এক লাফে উচ্চবিত্ত পরিবারের দিকে ধাবিত। গুলশান ট্র্যাজেডিতে ইসলাম বিদ্বেষীদের চিন্তার স্রোতধারা পরিবর্তন হবে নিশ্চয়। ভুলে গেলে চলবে না, জঙ্গিবাদ একটি বিকৃত চিন্তাধারার নাম, তা যত মন্দই হোক এটি একদল মানুষের আবেগের সাথে জড়িত। সমাজের বিভিন্ন স্তরে জঙ্গিবাদের প্রচার এ চিন্তাধারার মাধ্যমেই হচ্ছে, কেবল প্রলোভনের মাধ্যমে নয়। কাজেই জঙ্গিবাদের মোকাবেলা করতে হবে আদর্শিকভাবে। ওদের আদর্শের অসারতা প্রমাণ করে সঠিক আদর্শ তুলে ধরতে হবে তরুণ প্রজন্মের সামনে, যাতে তারা বিভ্রান্ত না হয়। ধর্মীয় শিক্ষা সঙ্কুচিত না করে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে, যাতে ধর্মের নামে কেউ কোনো ধরনের বিভ্রান্ত ছড়াতে না পারে। উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা ভাত-কাপড়ের জন্য নয়, ধর্মের অপব্যাখ্যা ও মগজধোলাইয়ের কারণে বিপথগামী হচ্ছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইংলিশ মাধ্যমের শিক্ষার্থীদেরই জঙ্গিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা বেশি। সাধারণ ও মধ্যবিত্ত ছাড়িয়ে উচ্চবিত্তের ঘরে হানা দিয়েছে মূল্যবোধের অবক্ষয়। আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষা বা আধুনিক শিক্ষায় মানবিক ও সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয় না। বাণিজ্যিক বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়, সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা গুরুত্বহীন। শুধু কারিকুলাম ও সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রথম এক বছর নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া শিক্ষার্থীদের মানবিক, সামাজিক, নৈতিকতা বিষয়েই পড়ানো হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্রের কারণেই আজ বিভিন্ন নামে জঙ্গিবাদের উত্থান। তারা ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, সত্যিকার ইসলামপন্থি, ইসলাম প্রচারক ও ইসলামী দা'ওয়াহ ও তাবলীগের সাথে জড়িতদের বিতর্কিত করতে জঙ্গিবাদকে ব্যবহার করছে। তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছু বিভ্রান্ত মুসলিমকে বেছে নিয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে। এরা বুঝে হোক না বুঝে হোক তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে। অথচ এদের অনুধাবন করা উচিত ছিল ইসলাম কখনো বোমাবাজি, হত্যা, গুপ্তহত্যা, আত্মঘাতী হামলাসহ কোন ধরনের অরাজকতা সমর্থন করে না।

(মোহাম্মদ আবু নোমান প্রণীত ও ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত 'জিহাদ জঙ্গিবাদ নয়' শীর্ষক নিবন্ধ থেকে সংক্ষেপিত ও সংকলিত)

জঙ্গিবাদ নির্মূলে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

التعليم الإسلامي لقمع الإرهاب

ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে ইসলামী বিদ্যাপীঠগুলো থেকে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি বা তৈরীর কোনো নজির নেই। ইসলাম মানুষকে উগ্রতা নয়, বিনয় শেখায়। প্রাণহানি নয়, প্রাণরক্ষার তাগিদ দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾

"রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সঙ্গে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম"।[১]

ইসলামী শিক্ষায় যে যত বেশি সমৃদ্ধ সে তত বেশি উন্নত মানবীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত, অপরের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও যত্নবান এবং মানবদরদি ও মানবহিতৈষী। ইসলামবিরোধীরা ইসলামকে কলঙ্কিত করতে, ইসলাম প্রচারক ও সত্যিকার ইসলামপন্থীদের বিতর্কিত করতে ফাসাদ সৃষ্টি করছে। তারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কিছু বিপথগামী মুসলিম তরুণকে বেছে নিয়েছে। তাদের দিয়ে জঙ্গিবাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে, এসব মুসলিম তরুণ না বুঝেই তাদের ফাঁদে পা দিয়েছে।

১. ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে, তাদের জানা উচিত, মুসলিমের পরিচয় কী? মুসলিমের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।"[২]

২. ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পথ অনুসরণ করে যারা দেশে ফেতনা-ফাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, তারা স্পষ্টই ভ্রান্ত পথের অনুসারী। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এসব লোক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾

"তুমি অনুগ্রহ করো, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ, বিপর্যয় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনর্থ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।"[৩] ।

---

১. সূরা আল-ফুরকান : ৬৩

২. সহীহ আল-বুখারী : ৯

৩. সূরা আল-ক্বাসাস : ৭৭

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾

"দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর এতে বিপর্যয় ঘটাবে না।"[১]

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে কোনো রকম ফেতনা-ফাসাদ তথা অরাজকতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অশান্তি সৃষ্টি, নাশকতা, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, সংঘাত, হানাহানি, উগ্রতা, বর্বরতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও বোমাবাজি করে আতঙ্ক সৃষ্টি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাব ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য নয়; আবির্ভাব হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾

"তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে বাছাই করা হয়েছে, মানবতার কল্যাণের জন্য।"[২]

জনমনে আতঙ্ক বা ভীতি সৃষ্টি হতে পারে, ইসলাম এ ধরনের কোনো কর্ম বা আচরণ করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ».

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর না জুলুম করতে পারে, না তাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করতে পারে আর না তাকে হেয়প্রতিপন্ন করতে পারে। তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইশারা করে বলেন, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে, তাকওয়া এখানে। কেউ নিকৃষ্ট হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জীবন, ধনসম্পদ ও মানসম্মান প্রত্যেকের সম্মানের বস্তু। এর ওপর হস্তক্ষেপ করা হারাম।"[৩]

---

১. সূরা আল-আ'রাফ : ৫৬
২. সূরা আলে ইমরান : ১১০
৩. সহীহ মুসলিম : ৬৭০৬

মানবজীবনের নিরাপত্তার প্রতি ইসলাম যতটা গুরুত্ব দিয়েছে অন্য কোনো ধর্মে বা মতাদর্শে এর নজির নেই। ইসলাম হত্যাকাণ্ডকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। নিরপরাধ জনগণকে গুলি করে, বোমা মেরে, জবাই করে, অগ্নিসংযোগ করে হত্যা করা ইসলামের আদর্শ নয়। পবিত্র কুরআনে তাই একজন মানুষের হত্যাকে পুরো মানবজাতির হত্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾

"প্রাণহত্যা বা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষকে হত্যা করল; আর কেউ কারও প্রাণরক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সব মানুষের প্রাণরক্ষা করল।"[১]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

"যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলিমকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।"[২]

৬. ইসলামে শুধু মানুষের নিরাপত্তা নয়, রয়েছে সব প্রাণীর পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ

"একজন নারীকে বিড়ালের কারণে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করা হয়। কারণ সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি না খেয়ে মারা যায়।"[৩]

আবার একটি কুকুরের প্রাণ বাঁচানোর জন্য এক ব্যক্তি জান্নাতে যাবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ فَقَالَ

---

১. সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৩২
২. সূরা আন-নিসা : ৯৩
৩. সহীহ আল-বুখারী : ৩৪৮২

الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হল। তারপর একটি কূয়া দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। উপরে উঠে এসে সে দেখতে পেল একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এ কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কূয়ার মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবূল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বলল, হে আল্লাহর রাসূল! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রাণী মাত্রের সেবার মধ্যেই পুণ্য রয়েছে।"[১]

ইসলামের শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার এরই মধ্যে খুতবার মাধ্যমে সঠিক ইসলাম প্রচারের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জঙ্গিবাদের করাল গ্রাস থেকে সমাজকে বাঁচাতে চাইলে সমাজের তরুণদের ইসলামের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা এখন সময়ের দাবি। অন্যথায় তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল তাদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

"তোমরা দুনিয়াবাসীর ওপর দয়া করো, আসমানের বাসিন্দা তোমাদের ওপর দয়া করবেন।"[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

---

১. সহীহ আল-বুখারী : ৩২৮০

২. সুনান তিরমিযী : ১৯২৪

"পরস্পরের প্রতি ক্রোধ পোষণ করো না, হিংসা পোষণ করো না, শত্রুতা পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, বরং আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো।"[১]

উপর্যুক্ত ইসলামের মৌলিক নির্দেশনাসমূহ এ কথা প্রমাণ করে যে, এ সব শিক্ষা ও নির্দেশনা সমাজে চালু থাকলে কোনভাবেই সে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় হতে পারে না। কোনভাবেই সমাজের কোন একজন সভ্য বিপথগামী হয়ে উগ্রপন্থার অনুসারী হতে পারে না। তাই ইসলামী শিক্ষাই সন্ত্রাস দমনের জন্য অপরিহার্য দাবী।

(মাহমূদ হাসান প্রণীত এ লেখাটি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ও সম্পাদিত)

১. সহীহ আল-বুখারী : ৫৭১৮

প্রবন্ধসমূহের সারসংক্ষেপ ও প্রস্তাবনা

ملخص المقالات والاقتراحات

সারসংক্ষেপ

১. আমাদের অনেকে দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত মতভেদে বা কর্মপদ্ধতির ভিন্নতার কারণে একে অপরকে "ইসলামের শত্রু", "শত্রুদের দালাল", "ইহূদী-খৃষ্টানদের এজেন্ট", "নবী-ওলীগণের দুশমন", ইত্যাদি বলে পারস্পরিক ঘৃণা উস্কে দিচ্ছেন। এতে পারস্পরিক বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসবই ধর্মীয় উগ্রতা উস্কে দিচ্ছে। আমাদের এসব পরিহার করে উদারতার দিকে হাত বাড়াতে হবে।

২. সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠার ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। অন্যায় পরিবর্তনের আবেগ, দ্রুত ফল লাভের উদ্দীপনা বা অন্যায়ের প্রতি অপ্রতিরোধ্য ঘৃণা ইত্যাদির কারণে আবেগী হয়ে যারা সন্ত্রাস, সহিংসতা বা যুদ্ধ ও হত্যার পথ বেছে নিয়েছেন তারা ইসলামের কোনো কল্যাণ করতে পারেন নি। তাদের মাধ্যমে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৩. সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও এর চর্চা করা হারাম। এগুলো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসাবে বিবেচিত, যেখানেই তা ঘটুক আর যারাই তা ঘটাক। আর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে কিংবা এর উপকরণ যোগান দেয় অথবা অর্থায়ন বা সহযোগিতা করে, তারাও সন্ত্রাসী বলে পরিগণিত হবে, চাই তা একক ব্যক্তিই করুক কিংবা গোষ্ঠি অথবা রাষ্ট্র।

৪. যে সব কারণ সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেয় তা প্রতিহত করা ওয়াজিব। এসব কারণের পুরোভাগে রয়েছে বাড়াবাড়ি, চরমপন্থা ও গোঁড়ামী, ইসলামী শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, মানুষের রাজনৈতিক ও চিন্তার স্বাধীনতা হরণ, বঞ্চনা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়..... ।

৫. ইসলাম সব সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন ও ন্যায়সঙ্গত আচরণের নির্দেশ দেয়। কেননা চরমপন্থা ও বাড়াবাড়ির মধ্যে নিশ্চিত ধ্বংস নিহিত রয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই চরমপন্থা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে না।

৬. ইসলাম কর্তৃক অমুসলিম অযোদ্ধা নাগরিকদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া হারাম ঘোষণা ও তাদের জন্য আখেরাতে জান্নাত বঞ্চিত

হওয়ার মতো সাবধানবাণী উচ্চারণ করা দ্বারাও এটা স্পষ্ট যে, ইসলামে কোনো সন্ত্রাস কিংবা জঙ্গিবাদ নেই।

৭. ইসলামের নামে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড পরিচালনার পিছনে নানাবিধ কারণ অবশ্যই রয়েছে; তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, সঠিক ইসলামী 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের বিচ্যুতি। সুতরাং সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সঠিক ইসলামী 'আক্বীদাহ্ বিশ্বাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

৮. আহ্লুস সুন্নাহ তথা কুরআন-সুন্নাহর অনুসারীদের এটাই 'আকীদাহ বিশ্বাস যে, অন্যায়ের প্রতিবাদের নামে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, বিশেষ করে যাতে অযথা রক্তপাত ঘটে ও অশান্তি সৃষ্টি হয় তা কখনও বৈধ নয়।

৯. জঙ্গিবাদের সমস্যা সমূলে ধ্বংস করতে হলে ইসলামের নামে ভ্রান্ত 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাসীদের সংশোধন করতে হবে, নচেৎ একদিকে বন্ধ করলেও অপরদিকে নতুনভাবে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

১০. মুসলিম জঙ্গিবাদী বিপথগামীরা সাধারণত তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য ইসলামের পবিত্র পরিভাষা জিহাদ শব্দটি ব্যবহার করে থাকে। তারা জিহাদের নামেই তাদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে কিতালের প্রসঙ্গ তুলে ধরছে। অথচ এই জিহাদ ও কিতাল বৈধ কোন কর্তৃপক্ষ ছাড়া অর্থাৎ রাষ্ট্র বা সরকার ছাড়া কেউ ঘোষণা দিতে পারে না।

১১. ইসলাম তার অন্তর্নিহিত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল; তরবারি, জঙ্গিবাদ কিংবা সন্ত্রাসের মাধ্যমে নয়।

১২. ইসলামের দৃষ্টিতে জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণ হারাম। বোমাবাজি, মানুষ হত্যা, সন্ত্রাস, ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও আত্মঘাতী তৎপরতা ইত্যাদি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১৩. ইসলাম মানবতার ধর্ম, যার মূলভিত্তি সহনশীলতা, ভালোবাসা ও ক্ষমা। কোন ব্যক্তির বক্তব্য ইসলামের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে না। প্রাধান্য পাবে কেবল কুরআন ও হাদীস বিশেষত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কৃতকর্ম। এ থেকে আমরা দেখতে পাই ইসলামে চরমপন্থার কোনো স্থান নেই।

১৪. সুন্নাতের আলোকে সাহাবীগণের পন্থাই ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও সংস্কারের সঠিক পন্থা। সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, উগ্রতা এগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি নয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ কখনো ইসলামের কল্যাণ করেনি, যুগে যুগে দেশ ও জাতির ক্ষতিই করেছে।

১৫. পৃথিবীতে প্রচলিত বিদ্যমান কোন ধর্মই নৃসংশতা, অরাজকতা বা সন্ত্রাসকে সমর্থন করেনি। মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য মনোনিত একমাত্র ধর্ম ইসলামে এর বিন্দুমাত্র স্থান নেই। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, প্রিয়নবীর অমিয়বাণী আল-হাদীস এবং প্রতিথযশা বিদগ্ধ মনীষীদের অমূল্যবাণী সমূহে তা চিরভাস্বর হয়ে আছে।

১৬. ধর্মের নামে, ইসলামের নামে, দাওয়াতের নামে যারা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে বেছে নেয়, প্রকৃত ও পবিত্র ইসলাম এ থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে অবস্থিত। ইসলাম হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা ও ভালোবাসার ধর্ম। সন্ত্রাসীরা যে দিকে আহ্বান করছে, ইসলামের বাণী ও কুরআনের দাওয়াতের সাথে তা পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক।

১৭. ইসলাম কখনো সন্ত্রাসকে স্বীকৃতি দেয় না। বরং সর্বদা শান্তি, নিরাপত্তা ও পারষ্পরিক ভালবাসার দিকে আহ্বান করে। প্রকৃত মুসলিম তো সে, যার হাত এবং মুখের অনিষ্টতা থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।

১৮. জিহাদের সাথে সন্ত্রাসের কোন তুলনাই হতে পারেনা। যেমনভাবে তুলনা হতে পারেনা ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদের সাথে। অথবা বিবাহ ও ব্যভিচারের সাথে। যারা জিহাদ ও সন্ত্রাসকে এক করে দেখাতে চান তারা হয় জ্ঞানপাপী অথবা ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

১৯. ইসলাম শান্তির ধর্ম। আর এ শান্তি শুধু মুসলিমদের জন্যই নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এবং সকল সৃষ্টি জগতের জন্য। ইসলামই পৃথিবীতে একমাত্র ধর্ম যা আপামর জনসাধারণকে উপহার দিতে পারে একটি সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ, জাতি ও বিশ্ব।

২০. বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে একাকার করে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ মানবসভ্যতার শুরুতেই সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও শান্তি

প্রতিষ্ঠার মহান ব্রত নিয়ে ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা সন্ত্রাসের সাথে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে, এর দ্বারা ইসলামপ্রিয় জনগোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে তোলা হচ্ছে এবং বিশ্বে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

২১. কুরআন, হাদীস ও রাসূল (স.)-এর জীবনাদর্শ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, বরং চরম বিরোধী। শান্তিকে বিঘ্নিত করে এমন কোন কর্মকাণ্ডকে ইসলাম সমর্থন করে না, উপরন্তু বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের চিরন্তন নীতি।

২২. ইসলাম স্বভাবগত কারণেই কখনো সন্ত্রাসে বা বিশ্বশান্তি নষ্ট করে এমন কর্মে উৎসাহ, সমর্থন, অনুমোদন দেয় না। মুসলিম কখনো সন্ত্রাসী হতে পারে না। তাছাড়া গুটিকতক তথাকথিত মুসলিমের কর্ম বিচার করে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্ম ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামকে সন্ত্রাসের সাথে সম্পৃক্ত করা কখনোই উচিত নয়।

২৩. মানুষের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই ইসলামী ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় মানুষের মধ্যে বিভেদ, অনৈক্য, হিংসা-বিদ্বেষ, জিঘাংসা, হানাহানি, খুন খারাপী, হতাশা, বঞ্চনা, শোষণ, নিপীড়ন এবং সাধারণ ও স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে চির ধরায়, ইসলাম এ সকল বিষয়কে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে এবং হারাম ঘোষণা করেছে।

২৪. যেসব বইয়ে মানুষ খুনের প্রণোদনা ও কলাকৌশল পাওয়া যায় সেগুলোকে 'জঙ্গিবাদী বই' হিসেবে চিহ্নিত করা হোক, জিহাদী বই হিসেবে নয়। জঙ্গি আস্তানায় কুরআন-হাদীসের গ্রন্থও পাওয়া যেতে পারে, যেমন চোরের বাড়িতে জায়নামায পাওয়া যায়। তাই বলে কুরআন-হাদীসকে কিছুতেই জঙ্গিবাদী বই বলে অভিহিত করা যাবে না। এমনটি করা হলে সম্মানার্হ ধর্মীয় চিহ্নের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে।

২৫. যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে তাকে সেভাবে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। ইসলামে অবৈধ পন্থায় আত্মঘাতি হামলা চালানোর কোনই

সুযোগ নেই। নিঃসন্দেহে যারা আত্মঘাতি হামলায় অংশগ্রহণ করছে ইসলামকে না বুঝে বিকৃত মানসিকতার কারণে তা করছে।

২৬. কাফিররা যদি মুসলিম রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অথবা রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তির শান্তি চুক্তিতে প্রবেশ করে বসবাস করে, তবে তাদের শারীরিক ও আর্থিক নিরাপত্তার পরিপন্থী কোন কাজ করা যাবে না।

২৭. ইসলাম মানুষের কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নাযিলকৃত জীবন ব্যবস্থা। দুনিয়ায় শান্তি আর আখিরাতে কল্যাণের পথ বাতলে দেয়া এ ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

২৮. শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যদি প্রমাণিত হয় যে কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং ব্যক্তিগত বা সরকারী সম্পত্তি যেমন বাসস্থান, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, মেডিকেল, কারখানা, ব্রিজ-কালভার্ট, অস্ত্রাগার, পানি সংরক্ষণাগার, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয়ের উৎস যেমন পেট্রোলের পাইপ, বিমান বিধ্বংস করা বা ছিনতাই করা ইত্যাদি নাশকতামূলক ও শান্তি বিঘ্নিতকারী কোন সন্ত্রাসী কাজ করেছে, তবে তার শাস্তি হচ্ছে হত্যা। যা বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে।

২৯. ইসলাম শব্দের অর্থ যেমন শান্তি, এর মিশন-ভিশনও হলো মানবজীবনের দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা, তেমনি এর প্রচার-প্রসারের সকল আয়োজন উপকরণও শান্তিময়।

৩০. চরমপন্থা প্রতিরোধে চরমপন্থা, গোঁড়ামী মোকাবিলায় গোঁড়ামী, সন্ত্রাসের মোকাবিলায় সন্ত্রাস, অপকর্মের প্রতিরোধে অপকর্ম ও মন্দের প্রতিবিধান মন্দ দ্বারা কিংবা নিছক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে করার চিন্তা সঠিক নয়। এতে সাময়িক সাফল্য অর্জিত হলেও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। পরিণতিতে তা পূর্বের তুলনায় আরো বৃদ্ধি পায়।

৩১. জিহাদ ও সন্ত্রাসের মধ্যে সার্বিক বিবেচনায় সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। হাকীকত বা প্রকৃতি, তাৎপর্য, অর্থ ও ভাব, কারণ ও প্রকারভেদ, ফলাফল ও উদ্দেশ্য এবং শারঈ হুকুমের ক্ষেত্রে জিহাদ ও সন্ত্রাসবাদের মধ্যে ব্যপক পার্থক্য রয়েছে। জিহাদ বিধিবদ্ধ, শরী'আত সম্মত ইসলামের এক অমোঘ বিধান। আর সন্ত্রাস হচ্ছে ইসলামে নিন্দনীয়, ঘৃণিত, ধিকৃত ও নিষিদ্ধ।

৩২. জঙ্গিবাদ নিয়ে আলোচনায় শুধু ইসলাম ও মুসলিমদের দায়ী করাটা কোনক্রমেই বাস্তবসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ নয়। বরং এরূপ একচেটিয়াভাবে মুসলিমদের দায়ী করা জঙ্গিবাদ দমনের অনুসৃত পদ্ধতি হিসেবে বুমেরাং হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

৩৩. যেহেতু জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের সম্পৃক্ততাকে বড় করে দেখা হচ্ছে সেহেতু এক্ষেত্রে ইসলামিক স্কলারদের চিন্তাধারাকে উপেক্ষা করে বা তাদের প্রস্তাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে একদল নামধারী বুদ্ধিজীবির পরামর্শেই এ কঠিন সংকটের সমাধান করা যাবে বলে আশা করা যায় না।

৩৪. যারা বিপদগামী হয় তাদের কারণে কোন প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা নিছক বোকামি বা অজ্ঞতা বা শত্রুতা ছাড়া কিছু নয়। কোনো মানুষ যদি সন্ত্রাসী বা জঙ্গিবাদী কাজ করে তাহলে সেটা তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলেই গণ্য হবে। ব্যক্তির দোষের কারণে কোন প্রতিষ্ঠান ও দলকে দায়ী করা অনুচিত।

৩৫. গোঁড়ামীর মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে একটা অন্যতম কারণ হলো দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। দ্বীনি প্রজ্ঞার স্বল্পতা, দ্বীনের রহস্য উদঘাটনে ব্যর্থতা এবং তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও স্পিরিট অনুধাবনে অক্ষমতা।

৩৬. আলিমদের সাথে সম্পর্ক না রেখে ইসলামের নামে যারা মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং ইসলামের সামগ্রিক বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারা ইসলামের মূলধারা থেকে ক্রমশ বের হতে থাকবে। তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য এ কর্মনীতি মূলতঃ ইসলামের অনুসৃত সঠিক কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী। সুতরাং তারা মূলধারার উপর কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। বরং বিচ্যুতি ও পদস্খলন তাদের সামনে অনিবার্য।

৩৭. ইসলাম এমন একটি জীবন বিধান যার মধ্যে সকলের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকলে তা অর্জন করা সম্ভব নয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করা যাবে না।

৩৮. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোনো গোত্রীয়, জাতীয় ও ধর্মীয় পরিচয় নেই। কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য কোনো জাতি বা কোনো ধর্মকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা সমর্থনযোগ্য নয়।

৩৯. ইসলামী শিক্ষায় যে যত বেশি সমৃদ্ধ সে তত বেশি উন্নত মানবীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত, অপরের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও যত্নবান এবং মানবদরদি ও মানবহিতৈষী।

৪০. মানবজীবনের নিরাপত্তার প্রতি ইসলাম যতটা গুরুত্ব দিয়েছে অন্য কোনো ধর্মে বা মতাদর্শে এর নজির নেই। ইসলাম হত্যাকাণ্ডকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনে তাই একজন মানুষের হত্যাকে পুরো মানবজাতির হত্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৪১. রাষ্ট্রীয় আনুগত্য বা সরকারের আনুগত্য হতে বের হয়ে গিয়ে বিনা কারণে বিদ্রোহ করা রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে অযথা যুদ্ধ ঘোষণা করা প্রতিবাদের নামে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরদ্ধে অবরোধ, মিছিল ও বিশৃঙ্খলা হামলা ও বোমাবাজি করা সহীহ চিন্তাধারা ও সালাফী আক্বীদার পরিপন্থী এসব কর্ম খারিজী চিন্তাধারা থেকে অনুসৃত।

৪২. ইসলামের মহান আদর্শসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো প্রতিশোধ পরায়ন না হওয়া। আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করা প্রতিশোধের চিন্তা না করা। তবে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘিত হলে প্রতিবিধানের বৈধতাও রয়েছে।

৪৩. কারো ওপর জুলুম বা অত্যাচার করে আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রয়োজন কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট জ্ঞান। কোন বিষয়ের স্পষ্ট জ্ঞান ছাড়া সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা উচিত নয়।

৪৪. ইসলামে শান্তি ও নিরাপত্তা আছে, অশান্তি ও আশঙ্কা নেই। সহিষ্ণুতা রয়েছে, সহিংসতা নেই। সন্ধি ও আপোষকামিতা রয়েছে, বিরোধ ও বিবাদ নেই। ফলে ইসলাম মুসলিমদেরকে শান্তিপ্রিয় ও সহিষ্ণু হতে শিক্ষা দেয়। উগ্রতা ও উশৃঙ্খলতা শিক্ষা দেয়না।

৪৫. খারিজী চিন্তাধারা থেকেই মূলত ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের আবির্ভাব আর তারা এই চিন্তাধারাকে ইসলামে সহীহ চিন্তাধারা তথা সালাফী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত করার যেভাবেই চেষ্টা করুক না কেন সালাফী চিন্তাধারা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদকে কোনভাবেই সমর্থন করে না।

৪৬. হক্বপন্থীদের মানহাজ এই যে, গুনাহের কারণে কিবলার অনুসারী কোন ব্যক্তিকে কাফির আখ্যা দেয়া যায় না। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের কোন কিছুকে জেনেশুনে অস্বীকার করবে সে ধর্মত্যাগী ও কাফির।

৪৭. কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে গুনাহের কাজকে হালাল মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তি যেনা করে, ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে কিংবা মদ পান করে, তবুও তাকে কাফির বলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এসব হারাম কাজকে স্বেচ্ছায় বৈধ মনে না করবে।

৪৮. নিরানব্বই দিক থেকে যদি কোন মুসলিম ব্যক্তিকে কাফির আখ্যায়িত করার সম্ভাবনা থাকে, আর এক দিক থেকে যদি তার ঈমানদার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মুসলিমের উপর ভাল ধারণা পোষণ করার লক্ষ্যে তাকে ঈমানদার হিসাবেই গণ্য করা উচিত। তাকে কাফির বানানোর মাঝে ইসলামের কোন স্বার্থ বা কল্যাণ নেই।

৪৯. তাকফীরের বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ, আশঙ্কাজনক ও কঠিন। তাই তাকফীরকে খেল তামাশা হিসাবে গ্রহণ করা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার পরিপন্থী কাজ। শুধুমাত্র খারিজী সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারীরাই যুগে যুগে তাকফীরকে নিজেদের বিরোধীদের বিপক্ষে অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা এর মাধ্যমে নিজেদের হীন দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃত কথা হচ্ছে তাকফীর-এর মাঝে ইসলাম, মুসলিম ও মুসলিম উম্মাহর কোন ধরনের মাসলাহাত বা স্বার্থ নিহিত থাকতে পারে না। ইসলাম শাস্তিমূলকভাবে এ কাজটি অত্যন্ত সতর্কভাবে অনুমোদন দিয়েছে। আমরা যতদিন মাসআলাতুত তাকফীরের ভয়াবহতা ও জঘণ্যতা সম্পর্কে সচেতন না হব ততদিন আমরা এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সাধারণ ও হালকা বিষয় হিসাবে গ্রহণ কবব।

৫০. জঙ্গীবাদকে শুধুমাত্র ধর্মীয় উগ্রতা অথবা বিশেষভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নামে উগ্রতা ও সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত করা বাস্তবতার পরিপন্থী ও বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা-চেতনা। উদ্দেশ্যমূলকভাবে অথবা সুনির্দিষ্টভাবে কোন ধর্মীয় গোষ্ঠিকে জঙ্গীবাদী অথবা জঙ্গী অথবা সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করাও চরমপন্থার অনুসরণ। তাই জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস শব্দ দুটির প্রয়োগ ঢালাওভাবে না করে যারা এসব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্যই ব্যবহার করা ঈমান ও ইনসাফের দাবী।

প্রস্তাবনা

১. নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতঃ সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থার সঠিক কারণ নির্ণয় করে তার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. যেহেতু ইসলামের নামে জঙ্গিবাদের সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত, ফলে এর প্রতিরোধে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সম্পৃক্ত করাতে হবে। ইসলামের যে বিষয়গুলোর ভুল ব্যাখ্যার কারণে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি হয়, সেগুলির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য বিজ্ঞ আলিমদের নিকট থেকে ব্যাখ্যা নিয়ে তার বহুল প্রচার করতে হবে।

৩. সালফে সালিহীনের বুঝের আলোকে সঠিক ইল্‌ম শিক্ষা ও বিশুদ্ধ আক্বীদা অর্জন জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ থেকে মানুষকে ফিরে আনতে পারে। এ জন্যে শুধু ক্ষমতা প্রয়োগ করে নয়। সঠিক ইল্‌ম ও বিশুদ্ধ আক্বীদা ভিত্তিতে গণজাগরণ তৈরি করতে হবে।

৪. দলগত, পদ্ধতিগত বা মাসআলাগত মতভেদের কারণে কাউকে "ইসলামের শত্রু", "শত্রুদের দালাল" বা অনুরূপ কোনো বিশেষণে আখ্যায়িত করা বর্জন করতে হবে।

৫. নতুন প্রজন্মকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, বিশুদ্ধ জ্ঞান দিতে হবে এবং তাদেরকে সঠিক ইসলামী 'আক্বীদায় গড়ে তুলতে হবে।

৬. জনগণকে সাথে নিয়ে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থা দমন করতে হবে। তাই জনগণের ধর্ম-বিশ্বাস, তাদের লালিত মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে সম্মান করতে হবে। সকল মহলকে এ সবের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে এবং ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে।

৮. জঙ্গি আস্তানা হতে কোন বই উদ্ধার হলেই সেগুলোকে যাচাই-বাছাই ছাড়া 'জিহাদী বই' অভিধায় অভিহিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে। সন্ত্রাসী বইয়ের তালিকা নির্দিষ্ট করে জনসাধারণকে জানাতে হবে এবং সেগুলো নিষিদ্ধ করতে হবে। ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ সর্বত্র জিহাদ ও সন্ত্রাসকে একাকার করে উপস্থাপন করা বন্ধ করতে হবে।

৯. পিতা-মাতা, অভিভাবক, 'আলেম-উলামাহ ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের এগিয়ে আসতে হবে, গণসচেতনতা বাড়াতে হবে, পত্রিকা, রেডিও ও টিভি'তে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থার ক্ষতিকর দিকগুলো প্রচার করতে হবে, আর যারা এগুলোর সাথে জড়িত তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে সঠিকভাবে বুঝাতে হবে।

১০. শুধু আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে দমনমূলক ভাবে নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায়ও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থার প্রতিকার করতে হবে। জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থি চিন্তাধারার উৎস যেহেতু মেধা ও মনন, তাই তা উৎখাতে মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল অবলম্বন করে অত্যন্ত সতর্কতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থাকে দমন করতে হবে।

১১. জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ থেকে বেঁচে থাকতে হলে যথাযথভাবে ইসলামের পরিপূর্ণ জ্ঞান, সুশাসনের মাধ্যমে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ. ব্যবস্থা, সর্বস্তরে জবাবদিহিতা, সুস্থ সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে হবে।

১২. যুবসমাজকে বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতার হাত থেকে রক্ষা করতে হলে সব মহলকে উলামায়ে কেরামের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং তাঁদের প্রতি বিতশ্রদ্ধভাব জন্ম নেয় এমন প্রচার-প্রচারণা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৩. যুবক শ্রেণীসহ সমাজের সাধারণ মানুষকে যে কোন বিষয়ে প্রান্তিকতা ও মনগড়া দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে উলামায়ে কেরামের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিবিড় পর্যবেক্ষণে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইসলামের সঠিক পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

১৪. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা চালু করতে হবে।

১৫. সর্বস্তরে ইসলামের সঠিক ধারণা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬. খারিজী চিন্তাধারা থেকে জনগণকে সতর্ক করতে হবে।

المحتويات